ভাষা-পাঠ সঞ্চয়ন

বাংলা

প্রাক্-স্নাতক ভাষা-পাঠ-পর্ষৎ
কর্তৃক সম্পাদিত সংকলন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২০০২

মূল্য – ৫০ টাকা

ভারতবর্ষে মুদ্রিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের সুপারিনটেন্‌ডেন্ট
শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ কর্তৃক ৪৮, হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৯
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিষয় সূচী

জমীদার — বঙ্গদেশের কৃষক

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দ্দশা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী বসুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।

আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা 'জমীদার সম্প্রদায়' সম্বন্ধে বলিতেছি না। যদি কেহ বলেন, জমীদার মাত্রেই দুরাত্মা বা অত্যাচারী, তিনি নিতান্ত মিথ্যাবাদী। অনেক জমীদার সদাশয়, প্রজাবৎসল, এবং সত্যনিষ্ঠ। সুতরাং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধপ্রকাশিত কথাগুলি বর্ত্তে না। কতকগুলি জমীদার অত্যাচারী; তাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য; আমরা সংক্ষেপের জন্য এ কথা আগেই বলিয়া রাখিলাম। যেখানে জমীদার বলিয়াছি বা বলিব, সেইখানে ঐ অত্যাচারী জমীদারগুলিই বুঝাইবে। পাঠক মহাশয় 'জমীদার সম্প্রদায়' বুঝিবেন না।

বাঙ্গালী কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা কিছু অধিক নহে। তাহা হইতে প্রথমতঃ চাষের খরচ কুলাইতে হয়। তাহা অল্প নহে। বীজের মূল্য পোষাইতে হইবে, কৃষাণের বেতন দিতে হইবে, গোরুর খোরাক আছে; এ প্রকার অন্যান্য খরচও আছে। তাহা বাদে যাহা থাকে, তাহা প্রথমে মহাজন আটক করে। বর্ষাকালে ধার করিয়া খাইয়াছে, মহাজনকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। কেবল পরিশোধ নহে, দেড়ী সুদ দিতে হইবে। শ্রাবণ মাসে দুই বিশ ধান লইয়াছে বলিয়া, পৌষ মাসে তিন বিশ দিতে হইবে। যাহা রহিল, তাহা অল্প। তাহা হইতে জমীদারকে খাজানা দিতে হইবে। তাহা দিল। পরে যাহা বাকি রহিল—অল্পাবশিষ্ট, অল্প খুদের খুদ, চর্ব্বিত ইক্ষুর রস, শুষ্ক পল্বলের মৃত্তিকাগত বারি—তাহাতে অতি কষ্টে দিনপাত হইতে পারে, অথবা দিনপাত হইতে পারে না। তাহাই কি কৃষকের ঘরে যায়? পাঠক মহাশয় দেখুন।—

পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌষের কিস্তি খাজানা দিল। কেহ কিস্তি পরিশোধ করিল—কাহারও বাকি রহিল। ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া, সময়মতে হাটে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সম্বৎসরের খাজানা পরিশোধ করিতে চৈত্র মাসে জমীদারের কাছারিতে আসিল। পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিস্তি পাঁচ টাকা; চারি টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে। আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা। মোটে চারি টাকা সে দিতে আসিয়াছে। গোমস্তা হিসাব করিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া বলিলেন, "তোমার পৌষের কিস্তি তিন টাকা বাকি আছে।" পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল—দোহাই পাড়িল—হয় ত দাখিলা দেখাইতে পারিল, নয় তা না। হয় ত গোমস্তা দাখিলা দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া, দাখিলায় দুই টাকা লিখিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, তিন টাকা বাকি স্বীকার না করিলে সে আখিরি কবচ পায় না। হয় ত তাহা না দিলে গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে। সুতরাং পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাকি স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা। তখন গোমস্তা সুদ কষিল। জমীদারী নিরিখ টাকায় চারি আনা। তিন বৎসরেও চারি আনা, এক মাসেও চারি আনা। তিন টাকা বাকির সুদ ৸০ আনা। পরাণ তিন টাকা বার আনা দিল। পরে চৈত্র কিস্তি তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা। তাহা টাকায় দুই পয়সা। পরাণ মণ্ডল ৩২ টাকার জমা রাখে। তাহাকে হিসাবানা ১ টাকা দিতে হইল। তাহার পর পার্ব্বণী। নাএব, গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরি, পাইক, সকলেই পার্ব্বণীর হকদার। মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে তজ্জন্য আর দুই টাকা দিতে হইল।

এ সকল দৌরাত্ম্য জমীদারের অভিপ্রায়ানুসারে হয় না, তাহা স্বীকার করি। তিনি ইহার মধ্যে ন্যায্য খাজানা এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নাএব গোমস্তার উদরে গেল। সে কাহার দোষ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান রাখেন, নাএবেরও সেই বেতন; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছু কম। সুতরাং এ সব না করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমীদারের আজ্ঞানুসারে হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার কার্পণ্যের ফল। প্রজার নিকট হইতে তাঁহার লোকে আপন উদরপূর্ত্তির জন্য অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি? তাঁহার কথা কহিবার কি প্রয়োজন আছে?

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তিতে দুই টাকা খাজানা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা। শুভ পুণ্যাহের দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। হয় ত জমীদারেরা অনেক শরিক, প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ নজর দিতে হয়। তাহাও দিল। তাহার পর নাএব মহাশয় আছেন—তাঁহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা, তাঁহাদের

ন্যায্য পাওনা তাঁহারা পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল—তাহার কাছে বাকি রহিল। সময়ান্তরে আদায় হইবে।

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। এদিকে চাষের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহে। এ ত প্রতি বৎসরই ঘটিয়া থাকে। ভরসা মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া আসিল, আবার আগামী বৎসর তাহা সুদ সমেত শুধিয়া নিঃস্ব হইবে। চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাষা কোন ছার! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল। এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পরিশেষে কর্জ্জ দিয়া, তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত শীঘ্র প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ।

সকল বৎসর সমান নহে। কোন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বৎসর জন্মে না। অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকালবৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য আছে, অন্য কীটের দৌরাত্ম্যও আছে যদি ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কর্জ্জ দেয়; নচেৎ দেয় না। কেন না, মহাজন বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অন্নাভাবে সপরিবারে প্রাণে মারা যায়। কখন ভরসার মধ্যে বন্য অখাদ্য ফলমূল, কখন ভরসা "রিলিফ", কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা কেবল জগদীশ্বর। অল্পসংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই এমন দুঃসময়ে প্রজার ভরসার স্থল নহে। মনে কর, সে বার সুবৎসর। পরাণ মণ্ডল কর্জ্জ পাইয়া দিনপাত করিতে লাগিল।

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে।

প্রথমতঃ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন দিন অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূস্বামীদিগের কোন অত্যাচার নাই—যাহা আছে, তাহা তাঁহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তাগণের দ্বারায় হয়। মফঃস্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, তাঁহাদিগেরও প্রায় ঐরূপ। বড় বড় জমীদারদিগের অত্যাচার তত অধিক নহে;—অনেক বড় বড় ঘরে অত্যাচার একেবারে নাই। সামান্য সামান্য ঘরেই অত্যাচার অধিক। যাঁহার জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে—অধর্ম্মাচরণ করিয়া প্রজাদিগের নিকট আর ২৫ হাজার টাকা লইবার জন্য তাঁহার মনে প্রবৃত্তি দুর্ব্বলা হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু যাঁহার জমীদারী হইতে বার মাসে বার শত টাকা আসে না, অথচ জমীদারী চাল-চলনে চলিতে হইবে, মারপিট করিয়া

আর কিছু সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা তাঁহাতে সুতরাং বলবতী হইবে। আবার যাঁহারা নিজে জমীদার, আপন প্রজার নিকট খাজনা আদায় করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ইজারাদারের দৌরাত্ম্য অধিক। আমরা সংক্ষেপানুরোধে উপরে কেবল জমীদার শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জমীদার অর্থে করগ্রাহী বুঝিতে হইবে। ইঁহারা জমীদারকে জমীদারের লাভ দিয়া, তাহার উপর লাভ করিবার জন্য ইজারা পত্তনি গ্রহণ করেন, সুতরাং প্রজার নিকট হইতে তাঁহাদিগকে লাভ পোষাইয়া লইতে হইবে। মধ্যবর্ত্তী তালুকের সৃজন প্রজার পক্ষে বিষম অনিষ্টকর।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকই জমীদারের অজ্ঞাতে, কখন বা অভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে। প্রজার উপর যে কোনরূপ পীড়ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন না।

তৃতীয়তঃ, অনেক জমীদারীর প্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজানা দেয় না। সকলের উপর নালিশ করিয়া খাজানা আদায় করিতে গেলে জমীদারের সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না।

যাঁহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী। জমীদারদের দ্বারা অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে বসিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিতেছে, ইহা জমীদারদিগের গুণে। জমীদারেরা অনেক স্থানে চিকিৎসালয়, রথ্যা, অতিথিশালা ইত্যাদির সৃজন করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন। আমাদিগের দেশের লোকের জন্য যে ভিন্নজাতীয় রাজপুরুষদিগের সমক্ষে দুটো কথা বলে, সে কেবল জমীদারদের ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোশিএশন্—জমীদারদের সমাজ। তদ্দ্বারা দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে, তাহা অন্য কোন সম্প্রদায় হইতে হইতেছে না বা হইবারও সম্ভাবনা দেখা যায় না। অতএব জমীদারদিগের কেবল নিন্দা করা অতি অন্যায়পরতার কাজ। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজাপীড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা জমীদারদিগেরই হাত। যদি কোন পরিবারে পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দুশ্চরিত্র হয়, তবে আর তিন জনে দুশ্চরিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্রসংশোধনজন্য যত্ন করেন। জমীদারসম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারাও সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা। আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না—জনসমাজকে জানাইতেছি না। জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ। ইহা তাঁহাদিগের অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষা, আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, এবং কার্যকরী। যত কুলোক চুরি করিতে ইচ্ছুক হইয়া

চৌর্য্যে বিরত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিবাসীদিগের মধ্যে চোর বলিয়া ঘৃণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না। এই দণ্ড যত কার্য্যকরী, আইনের দণ্ড তত নহে। জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই হাত। অপর জমীদারদিগের নিকট ঘৃণিত, অপমানিত, সমাজচ্যুত হইবার ভয় থাকিলে, অনেক দুর্ব্বৃত্ত জমীদার দুর্ব্বৃত্তি ত্যাগ করিবে। এ কথার প্রতি মনোযোগ করিবার জন্য আমরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোশিএশনকে অনুরোধ করি। যদি তাঁহারা কুচরিত্র জমীদারগণকে শাসিত করিতে পারেন, তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে, তজ্জন্য তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইবে। এবং তাঁহাদিগের দেশ উচ্চতর সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিবে। এ কাজ না হইলে, বাঙ্গালা দেশের মঙ্গলের কোন ভরসা নাই। যাঁহা হইতে এই কার্য্যের সূত্রপাত হইবে, তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হইবেন। কি উপায়ে এই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা অবধারিত করা কঠিন, ইহা স্বীকার করি। কঠিন, কিন্তু অসাধ্য নহে। উক্ত সমাজে কার্য্যাধ্যক্ষগণ যে এ বিষয়ে অক্ষম, আমরা এমত বিশ্বাস করি না। তাঁহারা সুশিক্ষিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বহুদর্শী, এবং কার্য্যক্ষম। তাঁহারা ঐকান্তিকচিত্তে যত্ন করিলে অবশ্য উপায় স্থির হইতে পারে। আমরা যাহা কিছু এ বিষয়ে বলিতে পারি, তদপেক্ষা তাঁহাদিগের দ্বারা সুচারু প্রণালী আবিষ্কৃত হইতে পারিবে বলিয়াই আমরা সে বিষয়ে কোন কথা বলিলাম না। যদি আবশ্যক হয়, আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে যাহা আইসে, তাহা বলিতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণে কেবল এই বক্তব্য যে, তাঁহারা যদি এ বিষয়ে অনুরাগহীনতা দেখাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও অখ্যাতি।

আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ

জগদীশ চন্দ্র বসু

দৃশ্যজগৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম লইয়া গঠিত। রূপক অর্থে এ কথা লইতে পারা যায়। এ জগতে অসংখ্য ঘটনাবলীর মূলে তিনটি কারণ বিদ্যমান। প্রথম পদার্থ, দ্বিতীয় শক্তি, তৃতীয় ব্যোম অথবা আকাশ।

পদার্থ ত্রিবিধ আকারে দেখা যায়। ক্ষিত্যাকারে—অর্থাৎ কঠিনরূপে; দ্রব্যাকারে—অর্থাৎ অপ্‌রূপে; বায়বাকারে—অর্থাৎ মরুৎরূপে। জড় পদার্থ সর্ব্বসময়ে শক্তি অথবা তেজ দ্বারা স্পন্দিত হইতেছে। এই মহাজগৎ ব্যোমে দোলায়মান রহিয়াছে। মহাশক্তি অনন্ত চক্রে নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে। তাহারই বলে অসীম আকাশে বিশ্বজগৎ ভ্রমণ করিতেছে, উদ্ভূত হইতেছে এবং পুনরায় মিলাইয়া যাইতেছে।

সর্ব্বাগ্রে দেখা যাউক, শক্তি কি প্রকারে স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চালিত হয়।

রেলের ষ্টেশনে সঙ্কেত প্রেরণের দণ্ড সকলেই দেখিয়াছেন। একদিকে রজ্জু আকর্ষণ করিলে দূরস্থ কাষ্ঠখণ্ড সঞ্চালিত হয়।

এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকারেও শক্তি সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়। নদীর উপর দিয়া জাহাজ চলিয়া যায়; কলের আঘাতে জল তরঙ্গাকারে বিক্ষিপ্ত হইয়া নদীতটে বারংবার আঘাত করে। এ স্থলে কলের আঘাত তরঙ্গবলে দূরে নীত হয়।

বাদ্যকরের অঙ্গুলিতাড়িত তন্ত্রীও এইরূপে স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দনে বায়ুরাশিতে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। শব্দজ্ঞান বায়ুতরঙ্গের আঘাতজনিত।

বাদ্যযন্ত্র ব্যতীতও সচরাচর অনেক সুর শুনিতে পাওয়া যায়। বায়ুকম্পিত বৃক্ষপত্রে, জলবিন্দু পতনে, তরঙ্গাহত সমুদ্রতীরে বহুবিধ সুর শ্রুতিগোচর হয়।

সেতারের তার যতই ছোট করা যায়, সুর ততই চড়া হয়। যখন প্রতি সেকেণ্ডে বায়ু ৩০,০০০ বার কাঁপিতে থাকে তখন কর্ণে অসহ্য অতি উচ্চ সুর শোনা যায়। তার আরও ক্ষুদ্র করিলে হঠাৎ শব্দ থামিয়া যাইবে। তখনও তার কাঁপিতে থাকিবে, তরঙ্গ উদ্ভূত হইবে; কিন্তু এই উচ্চ সুর আর কর্ণে ধ্বনি উৎপাদন করিবে না।

কে মনে করিতে পারে যে, শত শত ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে আমরা তাহা শুনিয়াও শুনিতে পাই না? গৃহের বাহিরে নিরন্তর অগণিত সংগীত গীত হইতেছে; কিন্তু তাহা আমাদের শ্রবণের অতীত।

জড় পদার্থের কম্পন ও তজ্জনিত সুরের কথা বলিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আকাশেও সর্ব্বদা অসংখ্য তরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে। অঙ্গুলিতাড়নে প্রথমে বাদ্যযন্ত্রে ও তৎপরে বায়ুতে যেরূপ তরঙ্গ হয়, বিদ্যুত্তাড়নেও সেইরূপে আকাশে তরঙ্গ উদ্ভূত হয়। বায়ুর তরঙ্গ আমরা কর্ণ দিয়া শ্রবণ করি, আকাশের তরঙ্গ সচরাচর আমরা চক্ষু দিয়া দেখি।

বায়ুর তরঙ্গ আমরা অনেক সময়ে শুনিতে পাই না। আকাশের তরঙ্গও সর্ব্বসময়ে দেখিতে পাই না।

দুইটি ধাতুগোলক বিদ্যুদ্‌যন্ত্রের সহিত যোগ করিয়া দিলে গোলক দুইটি বারংবার বিদ্যুত্তাড়িত হইবে এবং তড়িদ্বলে চতুর্দ্দিকের আকাশে তরঙ্গ ধাবিত হইবে। তার ছোট করিলে, অর্থাৎ গোলক দুইটিকে ক্ষুদ্র করিলে সুর উচ্চে উঠিবে। এইরূপ প্রতিমুহূর্ত্তে সহস্র কম্পন হইতে লক্ষ, লক্ষ হইতে কোটি এবং তাহা হইতে কোটি কোটি কম্পন উৎপন্ন হইবে।

মনে কর, অন্ধকার গৃহে অদৃশ্য শক্তিবলে বায়ু বারংবার আহত হইতেছে। কিছুই দেখা যাইতেছে না, কেবল নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গভীর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। কম্পনসংখ্যা যতই বর্দ্ধিত করা যাইবে, সুর ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তমে উঠিবে। অবশেষে সহসা কর্ণবিদারী সুর থামিয়া নিস্তব্ধতায় পরিণত হইবে। ইহার পর লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ কর্ণে আঘাত করিলেও আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারিব না।

এক্ষণে বিদ্যুদ্বলে আকাশে তরঙ্গ উৎপন্ন করা যাউক; লক্ষাধিক তরঙ্গ প্রতি মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইবে। আমরা এই তরঙ্গান্দোলিত সাগরে নিমজ্জিত হইয়াও অক্ষুণ্ণ থাকিব। সুর ক্রমে উচ্চে উত্থিত হইতে থাকুক; প্রতি সেকেণ্ডে যখন কোটি কোটি তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে তখন অকস্মাৎ নিদ্রিত ইন্দ্রিয় জাগরিত হইয়া উঠিবে, শরীর উত্তাপ অনুভব করিবে। সুর আরও উচ্চে উত্থিত হইলে যখন অধিকতর সংখ্যক তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে তখন অন্ধকার ভেদ করিয়া রক্তিম আলোক-রেখা দেখা যাইবে। কম্পনসংখ্যার আরও বৃদ্ধি হউক—ক্রমে ক্রমে পীত, হরিৎ নীল আলোকে গৃহ পূর্ণ হইবে। ইহার পর সুর আরও উচ্চে উঠিলে চক্ষু পরাস্ত হইবে, আলোকরাশি পুনরায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ইহার পর অগণিত স্পন্দনে আকাশ স্পন্দিত হইলেও আমরা কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা অনুভব করিতে পারিব না।

তবে ত আমরা এই সমুদ্রে একেবারে দিশাহারা। আমরা বধির ও অন্ধ! কি দেখিতে

পাই? কি শুনিতে পাই? কিছুই নয়! দুই একখানা ভগ্ন দিক্‌দর্শন শলাকা লইয়া আমরা মহাসমুদ্রে যাত্রা করিয়াছি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, উত্তাপ ও আলোক আকাশের বৈদ্যুতিক স্পন্দন মাত্র। যে স্পন্দন ত্বক্ দ্বারা অনুভব করি তাহার নাম উত্তাপ; আর যে কম্পনে দর্শনেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় তাহাকে আলোক বলিয়া থাকি। ইহা ব্যতীত আকাশে বহুবিধ স্পন্দন আছে যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।

হস্তী-দেহের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করিয়া অন্ধেরা একই জন্তুর বিভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়াছিল; শক্তি সম্বন্ধেও আমরা সেইরূপ কল্পনা করি।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আমরা চুম্বকশক্তি, বিদ্যুৎ, তাপ ও আলোককে বিভিন্ন শক্তি বলিয়া মনে করিতাম। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, এ সকল একই শক্তির বিভিন্ন রূপ। চুম্বকশক্তি ও বিদ্যুতের সম্বন্ধ সকলেই জানেন। তাপরশ্মি ও আলোক যে আকাশের বৈদ্যুতিক কম্পনজনিত, ইহা অল্পদিন হইল প্রমাণিত হইয়াছে।

আকাশ দিয়া ইহাদের তরঙ্গ একই গতিতে ধাবিত হয়, ধাতুপাত্রে প্রতিহত হইয়া একই রূপে প্রত্যাবর্ত্তন করে, বায়ু হইতে অন্য স্বচ্ছ দ্রব্যে পতিত হইয়া একই রূপে বক্রীভূত হয়। কম্পনসংখ্যাই বৈষম্যের একমাত্র কারণ।

সূর্য্য এই পৃথিবী হইতে নয় কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের উপরে বায়ুমণ্ডল ৪৫ মাইল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। তারপর শূন্য। দূরস্থ সূর্য্যের সহিত এই পৃথিবীর আপাততঃ কোনও যোগ দেখা যায় না।

অথচ সূর্য্যের বহ্নিময় সাগরে আবর্ত্ত উত্থিত হইলে এই পৃথিবী সেই সৌরোৎপাতে ক্ষুব্ধ হয়—অমনি পৃথিবী জুড়িয়া বিদ্যুৎস্রোত বহিতে থাকে।

সুতরাং যাহা বিচ্ছিন্ন মনে করিতাম, প্রকৃতপক্ষে তাহা বিচ্ছিন্ন নহে। শূন্যে বিক্ষিপ্ত কোটি কোটি জগৎ আকাশসূত্রে গ্রথিত। এক জগতের স্পন্দন আকাশ বাহিয়া অন্য জগতে সঞ্চালিত হইতেছে।

সূর্য্যকিরণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া নানা রূপ ধরিতেছে। সূর্য্যকিরণেই বৃক্ষ বর্দ্ধিত হয়, পুষ্প রঞ্জিত হয়। কিরণরূপ আকাশ-কম্পন আসিয়া বায়ুস্থিত অঙ্গারক অণুগুলি বিচলিত করিয়া বৃক্ষদেহ গঠিত করে। অসংখ্য বৎসর পূর্ব্বের সূর্য্যকিরণ বৃক্ষদেহে আবদ্ধ হইয়া পৃথ্বীগর্ভে নিহিত আছে, আজ কয়লা হইতে সেই কিরণ নির্ম্মুক্ত হইয়া গ্যাস ও বিদ্যুতালোকে রাজবর্ত্ম আলোকিত করিতেছে। বাষ্পযান, অর্ণবপোত এই শক্তিতেই ধাবিত হয়। মেঘ ও বাত্যা একই শক্তিবলে সঞ্চালিত হইতেছে।

সূর্য্যকিরণে লালিত উদ্ভিদ্ ভোজন করিয়াই প্রাণিগণ জীবনধারণ করিতেছে ও বর্দ্ধিত হইতেছে। তবে দেখা যায় যে, এই ভূপৃষ্ঠের প্রায় সর্ব্ব গতির মূলে সূর্য্যকিরণ। আকাশের স্পন্দন দ্বারাই পৃথিবী স্পন্দিত হইতেছে; জীবনের স্রোত বহিতেছে।

আমাদের চক্ষুর আবরণ ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইল। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, এই বহুরূপী বিবিধ শক্তিশালী জগতের মূলে দুইটি কারণ বিদ্যমান। এক, আকাশ ও তাহার স্পন্দন; অপর, জড়বস্তু।

জড় পদার্থ বিবিধ আকারে দেখা যায়। এক সময়ে লৌহবৎ কঠিন, কখনও দ্রব, কখন বায়বাকার, আবার কখনও বা তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। শূন্যে উড্ডীন অদৃশ্য বাষ্প আর প্রস্তরবৎ কঠিন তুষার একই পদার্থ; কিন্তু আকারে কত প্রভেদ!

গৃহমধ্যে নিশ্চল বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না। উহার অস্তিত্ব সহসা আমরা কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু এই অদৃশ্য সূক্ষ্ম বায়ুরাশিতে আবর্ত্ত উত্থিত হইলে উহা বিভিন্ন গুণ ধারণ করে। আবর্ত্তময় অদৃশ্য বায়ুর কঠিন আঘাতে মুহূর্ত্তমধ্যে গ্রাম-জনপদ বিনষ্ট হইবার কথা সকলেই জানেন।

জড় পদার্থ আকাশের আবর্ত্ত মাত্র। কোন কালে আকাশ-সাগরে অজ্ঞাত মহাশক্তিবলে অগণ্য আবর্ত্ত উদ্ভূত হইয়া পরমাণুর সৃষ্টি হইল। উহাদের মিলনে বিন্দু, অসংখ্য বিন্দুর সমষ্টিতে জগৎ, মহাজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

আকাশেরই আবর্ত্ত জগৎরূপে আকাশ-সাগরে ভাসিয়া রহিয়াছে।

জার্ম্মান কবি রিক্টার স্বপ্নরাজ্যে দেবদূতের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। দেবদূত কহিলেন, "মানব, তুমি বিশ্ব-রচয়িতার অনন্ত রচনা দেখিতে চাহিয়াছ—আইস, মহাবিশ্ব দেখিবে।" মানব দেবস্পর্শে পৃথিবীর আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেবদূত সহ অনন্ত আকাশপথে যাত্রা করিল! আকাশের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তর ভেদ করিয়া তাহারা ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সপ্তগ্রহ পশ্চাতে ফেলিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সৌরদেশে উপনীত হইল। সূর্য্যের ভীষণ অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত মহাপাবকশিখা তাহাদিগকে দগ্ধ করিল না। পরে সৌররাজ্য ত্যাগ করিয়া সুদূরস্থিত তারকার রাজ্যে উপস্থিত হইল। সমুদ্রতীরস্থ বালুকণার গণনা মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু এই অসীমে বিক্ষিপ্ত অগণ্য জগতের গণনা কল্পনারও অতীত। দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিয়া অগণ্য জগতের অনন্ত শ্রেণী! কোটি কোটি মহাসূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া কোটি কোটি গ্রহ ও তাহাদের চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি চন্দ্র ভ্রমণ করিতেছে। ঊর্দ্ধহীন, অধোহীন, দিক্‌হীন অনন্ত। পরে এই মহাজগৎ

অতিক্রম করিয়া আরও দূরস্থিত অচিন্ত্য জগৎ উদ্দেশে তাহারা চলিল। সমস্ত দিক আচ্ছন্ন করিয়া কল্পনাতীত নূতন মহাবিশ্ব মুহূর্ত্তে তাহাদের দৃষ্টিপথ অবরোধ করিল। ধারণাতীত মহাব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য সমাবেশ দেখিয়া মানুষ একেবারে অবসন্ন হইয়া কহিল, "দেবদূত! আমার প্রাণবায়ু বাহির করিয়া দাও! এই দেহ অচেতন ধূলিকণায় মিশিয়া যাউক। অসহ্য এ অনন্তের ভার! এ জগতের শেষ কোথায়?"

তখন মেঘদূত কহিলেন, "তোমার সম্মুখে অনন্ত নাই। ইহাতেই কি তুমি অবসন্ন হইয়াছ? পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখ, এ জগতের আরম্ভও নাই।"

শেষও নাই, আরম্ভও নাই।

মানুষের মন অসীমের ভার বহিতে পারে না। ধূলিকণা হইয়া কিরূপে অসীম ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা মনে ধারণা করিব?

অণুবীক্ষণে ক্ষুদ্র বিন্দুতে বৃহৎ জগৎ দেখা যায়। বিপর্য্যয় করিয়া দেখিলে জগৎ ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। অণুবীক্ষণ বিপর্য্যয় করিয়া দেখ। ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া ক্ষুদ্র কণিকায় দৃষ্টি আবদ্ধ কর।

আমাদের চক্ষুর সমক্ষে জড়বস্তু মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। অগ্নিদাহে মহানগর শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। তাহা বলিয়া একবিন্দুও বিনষ্ট হয় না। একই অণু কখন মৃত্তিকাকারে, কখন উদ্ভিদাকারে, কখন মনুষ্যদেহে, পুনরায় কখন অদৃশ্য বায়ুরূপে বর্ত্তমান। কোন বস্তুরই বিনাশ নাই।

শক্তিও অবিনশ্বর। এক মহাশক্তি জগৎ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; প্রতি কণা ইহা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট। এ মুহূর্ত্তে যাহা দেখিতেছি, পরমুহূর্ত্তে ঠিক তাহা আর দেখিব না। বেগবান নদীস্রোত যেরূপ উপলখণ্ডকে বার বার ভাঙ্গিয়া অনবরত তাহাকে নূতন আকার প্রদান করে, এই মহাশক্তি-স্রোতও সেইরূপ দৃশ্য জগৎকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এই স্রোত অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার বিরাম নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই। সমুদ্রের এক স্থানে ভাঁটা হইলে অন্য স্থানে জোয়ার হয়। জোয়ার ভাঁটা উভয়ই এক কারণজাত; সমুদ্রের জলপরিমাণ সমানই রহিয়াছে। এক স্থানে যত হ্রাস হয়, অপর স্থানে সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এইরূপ জোয়ার ভাঁটা—ক্ষয় বৃদ্ধি—তরঙ্গের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

শক্তির তরঙ্গেও এইরূপ—ক্ষয় বৃদ্ধি! প্রত্যেক বস্তু এই তরঙ্গ দ্বারা সর্ব্বদা আহত হইতেছে, উপলখণ্ড ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে। শক্তি-প্রক্ষিপ্ত ঊর্ম্মিমালার দ্বারাই জগৎ জীবন্ত রহিয়াছে।

এখন জড়-জগৎ ছাড়িয়া জীব-জগতে দৃষ্টিপাত করি। বসন্তের স্পর্শে নিদ্রিত পৃথিবী জাগরিত করিয়া, প্রান্তর বন আচ্ছন্ন করিয়া উদ্ভিদ্-শিশু অন্ধকার হইতে মস্তক তুলিল। দেখিতে দেখিতে হরিৎ প্রান্তর প্রসূনিত। শরৎকাল আসিল, কোথায় সেই বসন্তের জীবনোচ্ছ্বাস? পুষ্প বৃন্তচ্যুত, জীর্ণ পল্লব ভূপতিত, তরুদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত। জাগরণের পরেই নিদ্রা।

আবার বসন্ত ফিরিয়া আসিল; শুষ্ক পুষ্পদলে আচ্ছাদিত, বীজে নিহিত, নিদ্রিত বৃক্ষ-শিশু পুনরায় জাগিয়া উঠিল। বৃক্ষ মৃত্যুর আগমনে জীবনবিন্দু বীজে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। সেই বিন্দু হইতে বৃক্ষ পুনর্জ্জীবন লাভ করিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রতি জীবনে দুইটি অংশ আছে। একটি অজর, অমর; তাহাকে বেষ্টন করিয়া নশ্বর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।

অমর জীববিন্দু প্রতি পুনর্জ্জন্মে নূতন গৃহ বাঁধিয়া লয়। সেই আদিম জীবনের অংশ, বংশপরম্পরা ধরিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আজ যে পুষ্প-কলিকাটি অকাতরে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, ইহার অণুতে কোটি বৎসর পূর্ব্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে।

কেবল তাহাই নহে। প্রতি জীবের সম্মুখেও বংশপরম্পরাগত অনন্ত জীবন প্রসারিত।

সুতরাং বর্ত্তমান কালের জীব অনন্তের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। তাহার পশ্চাতে যুগযুগান্তরব্যাপী ইতিহাস ও সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ।

আর মনুষ্য? প্রথম জীবকণিকা মনুষ্যরূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বে কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে! অসংখ্য বৎসরব্যাপী, বিভিন্ন শক্তিগঠিত, অনন্ত সংগ্রামে জয়ী জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব!

আজ সেই কীটাণুর বংশধর দুর্ব্বল জীব স্বীয় অপূর্ণতা ভুলিয়া অসীম বল ধারণ করিতে চাহে। আকাশ হইতে বিদ্যুৎ আহরণ করিয়া স্বীয় রথে যোজনা করে। অজ্ঞান ও অন্ধ হইয়াও পৃথিবীর আদিম ইতিহাস উদ্ধার করিতে উৎসুক হয়। ঘন তিমিরাবৃত যবনিকা উত্তোলন করিয়া ভবিষ্যৎ দেখিবার প্রয়াসী হয়।

যদি কখনও সৃষ্ট জীবে দৈবশক্তির আবির্ভাব সম্ভব হয় তবে ইহাই সেই দৈবশক্তি।

অধিক বিস্ময়কর কাহাকে বলিব? বিশ্বের অসীমতা, কিম্বা এই সসীম ক্ষুদ্র বিন্দুতে অসীম ধারণা করিবার প্রয়াস—কোন্‌টা অধিক বিস্ময়কর?

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ জগতের আরম্ভও নাই, শেষও নাই। এখন দেখিতেছি, এ জগতে ক্ষুদ্রও নাই, বৃহৎও নাই।

জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব! এ কথা সর্ব্ব সময়ের জন্য ঠিক নয়। যে শক্তি আদিম জীববিন্দুকে মনুষ্যে উন্নীত করিয়াছে, যাহার উচ্ছ্বাসে নিরাকার মহাশূন্য হইতে এই বহুরূপী জগৎ ও তদ্বৎ বিস্ময়কর জীবন উৎপন্ন হইয়াছে, আজিও সেই মহাশক্তি সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। উর্দ্ধাভিমুখেই সৃষ্টির গতি; আর সম্মুখে অন্তহীন কাল এবং অনন্ত উন্নতি প্রসারিত।

স্বদেশী সমাজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়—তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।

এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে—কিন্তু মেলা উপলক্ষে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আসে—সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লীগুলি যেদিন হাল-লাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে, সেইদিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।

বাংলাদেশে এমন জেলা নাই যেখানে নানা স্থানে বৎসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে—প্রথমত এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্তব্য। তাহার পরে এই-সমস্ত মেলাগুলির সূত্রে দেশের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ আমরা যেন অবলম্বন করি।

প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই-সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন—কোনোপ্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে-সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।

আমার বিশ্বাস, যদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাংলাদেশে নানা স্থানে মেলা করিবার জন্য এক দল লোক প্রস্তুত হন—তাঁহারা নূতন নূতন যাত্রা, কীর্তন, কথকতা রচনা করিয়া

সঙ্গে বায়োস্কোপ, ম্যাজিকলণ্ঠন, ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে ব্যয়নির্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলার জন্য জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারের নিকট হইতে যথানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন—তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদ্‌বৃত্ত হইবে, তাহা যদি দেশের কার্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশের হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে—ইহারা সমস্ত দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিবেন এবং ইঁহাদের দ্বারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের সূত্রে লোককে সাহিত্যরস ও ধর্মশিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণবশতই অধিকাংশ জমিদার শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যার বিবাহাদি ব্যাপারে যাহা-কিছু আমোদ-আহ্লাদ, সমস্তই কেবল শহরের ধনী বন্ধুদিগকে থিয়েটার ও নাচগান দেখাইয়াই সম্পন্ন হয়। অনেক জমিদার ক্রিয়াকর্মে প্রজাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতে কুণ্ঠিত হন না—সে-স্থলে 'ইতরে জনাঃ' মিষ্টান্নের উপায় জোগাইতে থাকে, কিন্তু 'মিষ্টান্নম্' 'ইতরে জনাঃ' কণামাত্র ভোগ করিতে পায় না—ভোগ করেন 'বান্ধবাঃ' এবং 'সাহেবাঃ'। ইহাতে বাংলার গ্রামসকল দিনে দিনে নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে এবং যে সাহিত্যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রত্যহই সাধারণ লোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই কল্পিত মেলা-সম্প্রদায় যদি সাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্রোত বাংলার পল্লীদ্বারে আর-একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে এই শস্যশ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইবে না।

আমাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে-সকল বড়ো বড়ো জলাশয় আমাদিগকে জলদান স্বাস্থ্যদান করিত, তাহারা দূষিত হইয়া কেবল যে আমাদের জলকষ্ট ঘটাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে—তেমনি আমাদের দেশে যে-সকল মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দূষিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শস্যক্ষেত্রে শস্যও হইতেছে না, কাঁটাগাছও জন্মিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমোদের উপলক্ষ এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে ধর্মের কাছে অপরাধী হইব।

বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অন্নজল ও বিদ্যা ভিক্ষা দিবে, আমাদের কর্তব্য কেবল এই যে, ভিক্ষার অংশ মনের মতো না হইলেই আমরা চীৎকার করিতে থাকিব?

কদাচ নহে, কদাচ নহে! স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব—তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম। এইবার সময় আসিয়াছে যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে যখন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি—আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।

তর্ক এই উঠিতে পারে যে, ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ দ্বারা খুব বড়ো জায়গা ব্যাপ্ত করা সম্ভবপর হইতে পারে না। একটা ছোটো পল্লীকেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে আপনার করিয়া লইয়া তাহার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারি—কিন্তু পরিধি বিস্তীর্ণ করিলেই কলের দরকার হয়—দেশকে আমরা কখনোই পল্লীর মতো করিয়া দেখিতে পারি না—এইজন্য অব্যবহিত ভাবে দেশের কাজ করা যায় না, কলের সাহায্যে করিতে হয়। এই কল-জিনিসটা আমাদের ছিল না, সুতরাং ইহা বিদেশ হইতে আনাইতে হইবে এবং কারখানা-ঘরের সমস্ত সাজসরঞ্জাম-আইনকানুন গ্রহণ না করিলে কল চলিবে না।

কথাটা অসংগত নহে। কল পাতিতেই হইবে। এবং কলের নিয়ম যে-দেশী হউক-না কেন, তাহা মানিয়া না লইলে সমস্তই ব্যর্থ হইবে। এ কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে, শুধু কলে ভারতবর্ষ চলিবে না—যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব না করিব, সেখানে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। ইহাকে ভালোই বল আর মন্দই বল, গালিই দাও আর প্রশংসাই কর, ইহা সত্য। অতএব আমরা যে-কোনো কাজে সফলতা লাভ করিতে চাই, এই কথাটি আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে।

স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।

এক্ষণে আমাদের সমাজপতি চাই। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পার্ষদসভা থাকিবে, কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হইবেন।

আমাদের প্রত্যেকের নিকটে তাঁহারই মধ্যে সমাজের একতা সপ্রমাণ হইবে। আজ যদি কাহাকেও বলি সমাজের কাজ করো, তবে কেমন করিয়া করিব, কোথায় করিব, কাহার কাছে কী করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া যাইবে। অধিকাংশ লোকেই আপনার কর্তব্য উদ্ভাবন করিয়া চলে না বলিয়াই রক্ষা। এমন স্থলে ব্যক্তিগত চেষ্টাগুলিকে নির্দিষ্ট পথে আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্য একটি কেন্দ্র থাকা চাই। আমাদের

সমাজের কোনো দল সেই কেন্দ্রের স্থল অধিকার করিতে পারিবে না। আমাদের দেশে অনেক দলকেই দেখি, প্রথম উৎসাহের ধাক্কায় তাহারা যদি বা অনেকগুলি ফুল ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু শেষকালে ফল ধরাইতে পারে না। তাহার বিবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা প্রধান কারণ—আমাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে দলের ঐক্যটিকে দৃঢ়ভাবে অনুভব ও রক্ষা করিতে পারে না — শিথিল দায়িত্ব প্রত্যেকের স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া শেষকালে কোথায় যে আশ্রয় লইবে, তাহার স্থান পায় না।

আমাদের সমাজ এখন আর এরূপভাবে চলিবে না। কারণ, বাহির হইতে যে উদ্যত শক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহা ঐক্যবদ্ধ, তাহা দৃঢ়—তাহা আমাদের বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকানবাজার পর্যন্ত অধিকার করিয়া সর্বত্রই নিজের একাধিপত্য স্থূলসূক্ষ্ম সর্ব আকারেই প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে। এখন সমাজকে ইহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাহার আপনাকে দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা করাইবার একমাত্র উপায়—একজন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা, সমাজের প্রত্যেককে সেই একের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা, তাঁহার সম্পূর্ণ শাসন বহন করাকে অপমান জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অঙ্গ বলিয়া অনুভব করা।

এই সমাজপতি কখনো ভালো, কখনো মন্দ হইতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে, তবে মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারে না। আবার, এইরূপ অধিপতির অভিষেকই সমাজকে জাগ্রত রাখিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সমাজ একটি বিশেষ স্থলে আপনার ঐক্যটি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলে তাহার শক্তি অজেয় হইয়া উঠিবে।

ইঁহার অধীনে দেশের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক নিযুক্ত হইবেন। সমাজের সমস্ত অভাবমোচন, মঙ্গলকর্মচালনা ও ব্যবস্থারক্ষা ইঁহারা করিবেন এবং সমাজপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্পপরিমাণেও কিছু স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া, প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্মে গ্রামভাটি* প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশী সমাজের একটি প্রাপ্য আদায় দুরুহ বলিয়া মনে করি না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাদত্ত দানে বড়ো বড়ো মঠমন্দির চলিতেছে, এ দেশে কি সমাজ ইচ্ছাপূর্বক আপনার আশ্রয়স্থান আপনি রচনা করিবে না? বিশেষত যখন অন্নে জলে স্বাস্থ্যে বিদ্যায় দেশ সৌভাগ্যলাভ করিবে, তখন কৃতজ্ঞতা কখনোই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না।

---

* গ্রামবৃত্তি, বিবাহাদি, বারোয়ারি কাজের জন্য সংগৃহীত অর্থ—সম্পাদক

অবশ্য, এখন আমি কেবল বাংলাদেশকেই আমার চোখের সামনে রাখিয়াছি। এখানে সমাজের অধিনায়ক স্থির করিয়া আমাদের সামাজিক স্বাধীনতাকে যদি আমরা উজ্জ্বল ও স্থায়ী করিয়া তুলিতে পারি, তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগও আমাদের অনুবর্তী হইবে। এবং এইরূপে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ যদি নিজের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ঐক্য লাভ করিতে পারে, তবে পরস্পরের সহযোগিতা করা প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়। একবার ঐক্যের নিয়ম এক স্থানে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা ব্যাপ্ত হইতে থাকে—কিন্তু রাশীকৃত বিচ্ছিন্নতাকে কেবলমাত্র স্তূপাকার করিতে থাকিলেই তাহা এক হয় না।

আমাদের স্বদেশী সমাজের গঠন ও চালনের জন্য একই কালে আমরা সমাজপতি ও সমাজতন্ত্রের কর্তৃত্বসমন্বয় করিতে পারিব—আমরা স্বদেশকে একটি মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব এবং তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া স্বদেশী সমাজের যথার্থ সেবা করিতে পারিব।

আত্মশক্তি একটি বিশেষ স্থানে সঞ্চয় করা, সেই বিশেষ স্থানে উপলব্ধি করা, সেই বিশেষ স্থান হইতে সর্বত্র প্রয়োগ করিবার একটি ব্যবস্থা থাকা, আমাদের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয় হইয়াছে একটু আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। গবর্মেন্ট নিজের কাজের সুবিধা অথবা যে কারণেই হোক, বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন—আমরা ভয় করিতেছি, ইহাতে বাংলাদেশ দুর্বল হইয়া পড়িবে।

দেশকে খণ্ডিত করিলে যে-সমস্ত অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য দেশের মধ্যে কোথাও কোনো ব্যবস্থা থাকিবে না? ব্যাধির বীজ বাহির হইতে শরীরের মধ্যে না প্রবেশ করিলেই ভালো—কিন্তু তবু যদি প্রবেশ করিয়া বসে, তবে শরীরের অভ্যন্তরে রোগকে ঠেকাইবার স্বাস্থ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কোনো কর্তৃশক্তি কি থাকিবে না। সেই কর্তৃশক্তি যদি আমরা সমাজের মধ্যে সুদৃঢ় সুস্পষ্ট করিয়া রাখি, তবে বাহির হইতে বাংলাকে নির্জীব করিতে পারিবে না। সমস্ত ক্ষতকে আরোগ্য করা, ঐক্যকে আকর্ষণ করিয়া রাখা, মূর্ছিতকে সচেতন করিয়া তোলা ইহারই কর্ম হইবে।

আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে সামান্য উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, সেই বিরোধ মিটাইয়া দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতিশান্তিস্থাপন, উভয় পক্ষের স্ব স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্তৃত্ব সমাজের কোনো স্থানে যদি না থাকে, তবে সমাজকে বারে বারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর দুর্বল হইতে হয়।

অতএব একটি লোককে আশ্রয় করিয়া আমদের সমাজকে এক জায়গায় আপন হৃদয়স্থাপন, আপন ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, নহিলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হইতে আত্মরক্ষার কোনো উপায় দেখি না।

অনেকে হয়তো সাধারণভাবে আমার এ কথা স্বীকার করিবেন, কিন্তু ব্যাপারখানা ঘটাইয়া তোলা তাঁহারা অসাধ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন—নির্বাচন করিব কী করিয়া, সবাই নির্বাচিতকে মানিবে কেন, আগে সমস্ত ব্যবস্থাতন্ত্র স্থাপন করিয়া তবে তো সমাজপতির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে, ইত্যাদি।

আমার বক্তব্য এই যে, এই সমস্ত তর্ক লইয়া আমরা যদি একেবারে নিঃশেষপূর্বক বিচার বিবেচনা করিয়া লইতে বসি, তবে কোনো কালে কাজে নামা সম্ভব হইবে না। এমন লোকের নাম করাই শক্ত, দেশের কোনো লোক বা কোনো দল যাঁহার সম্বন্ধে কোনো আপত্তি না করিবেন। দেশের সমস্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ মিটাইয়া লইয়া লোককে নির্বাচন করা সাধ্য হইবে না।

আমাদের প্রথম কাজ হইবে—যেমন করিয়া হউক, একটি লোক স্থির করা এবং তাঁহার নিকটে বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারি দিকে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়িয়া তোলা।

কোনো একটি যোগ্য লোককে দাঁড় করাইয়া তাঁহার অধীনে এক দল লোক যথার্থভাবে কাজে প্রবৃত্ত হইলে এই সমাজরাজতন্ত্র দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে—পূর্ব হইতে হিসাব করিয়া কল্পনা করিয়া আমরা যা আশা করিতে না পারিব, তাহাও লাভ করিব—সামাজের অন্তর্নিহিত বুদ্ধি এই ব্যাপারের চালনাভার আপনিই গ্রহণ করিবে।

সমাজে অবিচ্ছিন্নভাবে সকল সময়েই শক্তিমান ব্যক্তি থাকেন না, কিন্তু দেশের শক্তি বিশেষ-বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করে। যে-শক্তি আপাতত যোগ্য লোকের অভাবে কাজে লাগিল না, সে-শক্তি যদি সমাজে কোথাও রক্ষিত হইবার স্থানও না পায়, তবে সে সমাজ ফুটা কলসের মতো শূন্য হইয়া যায়। আমি যে সমাজপতির কথা বলিতেছি, তিনি সকল সময়ে যোগ্য লোক না হইলেও সমাজের শক্তি, সমাজের আত্মচেতনা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিধৃত হইয়া থাকিবে। অবশেষে বিধাতার আশীর্বাদে এই শক্তিসঞ্চয়ের সঙ্গে যখন যোগ্যতার যোগ হইবে, তখন দেশের মঙ্গল দেখিতে দেখিতে আশ্চর্যবলে আপনাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করিবে।

সমাজের সকলের চেয়ে যাঁহাকে বড়ো করিব, এতবড়ো লোক চাহিলেই পাওয়া যায় না। বস্তুত রাজা তাঁহার সকল প্রজারই চেয়ে যে স্বভাবত বড়ো, তাহা নহে। কিন্তু রাজ্যই রাজাকে বড়ো করে। জাপানের মিকাডো জাপানের সমস্ত সুধী, সমস্ত সাধক, সমস্ত শূরবীরদের দ্বারাই বড়ো। আমাদের সমাজপতিও সমাজের মহত্ত্বেই মহৎ হইতে থাকিবেন। সমাজের সমস্ত বড়ো লোকই তাঁহাকে বড়ো করিয়া তুলিবে। মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলস থাকে, তাহা নিজে উচ্চ নহে—মন্দিরের উচ্চতাই তাহাকে উচ্চ করে।

আমি কেবল এইটুকুমাত্র বলিব, আসুন আমরা মনকে প্রস্তুত করি—ক্ষুদ্র দলাদলি, কুতর্ক, পরনিন্দা, সংশয় ও অতিবুদ্ধি হইতে হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে ক্ষালন করিয়া অদ্য মাতৃভূমির বিশেষ প্রয়োজনের দিনে, জননীর বিশেষ আহ্বানের দিনে চিত্তকে উদার করিয়া কর্মের প্রতি অনুকূল করিয়া, সর্বপ্রকার লক্ষ্যবিহীন অতি সূক্ষ্ম যুক্তিবাদের ভণ্ডুলতাকে সবেগে আবর্জনাস্তূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, এবং নিগূঢ় আত্মাভিমানকে তাহার শতসহস্র রক্ততৃষার্ত শিকড় সমেত হৃদয়ের অন্ধকার গুহাতল হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া সমাজের শূন্য আসনে বিনম্র-বিনীতভাবে আমাদের সমাজপতির অভিষেক করি, আশ্রয়চ্যুত সমাজকে সনাথ করি।

শিক্ষার বাহন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় মানুষের কত প্রয়োজন সে কথা বলা বাহুল্য। অথচ সেদিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষিকে বিদ্যা শিখাইলে তার চাষ করিবার শক্তি কমে কি না, স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে তার হরিভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কি না এ-সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু দিনের আলোককে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরও বড়ো করিয়া দেখিতে পারি, সে হইতেছে জাগার প্রয়োজন। এবং তার চেয়ে আরও বড়ো কথা, এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়।

জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলাদেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।

জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়—সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কত বহু দূরে দূরে এবং কত মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরম যোগের পথ কত সংকীর্ণ, যে যোগ জ্ঞানের যোগ, যে যোগে সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে।

যাহা হউক, বিদ্যাশিক্ষার উপায় ভারতবর্ষে কিছু কিছু হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাবিস্তারের বাধা এখানে মস্ত বেশি। নদী দেশের একধার দিয়া চলে, বৃষ্টি আকাশ জুড়িয়া হয়। তাই ফসলের সব চেয়ে বড়ো বন্ধু বৃষ্টি, নদী তার অনেক নীচে; শুধু তাই নয়, এই বৃষ্টিধারার উপরেই নদীজলের গভীরতা, বেগ এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

কিন্তু আমাদের বিলাতি বিদ্যাটা কেমন ইস্কুলের জিনিস হইয়া সাইনবোর্ডে টাঙানো

থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সমগ্রী হইয়া যায় না। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিস আছে তার অনেকখানি আমাদের নোটবুকেই আছে; সে কী চিন্তায়, কী কাজে ফলিয়া উঠিতে চায় না।

আমাদের দেশের আধুনিক পণ্ডিত বলেন, ইহার একমাত্র কারণ জিনিসটা বিদেশী। এ কথা মানি না। যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই। ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে তা পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয় তবে ওটা আলোই নয়। বস্তুত যদি এমন কোনো ভালো থাকে যা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো তবে তা ভালোই নয় এ কথা জোর করিয়া বলিব। যদি ভারতের দেবতা ভারতেরই হন তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার।

আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই—তার চলাফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সর্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাত্মা গোখলে এই লইয়া লড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের কাছ হইতেই তিনি সব চেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলাদেশে শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলাদেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছনে ফিরিয়াছে। আমরা ঠিক করিয়াছি সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছন মুখে চলিব, কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উড়িবার পথে আমরা সামনের দিকে উড়িব, আমাদের পা যেদিকে আমাদের ডানা ঠিক তার উল্টো দিকে গজাইবে।

যে সর্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাইবে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না, তার উপরে আবার আর-এক উপসর্গ জুটিয়াছে। এক দিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্য দিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সংকীর্ণ উচ্চশিক্ষার আয়তনকে আরও সংকীর্ণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘটুক কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে সে দিকে কড়া দৃষ্টি।

বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রপ্তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।

এ পর্যন্ত এ অসুবিধাটাকে আমাদের অসুখ বোধ হয় নাই। কেননা মুখে যাই বলি মনের মধ্যে এই শহরটাকেই দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। দাক্ষিণ্য যখন খুব

বেশি হয় তখন এই পর্যন্ত বলি, আচ্ছা বেশ, খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলা ভাষায় দেওয়া চলিবে কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্।

আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।

আমাদের ভরসা এতই কম যে, ইস্কুল-কলেজের বাহিরে আমরা যে-সব লোকশিক্ষার আয়োজন করিয়াছি সেখানেও বাংলা ভাষার প্রবেশ নিষেধ। বিজ্ঞানশিক্ষাবিস্তারের জন্য দেশের লোকের চাঁদায় বহুকাল হইতে শহরে এক বিজ্ঞানসভা খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচ্যদেশের কোনো কোনো রাজার মতো গৌরবনাশের ভয়ে জনসাধারণের কাছে সে বাহির হইতেই চায় না। বরং অচল হইয়া থাকিবে তবু কিছুতে সে বাংলা বলিবে না। ও যেন বাঙালির চাঁদা দিয়া বাঁধানো পাকা ভিতের উপর বাঙালির অক্ষমতা ও ঔদাসীন্যের স্মরণস্তম্ভের মতো স্থাণু হইয়া আছে। কথাও বলে না, নড়েও না। উহাকে ভুলিতেও পারি না, উহাকে মনে রাখাও শক্ত। ওজর এই যে, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের ভীরুর ওজর। কঠিন বৈকি, সেইজন্যেই কঠোর সংকল্প চাই। একবার ভাবিয়া দেখুন, একে ইংরেজি তাতে সায়ান্স্ তার উপরে, দেশে যে-সকল বিজ্ঞান বিশারদ আছেন তাঁরা জগদ্‌বিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই যে একটুখানি বিজ্ঞানের নীড় দেশের লোক বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের ফলাও জায়গা নাই, এমন অবস্থায় এই পদার্থটা বঙ্গসাগরের তলায় যদি ডুব মারিয়া বসে তবে ইহার সাহায্যে সেখানকার মৎস্যশাবকের বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদের বাঙালির ছেলের চেয়ে যে কিছুমাত্র কম হইতে পারে এমন অপবাদ দিতে পারিব না।

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দন্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক্—সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?

বলা বাহুল্য ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই—শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন? ফরাসি জর্মান শিখিলে আরও ভালো। সেইসঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাসনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন্‌মুখে বলা যায়।

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তর হাতুড়ি-পেটাপেটি করিতে হয়—সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। আশু মুখুজ্যে মশায় ওরই মধ্যে এক-জায়গায় একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি যেটুকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই, বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হোক বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পুরা হইবে না। কিন্তু এ তো গেল যারা ইংরেজি জানে তাদেরই বিদ্যাকে চৌকশ করিবার ব্যবস্থা। আর, যারা বাংলা জানে ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এতবড়ো অস্বাভাবিক নির্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?

বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।

ভালো মতো ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?

আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত একরকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানাপ্রকারে সুবিধা হয় না? এক তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝুঁকিবে তা জানি; এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি সুতরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের মূল্যবৃদ্ধি ঐ রাস্তাটাতেই। তাই হোক—বাংলা ভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক-না কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?

আমি জানি তর্ক এই উঠিবে তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে মাঠে-বাটে নিজের পুলকে নিজেই কন্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার

জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। বঙ্গসাহিত্যপরিষৎ কিছুকাল হইতে এই কাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। পরিভাষা রচনা ও সংকলনের ভার পরিষৎ লইয়াছেন, কিছু কিছু করিয়াওছেন। দেশে এই পরিভাষা তৈরির তাগিদ কোথায়? ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কই? দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায়?

জার্মানিতে ফ্রান্সে আমেরিকায় জাপানে যে-সকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তারা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষকে তারা মুক্তিদান করিতেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে চিত্তশক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করিতেছে।

দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিন্তা করিব কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না, সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে।

বাঙ্গালা ভাষা

স্বামী বিবেকানন্দ

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত— যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা—যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈরি-ভাষা কোনো কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা—সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়—লক্ষণ।

যদি বল ও কথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে, এবং চট্টগ্রাম হ'তে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কলকেতার ভাষাই চলবে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশি নিকট, সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি

দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কলকেতার ভাষাকেই ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে-মোতির সাজ-পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভালো দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ দেখি। 'ব্রাহ্মণে'র সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর 'মীমাংসাভাষ্য' দেখ, পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' দেখ, শেষ—আচার্য শংকরের ভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীনকালের সংস্কৃত দেখ। এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচাভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ রে, সে কি ধুম-দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম ক'রে—'রাজা আসীৎ'!!! আহা হা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!!—ও-সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হ'ল, তখন এই-সব চিহ্ন উদয় হ'ল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়িটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা-পাতা চিত্র-বিচিত্রর কি ধুম!!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে-তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম! সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল—ছত্রিশ নাড়ীর টান তাই রে বাপ! তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব! এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সংগীত কোনো কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সংগীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ি ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।

বাংলার সংস্কৃতি

দীনেশচন্দ্র সেন

সহর ও নগরে যেরূপ গাঙ্গের উজান ও ভাঁটি, উলট-পালট ও পরিবর্ত্তন, বঙ্গের পল্লীতে তাহা নাই। বঙ্গের পল্লী সেদিনও ছিল আম, জাম, কাঁঠাল-তরুর ছায়াশীতল, সেখানকার কুঁড়ে ঘর গোময়লিপ্ত, অতি পরিচ্ছন্ন আঙ্গিনা, সেদিন পর্য্যন্তও তাহাতে একটা ছুঁচ পড়িলে রাত্রে কুড়াইয়া তুলিতে পারা যাইত; কারণ সেখানে বাঙ্গলার ঋতুভেদে সোনার ফসল আনিয়া মজুত করা হইত। সেদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলার মন্দির কারুকার্য্য-মণ্ডিত ছিল, সেখানে দেবতারা নিত্যভোগ পাইতেন, প্রসাদ পাইবার জন্য ছেলে-বুড়ো জড় হইত, সেখানে অতিথি ফিরিত না। মেয়েরা চরকা ছাড়িত না, তাহাদের সমস্ত শিল্পনৈপুণ্য দিয়া যে সন্দেশ তৈরী করিত, তাহাতে ফুল ও ফলের সমস্ত শোভা প্রদর্শিত হইত, তাহাদের সেলাই এক একখানি কাঁথা পারস্যের কার্পেটের মত হইত। তাহাদের আলপনা ও পিঁড়ীচিত্র দেখিলে লোকে মুগ্ধ হইয়া তাকাইয়া থাকিত। তাহাদের শিকা, পানের বাটা, পুঁথির লাঠি দেখিয়া সকলে বিমোহিত হইত। পল্লীর সূত্রধর কাঠের মধ্যে যে সকল সূক্ষ্ম কার্য্য করিত, তাহাতে কারুশিল্পের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইত। পল্লীর চিত্রকর যে সকল ছবি আঁকিত এবং পল্লীর মিস্ত্রি পোড়া ইটের উপর যে সকল ফুল লতা ও নরনারীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিত এবং পুঁথির মলাটে যে ছবি আঁকিত তাহার বিস্ময়কর সৌন্দর্য্য দেখিয়া এখনও লোকে মুগ্ধ হইয়া থাকে; পল্লীর হালুইকরের হাতে মিছরির খেলনা, নারিকেলের সন্দেশের মঠ, গৃহ, জীবজন্তু নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ছবির মত সাজানো থাকিত, নারিকেলের শাঁস দিয়া এরূপ ময়ূর গঠিত হইত, যাহার ডানা পাখা ও লেজে ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণ খেলা করিত। মৌর্য্য, গুপ্ত ও পাল-রাজত্বকে স্মরণ করাইয়া দিবার মত শিল্প-সম্ভার গ্রামবাসীরা আয়ত্ত করিয়াছিল, তাহা হিন্দুর সভ্যতার বিচিত্র আসবাব ও ধারা বজায় রাখিয়াছিল। তাঁহারাই জগজ্জয়ী কীর্ত্তনগানের স্রষ্টা, গ্রামের টোলের পণ্ডিতগণ সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া জগদ্‌গুরু উপাধি লাভ করিতেন এবং নটগণ নর্ত্তনে এরূপ চিরাগত পটুতা প্রদর্শন করিত যে গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের মত পণ্ডিত ও সমালোচক সেই নর্ত্তনের ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছেন। তিনি সমস্ত যুরোপীয় নৃত্য ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন এবং বলিয়া থাকেন যে বঙ্গের পল্লীর রাঁইবেঁশে, বাউল, জারি, দশবতার নৃত্যের যেরূপ বিজ্ঞানানুগ অঙ্গভঙ্গী ও সৌষ্ঠব—তাহাতে ইহাদের এই নৃত্য জগতে প্রথম শ্রেণীতে স্থান

পাইবার যোগ্য, এবং ইহা সেই প্রাচীন শিবতাণ্ডব ও মহাভারতীয় যুগের বৃহন্নলার নাট্য-ধারা বজায় রাখিয়াছে।

বড় বড় স্থাপত্য ও অপরাপর কলাশিল্পে ভারতের স্থান পূর্ব্ববর্ত্তী ছিল। এ সকল শিল্প রাজানুগ্রহে শ্রীসম্পন্ন হয়। যুধিষ্ঠিরের যে রাজসভা ময়দানব নির্ম্মাণ করিয়াছিল, চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীর যে ঐশ্বর্য্য, কারুকার্য্য ও স্থপতিবিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া গ্রীকদূত মেগাস্থেনিস উহা পারস্যের বিশ্ববিশ্রুত রাজধানীর গৌরবকেও হীন মনে করিয়াছিলেন, অশোকের যে বিশাল রাজপুরীর ভগ্ননিদর্শন দেখিয়া স্থপতিবিদ্যাবিশারদেরা সেই পুরাকালে এরূপ শিল্পদক্ষতা কিরূপে হইল সেই সমস্যা পূরণ করিতে অক্ষম হইয়াছেন, নালন্দার ভগ্ন মন্দিরাদির যে কারুকার্য্য দেখিয়া কানিংহামের মত শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলিয়াছেন, জগতে তিনি সেরূপ স্থাপত্য ও চারুশিল্পের এরূপ বিরাট্ নিদর্শন কোথায়ও দেখেন নাই, মথুরার সমৃদ্ধি ও স্বর্ণ-রৌপ্যের অসংখ্য দেবমূর্ত্তির যে আশ্চর্য্যগঠনপ্রণালী ও শিল্পকৃতিত্ব দেখিয়া মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ছাড়া ইলোরা-অজন্তার অপূর্ব্ব স্থাপত্য ও চিত্রশালা—দূর যবদ্বীপে বিরাট্ বরোবদর মন্দির—বহু দৌরাত্ম্য, ধ্বংস ও ক্ষয়ের পরও এই যে ভারতীয় কলাশিল্পের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাবশেষ ও নমুনা (ও তৎসম্বন্ধে বিদেশীয়দের মতামত) পাওয়া যাইতেছে—সেই অদ্ভুত শিল্প ও স্থাপত্য পরাধীন ভারতবর্ষে অসম্ভব।

হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কারের পর এই সিদ্ধান্ত স্থির নির্ণীত হইয়া গিয়াছে যে ভারতের আদিম অধিবাসীরা স্থাপত্য ও চারুশিল্পে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। পাঁচ-সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে সকল হর্ম্ম্য, পশুপক্ষী এবং নরমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে একথাটা প্রমাণিত হয় যে আর্য্যগণ কোন শিল্পসংস্কার ভারতে আনেন নাই। তাঁহারা এদেশের আদিম সভ্যতা হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অজন্তা গুহা, খেজুরাহ প্রভৃতি স্থানে আমরা রমণীমূর্ত্তির যে সকল লীলায়িত ভঙ্গী পাই, জীবজন্তুর প্রতিকৃতি দেখিতে পাই, তাহা সেই আদিম শিল্পকলার বিকাশ। আর্য্যগণ এইজন্য বোধ হয় বাহ্য ঐশ্বর্য্যের যে সকল বর্ণনা দিয়াছেন তাহা দানব রাক্ষস প্রভৃতির বিদ্যা—এই ভাবের একটা ইঙ্গিত দিয়াছেন। অযোধ্যাপুরীর যে বর্ণনা, তদপেক্ষা লঙ্কার বর্ণনা শতগুণ সমৃদ্ধিসূচক।

পাহাড়পুরের রাধাকৃষ্ণের ছবি গুপ্তরাজত্বের প্রথমভাগের, তাহার মধ্যেও অপূর্ব্ব কমনীয়তা আছে। এই লাবণ্যপূর্ণ কমনীয়তা বাঙ্গলাকলমে বাঙ্গালীর নিজস্ব; যেখানে যেখানে বাঙ্গালী গিয়াছে—সিংহল, আসাম, কাম্বোডিয়া, জাভা, বালী, শ্যাম—সর্ব্বত্রই এই কমনীয়তা তাঁহারা লইয়া গিয়াছে। মেয়েদের ও নায়কের নানারূপ নর্ত্তনশীল ভঙ্গী পাহাড়পুরের মূর্ত্তিতে ফুটিয়াছে—উত্তরকালে খেজুরাহ ও ভুবনেশ্বরের অপূর্ব্ব নরনারী-মূর্ত্তির সূচনা

ইহাতে দৃষ্ট হয়। মৃন্ময় অদ্ভুত সন্ন্যাসিমূর্ত্তি এবং বানর, সিংহ প্রভৃতি—বেশ দক্ষতার সহিত গঠিত হইয়াছে। চতুষ্কোণ পোড়া ইটের (terracotta) উপর শ্রেণীবদ্ধ মূর্ত্তি—বাঙ্গলার এই মন্দির-গাত্রের চারুশিল্পের বিশেষত্ব, পরবর্ত্তীকালে উহা খুব শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন যুগের চিত্রপদ্ধতি এই বিস্ময়কর বিহারের গাত্রে দৃষ্ট হয়। নানারূপ পুষ্পের মধ্যে 'পদ্মেরই প্রতিপত্তি অধিক' উহা বৌদ্ধদের পদ্ম-প্রীতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—অজন্তারও পদ্মই ফুলগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই বিহারের নিম্নস্তরে অনেক হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। সুন্দরবন প্রভৃতি স্থানে বহু প্রাচীন স্তূপ দৃষ্ট হয়, অভিশাপগ্রস্ত বঙ্গের ইতিহাস-লক্ষ্মী সেই সকল স্তূপের অতলতলে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। কে তাঁহাকে উদ্ধার করিবে? পাহাড়পুরে প্রাপ্তমূর্ত্তিগুলির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের লীলা ও গোচারণরত রাখালদের দৃশ্য প্রমাণ করিতেছে যে, রাইকানু এদেশে বহু প্রাচীন কালের আরাধ্য। দীক্ষিত মহাশয় মহাস্থানগড় হইতে আর একখানি লিপিযুক্ত প্রস্তর পাইয়াছেন। তাহা মৌর্য্যযুগের ব্রাহ্মীলিপিতে লিখিত।

লক্ষ্ণৌ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অসিত হালদার অজন্তা-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আশ্চর্য্যের বিষয় অজন্তার ছবির মধ্যে আমরা বাঙ্গলা দেশের প্রচুর আভাস পাই। প্রথমতঃ আমরা গুহার নিকটবর্ত্তী দূরবর্ত্তী গ্রামে বেড়াতে গিয়ে যত কুটীর দেখেছি, সবগুলিই মাটির ছাদ, অজন্তার ছবিতে অবিকল বাংলার খড়ে ছাওয়া আটচালা। সে দেশের লোক নারকেল গাছ চোখে দেখেনি, কিন্তু ছবিতে নারকেল গাছ যথেষ্ট। বঙ্গদেশে ষাঁড়ের দেহের তুলনায় তাহার স্কন্ধটা যতটা বেশী উঁচু দেখা যায় অন্য কোন দেশে সে রকম দেখা যায় না। অজন্তার ১নং গুহায় ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবিতে ঠিক আমাদের দেশের ষাঁড়ই অঙ্কিত। যশোহর, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের শত শত বৎসরের প্রাচীন কাঠের পাটার উপর আঁকা যে সকল চিত্র দেখা যায়, অজন্তার ছবির সঙ্গে তার অঙ্কনপদ্ধতি, এমন কি বর্ণ ও রেখাগুলির (অজন্তার মত অত উৎকৃষ্ট না হ'লেও) একটা অদ্ভুত মিল সহজেই অনুভূত হয়। আমাদের দুর্গা প্রতিমা প্রভৃতির চালচিত্রগুলি এখনও ঠিক অজন্তার নিয়মেই গোবর মাটির জমির উপর সাদা রং দিয়ে তার উপর আঁকা হয়। কালীঘাটের পটের ও অজন্তার রেখা-কৌশলের মধ্যে খুবই সামঞ্জস্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কালীঘাটের এই প্রচলিত পটগুলির রেখার টান দেখ্‌লেই অজন্তার শিল্পীদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এই সমস্ত দেখে কবির কথা বল্‌তে ইচ্ছে হয়—

বাঙ্গালীর পটুত্ব।

আমাদেরই কোনো সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়।
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।।"

অজন্তা গুহায় কতকগুলি চিত্রে মেয়েদের শাড়ী ও পুরুষদের ধুতি ঠিক বাঙ্গালীর মত (গ্রিফিথ্ অজন্তা, ১ম খণ্ড, ১৮-১৯ পৃষ্ঠা)। অজন্তাচিত্রাবলীর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য

ও সৌন্দর্য্য—ফুললতার মধ্যে মনুষ্য ও অপর জীবজন্তুদিগকে মানাইয়া লওয়া। কোন একটা ফুল বা 'পল্লবিনী লতা'র মধ্যে হাতীর ন্যায় একটা বড় জানোয়ার কিংবা চঞ্চুবিশিষ্ট একটা বিরাট্ মরালকে এমনিভাবে শায়িত করিয়া রাখা হইয়াছে যাহাতে সেই সপুষ্প লতার মধ্যে তাহারা বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে। উদ্ভিদ্ ও জীবচিত্রের এই মিলনে কোন বৈষম্য ঘটে নাই; একটা কল্কার ফুলগুলির মধ্যে বামনরূপে কোন পুরুষ, অর্দ্ধশায়িত রমণীরূপে কিংবা ক্ষুদ্রপদ বৃহৎমস্তিক উদ্ভট মনুষ্যরূপে-চিত্রগুলি এমনই ভাবে সাজানো আছে যে সেগুলি যেন শিল্পবাগানের অঙ্গীয় হইয়া গিয়াছে। অধুনা য়ুরোপে এই সকল কল্কার নানারূপ অনুকরণ হইতেছে। বাঙ্গালী চিত্রকরেরাও যে পল্লীগ্রামে এইভাবে জীব-উদ্ভিদের মিলন ঘটাইয়া তাহাদের কল্কার কারুকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেন, তাহার নিদর্শন আমরা অনেকগুলি পইয়াছি, যদিও চিত্রহিসাবে সেগুলি অজন্তার সমকক্ষ নহে। বাঙ্গলাদেশে ষাঁড়ের লড়াইয়ের চিত্র অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। অজন্তায় তাহা দুর্লভ নহে। তুলনায় বাঙ্গলার চিত্র নিকৃষ্ট নহে। হাতীর লড়াই, অজন্তা ও বাঙ্গলা চিত্রে, উভয়েই পাওয়া গিয়াছে।

অজন্তায় বিজয়ের অভিযানে কি অশ্বারোহী কি পদাতিক কি ধ্বজবাহক কাহারও মস্তকে উষ্ণীষ অথবা পাগড়ীর বালাই নাই। উহারা ঠিক বাঙ্গালী। অজন্তাগুহার ছাদের চিত্রগুলি সাধারণভাবে অনেকটা বাঙ্গলাদেশের দুর্গা-প্রতিমার চালচিত্রের মত। মধ্যভারতে ছতরপুরের নিকট রাজগড়ে আমরা ঐরূপ দেখিতে পাই। অজন্তার ১৮ নং চিত্রে, পুরুষের ধুতি ও স্ত্রীলোকের শাড়ী ঠিক বাঙ্গালীর মত।

অজন্তার সিংহগুলি ঠিক বাঙ্গলার চিত্রিত সিংহের মত। বাঙ্গালী চিত্রকর ও কুমারেরা এখনও ঠিক সেই আদর্শ বজায় রাখিয়াছে। উহাতে সিংহের কেশর সুস্পষ্ট নহে। মুখের আকৃতি ছাড়া অপরাপর স্থান কতকটা ঘোড়ার মত। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বাগবাজারের সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবে প্রতিমার নিম্নে ঐরূপ সিংহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মৎসঙ্কলিত প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগে প্রাচীন মহিষমর্দ্দিনীর যে ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহার সিংহও ঠিক এইরূপ। কালীঘাটের অনেক পুরাতন পটে আমরা ঐরূপ সিংহ দেখিয়াছি। সুতরাং অজন্তাগুহার চিত্রকরদের এই পশুরাজের মূর্ত্তিসংস্কার অধুনা পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় চলিয়া আসিয়াছে। অশোকস্তম্ভের উপর যে সিংহমুখ দেওয়া হইয়াছে তাহা বাঙ্গলাদেশে চিত্রকর ও কুমারদের মধ্যে বহুকাল প্রচলিত ছিল।

মধ্যযুগে এমন কি মুসলমানদের সময়েও চিত্রবিদ্যা বাঙ্গালীর নিজস্ব ছিল। পল্লীবাসিনীরা লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন। লক্ষ্মীর কৌটা খুলিয়া ইহারা ঘরবাড়ী সাজাইতে বসিতেন, ইহারা রন্ধনশালার শিল্পকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিলেন। কতটা পবিত্রতা ও সম্ভ্রমের সহিত বাঙ্গালীর মেয়েরা এইসকল শিল্পকার্য্য ও রান্না প্রস্তুত করিতেন তাহা কাজলরেখা নামক পল্লীগীতিকা পাঠ করিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। বরণডালা হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ আলপনা, দেওয়ালের চিত্র, কাঁথা, বইটে, বালিসের গেলাপ, নূতন আত্মীয়দের

বাড়ীতে পাঠাইবার জন্য পানরক্ষার উপযোগী নবীন কদলীপত্রের আধার (নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নূতন কলাপাতা জলে রাখিয়া শক্ত করা হইত, তন্মধ্যে নানারূপ বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত হইত), নানারূপ কারুমণ্ডিত শিকা ও লেপ-তোষক বাঁধিবার দড়ি, বিয়ের কনের কপালে সূক্ষ্ম চন্দনরেখার কারুকার্য্য, বাসরের প্রায় সমস্ত আসবাব, চিত্রিত পিঁড়ে ও কাগজের আসন, পাশা খেলার উপযোগী চিত্রিত কাগজ, ছেলেদের পুতুল—এরূপ শত শত প্রকারে মেয়েরা তাঁহাদের কারুকার্য্য দেখাইতেন।

বাঙ্গালী চিত্রকরের অফুরন্ত কল্পনায় একই জিনিষ অসংখ্য আকারে দেখা দিয়াছে; কি আলপনায়, কি মন্দিরের ইষ্টকে, কি প্রস্তরে, কাষ্ঠফলকে, পুঁথির মলাটে, পিত্তল বা তাম্রপটে, কি কাঁথায়—চিত্রসম্ভারের অবধি নাই। তূলির লীলায়িত রেখাপাতে কতপ্রকারের নক্সা ও কল্কা যে অঙ্কিত হইয়াছে তাহার সীমা-সংখ্যা নাই; প্রকৃতিকে অনুসরণ করিলে চিত্রকর অল্প সময়েই নিঃস্ব হইয়া পড়িতেন। কারণ প্রকৃতির সৃষ্টি বিশেষ স্থানে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক, এবং সেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দ্রব্যের সকলগুলিই তূলির যোগ্য নহে; কিন্তু যেখানে মানস হরিদ্বারের উৎস, সেখানে বিষয়বস্তুর অবধি থাকিতে পারে না, নিত্য নবজাত শিশুর ন্যায় কল্পনাসৃষ্ট কুশলতার সংখ্যা অগণিত, ভঙ্গী অগণিত এবং রূপ অগণিত। বাঙ্গলার এই ছবিগুলির যে ভাণ্ডার আছে তাহা অজন্তাকে এই স্থানে হার মানাইয়াছে। অন্যান্য দেশে এক একটি বিশেষ শিল্পী শ্রেণী আছে। কিন্তু এক শতাব্দী পূর্ব্বেও বাঙ্গলার শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে সকল জাতির রমণীই কাঁথা সেলাই, আল্‌পনা দেওয়া, পীড়ি-চিত্র, দেওয়ালে ছবি আঁকা প্রভৃতি বহু শিল্পকার্য্য জানিতেন। এখনও আসামের রেশমের উপর যে সকল সুন্দর ফুললতার কাজ দেখা যায় তথাকার রমণীরা তাহা প্রস্তুত করেন। প্রত্যেক কুমারীকেই বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার হাতের কাজ দেখাইয়া বধূরূপে নির্ব্বাচিত হইতে হয়। বাঙ্গালী রমণীরা শিল্পশাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান লইয়াই যেন ভূমিষ্ঠ হইতেন। তাঁহাদের কাজের যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাতে এখনকার দিনে যে কোন জাতির মহিলা গৌরবান্বিত হইতে পারেন। বস্তুতঃ এই শিল্পকার্য্য এদেশে এরূপ ব্যাপকরূপে সমাজে প্রচলিত ছিল যে আমাদের বাঙ্গলাদেশকে যে "মগধের চিত্রশালা" বলা হইয়াছে, তাহা অত্যুক্তি নহে। বাঙ্গলার খাঁটি শিল্প যাহার সঙ্গে মহেঞ্জোদারো এমন কি সিঙ্গানপুর-শিল্প হইতে গুপ্ত যুগের শিল্প,—অজন্তা, অমরাবতী, বালীদ্বীপ ও সিংহলের শিল্পের সাদৃশ্য স্পষ্ট, তাহাই আমাদের দেশের অব্যাহত প্রাচীন শিল্পধারা—বাঙ্গলার চিত্রশিল্পের সঙ্গে কাঙ্গড়া চিত্রশিল্পের এতটা মিল দেখা যায় যে আমরা দুই শিল্পকেই অভিন্ন মনে করি। কালীঘাটের পটুয়া ও কাঙ্গড়ার চিত্রকরদিগের একটা জায়গায় অদ্ভুত ঐক্য দেখা যায়। উভয় স্থানের চিত্রকরেরাই তাঁহাদের চিত্রে নানারূপ সরু ও মোটা, সহজ, বক্রান্ত ও কোঁকড়ান রেখা আঁকিয়া চিত্রগুলিকে একটা বৈশিষ্ট্য দিয়াছেন। অনেক সময়েই ঐ রেখাগুলি বাহ্যতঃ নিরর্থক বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু ঐ সকল রেখাপাতে চিত্রগৌরব যেন শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে।

আমাদের ধারণা কাঙ্গড়া ও কালীঘাটের কলম এক।

বইপড়া

প্রমথ চৌধুরী

প্রবন্ধ আমি লিখি এবং সম্ভবত যত লেখা উচিত তার চাইতে বেশিই লিখি, কিন্তু সে প্রবন্ধ সর্বজনসমক্ষে পাঠ করতে আমি স্বভাবতই সংকুচিত হই। লোকে বলে, আমার প্রবন্ধ কেউ পড়ে না। যে প্রবন্ধ লোকে স্বেচ্ছায় পড়ে না, সে প্রবন্ধ অপরকে পড়ে শোনানোটা অবশ্য শ্রোতাদের উপর অত্যাচার করারই শামিল।

এ সত্ত্বেও আমি আপনাদের অনুরোধে আজ যে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে প্রস্তুত হয়েছি তার কারণ, লাইব্রেরি সম্বন্ধে কথা কইবার আমার কিঞ্চিৎ অধিকার আছে।

কিছুদিন পূর্বে সাহিত্য পত্রে আমার সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে, আমি একজন 'উদাসীন গ্রন্থকীট'। এর অর্থ, কোনো-কোনো লোক যেমন সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে বনে গমন করেন, আমিও তেমনি সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে লাইব্রেরিতে আশ্রয় নিয়েছি। পুস্তকাগারের অভ্যন্তরে আমি যে আজীবন সমাধিস্থ হয়ে রয়েছি, এ জ্ঞান আমার অবশ্য ইতিপূর্বে ছিল না। সে যাই হোক, আমার আকৈশোর বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির দত্ত এই সার্টিফিকেটের বলে এ ক্ষেত্রে বই পড়া সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে সাহসী হয়েছি। লাইব্রেরিতে বইয়ের গুণগান করাটা, আমার বিশ্বাস, অসংগত হবে না।

কাব্যচর্চা না করলে মানুষে জীবনের একটা বড়ো আনন্দ থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হয়। এ আনন্দের ভান্ডার সর্বসাধারণের ভোগের জন্য সঞ্চিত রয়েছে। সুতরাং কোনো সভ্যজাতি কস্মিন্‌কালে তার দিকে পিঠ ফেরায় নি; এ দেশেও নয়, বিদেশেও নয়। বরং যে জাতির যত বেশি লোক যত বেশি বই পড়ে, সে জাতি যে তত সভ্য, এমন কথা বললে বোধ হয় অন্যায় কথা বলা হয় না। নিদ্রা-কলহে দিনযাপন করার চাইতে কাব্যচর্চায় কালাতিপাত করা যে প্রশংসনীয়, এমন কথা সংস্কৃতেই আছে। সংস্কৃত কবিরা সকলেই সংসার-বিষবৃক্ষের অমৃতোপম ফল কাব্যামৃতের রসাস্বাদ করবার উপদেশ দিলেও সেকালে সে উপদেশ কেউ গ্রাহ্য করতেন কি না, সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে। কিছুদিন পূর্বে আমারও ছিল। কেননা নিজের কলমের কালি লেখকেরা যে অমৃত বলে চালিয়ে দিতে সদাই উৎসুক, তার পরিচয় একালেও পাওয়া যায়। কিন্তু একালেও আমরা যখন ও-সব কথায় ভুলি নে, তখন সেকালেও সম্ভবত কেউ ভুলতেন না; কেননা সেকালে

সমজদারের সংখ্যা একালের চাইতে ঢের বেশি ছিল। কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, হিন্দুযুগে বই পড়াটা নাগরিকদের মধ্যে একটা মস্ত বড়ো ফ্যাশান ছিল। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, 'নাগরিক' বলতে সেকালে সেই শ্রেণীর জীব বোঝাত একালে ইংরেজিতে যাকে man about town বলে। বাংলা ভাষায় ওর কোনো নাম নেই, কেননা বাংলাদেশে ও-জাত নেই। ও বালাই যে নেই, সেটা অবশ্য সুখের বিষয়।

বীণা ও পুস্তক দুই সরস্বতীর দান হলেও ও-দুই গ্রহণ করবার সমান শক্তি এক দেহে প্রায় থাকে না। বীণাবাদন বিশেষ সাধনাসাধ্য, পুস্তকপঠন অপেক্ষাকৃত ঢের সহজ। সুতরাং বই পড়ার অধিকার যত লোকের আছে, বীণা বাজাবার অধিকার তার সিকির সিকি লোকেরও নেই। এই কারণে সকলকে জোর করে বিদ্যাশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা এ যুগের সকল সভ্য দেশেই আছে, কিন্তু কাউকে জোর করে সংগীতশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কোনো অসভ্য দেশেও নেই। অতএব নাগরিকেরা বীণা দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতেন বলে যে পুথির ডুরি খুলতেন না, এরূপ অনুমান করা অসংগত হবে। সে যাই হোক, টীকাকার বলেছেন, 'যে-সে বই নয়, তখনকার বই'; এই উক্তিই প্রমাণ যে, এটা সত্য যে সে বই পড়া হত। যে বই এখনকার নয় কিন্তু সেকালের, যাকে ইংরেজিতে বলে ক্লাসিক, তা ভদ্রসমাজে অনেক লোক ঘরে রাখে পড়বার জন্য নয়, দেখবার জন্য। কিন্তু হালের বই লোকে পড়বার জন্যই সংগ্রহ করে, কেননা অপর কোনো উদ্দেশ্যে তা গৃহজাত করবার কোনোরূপ সামাজিক দায় নেই। আর-এক কথা। আমরা বর্তমান ইউরোপের সভ্যসমাজেও দেখতে পাই যে, 'এখনকার' বই পড়া সে সমাজের সভ্যদের ফ্যাশনের একটি প্রধান অঙ্গ। আনাতোল ফ্রাঁসের টাটকা বই পড়ি নি, এ কথা বলতে প্যারিসের নাগরিকেরা যাদৃশ লজ্জিত হবেন, সম্ভবত কিপ্‌লিঙের কোনো সদ্যপ্রসূত বই পড়ি নি বলতে লন্ডনের নাগরিকেরাও তাদৃশ লজ্জিত হবেন; যদিচ আনাতোল ফ্রাঁসের লেখা যেমন সুপাঠ্য, কিপ্‌লিঙের লেখা তেমনি অপাঠ্য। এ কথা আমি আন্দাজে বলছি নে। বিলেতে একটি ব্যারিস্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। জনরব, তিনি মাসে দশ-বিশ হাজার টাকা রোজগার করতেন। অত না হোক, যা রটে তা কিছু বটেই তো। এই থেকেই আপনারা অনুমান করতে পারেন, তিনি ছিলেন কত বড়ো লোক। এত বড়ো লোক হয়েও তিনি একদিন আমার কাছে, অস্কার ওয়াইল্ডের বই পড়েন নি, এই কথাটা স্বীকার করতে এতটা মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগলেন, যতটা চোর-ডাকাতরাও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে guilty plead করতে সচরাচর করে না। অথচ তাঁর অপরাধটা কি? অস্কার ওয়াইল্ডের বই পড়েন নি, এই তো? ও-সব বই পড়েছি স্বীকার করতে আমরা লজ্জিত হই। শেষটা তিনি এর জন্য আমার কাছে কৈফিয়ত দিতে শুরু করলেন। তিনি বললেন যে, আইনের অশেষ নজির উদরস্থ করতেই তাঁর দিন কেটে গিয়েছে, সাহিত্য পড়বার তিনি অবসর পান নি। বলা বাহুল্য, এরকম ব্যক্তিকে এ দেশে আমরা একসঙ্গে রাজনীতির নেতা

এবং সাহিত্যের শাসক করে তুলতুম। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, এ কথা কবুল করতে তিনি যে এতটা লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন তার কারণ, তাঁর এ জ্ঞান ছিল যে, তিনি যত আইনজ্ঞই হোন, আর যত টাকাই করুন, তাঁর দেশে ভদ্রসমাজে কেউ তাঁকে বিদগ্ধজন বলে মান্য করবে না।

সংস্কৃত বিদগ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ cultured। বাৎস্যায়ন যাকে নাগরিক বলেন, টীকাকার তাঁকে বিদগ্ধ নামে অভিহিত করেন। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, এ দেশে পুরাকালে কালচার জিনিসটা ছিল নাগরিকতার একটা প্রধান গুণ। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে একালে আমরা যাকে সভ্য বলি সেকালে তাকে নাগরিক বলত। অপর পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় গ্রাম্যতা এবং অসভ্যতা পর্যায়-শব্দ, ইংরেজিতে যাকে বলে synonyms।

এ যুগে অবশ্য আমরা সাহিত্যচর্চাটা বিলাসের অঙ্গ বলে মনে করি নে, ও চর্চা থেকে আমরা ঐহিক এবং পারত্রিক নানারূপ সুফললাভের প্রত্যাশা রাখি।

যে সমাজে কাব্যচর্চা হচ্ছে বিলাসের একটি অঙ্গ, সে সমাজ যে সভ্য এই হচ্ছে আমার প্রথম বক্তব্য। যা মনের বস্তু তা উপভোগ করবার ক্ষমতা বর্বর জাতির মধ্যে নেই, ভোগ অর্থে তারা বোঝে কেবলমাত্র দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি পশুরাও করে, এবং তা ছাড়া আর-কিছু করে না। অপর পক্ষে যে সমাজের আয়েসির দলও কাব্যকলার আদর করে, সে সমাজ সভ্যতার অনেক সিঁড়ি ভেঙেছে। সভ্যতা জিনিসটে কি, এ প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করলে দু কথায় তার উত্তর দেওয়া শক্ত। কেননা যুগভেদে ও দেশভেদে পৃথিবীতে সভ্যতা নানা মূর্তি ধারণ করে দেখা দিয়েছে, এবং কোনো সভ্যতাই একেবারে নিরাবিল নয়; সকল সভ্যতার ভিতরই যথেষ্ট পাপ ও যথেষ্ট পাঁক আছে। নীতির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ যে আকাশপাতাল, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না। তবে মানুষের কৃতিত্বের মাপে যাচাই করতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কাব্য-কলায় শিল্পে-বাণিজ্যে সভ্যজাতি ও অসভ্যজাতির মধ্যে সাত-সমুদ্র তেরো-নদীর ব্যবধান।

পৃথিবীতে সুনীতির চাইতে সুরুচি কিছু কম দুর্লভ পদার্থ নয়। পুরাকালে সাহিত্যের চর্চা মানুষকে নীতিমান্ না করলেও রুচিমান্ করত। সমাজের পক্ষে এও একটা কম লাভ নয়।

বই পড়ার শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাই নে। প্রথমত সে পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবেন না, কেননা আমরা জাত হিসেবে শৌখিন নই; দ্বিতীয়ত অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন, কেননা আমাদের এখন ঠিক শখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগশোক-দুঃখদারিদ্র্যের

দেশে জীবনধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সে জীবনকে সুন্দর করা মহৎ করার প্রস্তাব অনেকের কাছেই নিরর্থক এবং সম্ভবত নির্মমও ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে আজ প্রস্তুত নই; কিন্তু শিক্ষার ফললাভের জন্য আমরা সকলেই উদ্‌বাহু। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই দূর করবে। এ আশা সম্ভবত দুরাশা; কিন্তু তা হলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারি নে, কেননা আমাদের উদ্ধারের অন্য কোনো সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে পাই নে। শিক্ষার মাহাত্ম্যে আমিও বিশ্বাস করি, এবং যিনিই যা বলুন, সাহিত্যচর্চা যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনো নগদ বাজার-দর নেই। এই কারণেই ডেমোক্রাসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা। ডেমোক্রাসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে, কিন্তু তাঁদের শিষ্যেরা তাঁদের কথা উলটো বুঝে প্রতিজনেই হতে চায় বড়োমানুষ। একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডেমোক্রাসির গুণগুলি আয়ত্ত করতে না পারি, তার দোষগুলি আত্মসাৎ করেছি। এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়। আমাদের শিক্ষিতসমাজের লোলুপ দৃষ্টি আজ অর্থের উপরেই পড়ে রয়েছে, সুতরাং সাহিত্যচর্চার সুফল সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সন্দিহান। যাঁরা হাজারখানা ল-রিপোর্ট কেনেন, তাঁরা একখানা কাব্যগ্রন্থও কিনতে প্রস্তুত নন; কেননা তাতে ব্যবসার কোনো সুসার নেই। নজির না আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে দাঁড়িয়ে হারতে হবে, সে তো জানা কথা। কিন্তু যে কথা জজে শোনে না, তার যে কোনো মূল্য নেই, এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি। জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডার নয়, এ সত্য তো প্রত্যক্ষ; কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও এও সমান সত্য যে এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য, সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী। তার পর যে জাতি মনে বড়ো নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড়ো নয়; কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মনসাপেক্ষ। এবং মানুষের মনকে সবল সচল সরাগ ও সমৃদ্ধ করবার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কেননা মানুষের দর্শন-বিজ্ঞান ধর্ম-নীতি অনুরাগ-বিরাগ আশা-নৈরাশ্য তার অন্তরের স্বপ্ন ও সত্য, এই-সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে, সে-সব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সব হচ্ছে মনগঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ স্রোত আবহমান কাল সাহিত্যের ভিতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে; এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপ হতে মুক্ত হব।

সুন্দর

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যারা ভারি পণ্ডিত তারা সুন্দরকে প্রদীপ ধরে দেখতে চলে আর যারা কবি ও রূপদক্ষ তারা সুন্দরের নিজেরই প্রভায় সুন্দরকে দেখে নেয়, অন্ধকারের মধ্যেও অভিসার করে তাদের মন। আলোর বেলাতেই কেবল সুন্দর আসেন দেখা দিতে, কালোর দিক থেকে তিনি দূরে থাকেন—একথা একেবারেই বলা চললো না, বিষম অন্ধকার না বলে বলতে হল বিশদ অন্ধকার—যদিও ভাষাতত্ত্ববিদ এরূপ করায় দোষ দেখবেন। কালো দিয়ে যে আলো এবং রঙ সবই ব্যক্ত করা যায় সুন্দরভাবে তা রূপদক্ষ মাত্রেই জানেন। এইযে সুন্দর কালো এর সাধনা বড় কঠিন। সেইজন্য জাপানে ও চীনদেশে একটা বয়স না পার হলে কালি দিয়ে ছবি আঁকতে চেষ্টা করতে হুকুম পায় না গুরুর কাছ থেকে শিল্পশিক্ষার্থীরা। যে রচনায় রস রইলো সেই রচনাই সুন্দর হল এটা স্থির, কিন্তু রস পাবার মতো মনটি সকল মানুষেই সমানভাবে বিদ্যমান নেই, কাজেই এটা ভালো ওটা ভালো নয় এইরকম কথা ওঠে। মেঘের সঙ্গে ময়ূরের মিত্রতা, তাই কোন একদিন নিজের গলা থেকে গন্ধর্ব নগরের বিচিত্র রঙের তারাফুলে-গাঁথা রঙিন মালা ময়ূরের গলায় পরিয়ে দিয়ে মেঘ তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলে। মানুষ প্রথম ভাবলে, এমন সুন্দর সাজ কারো নেই। তারপর হঠাৎ একদিন সে দেখলে বকের পাঁতি পদ্মফুলের মালার ছলে সুন্দর হয়ে মেঘের বুক থেকে মাটির বুকে নেমে এলো, মানুষ বললে, ময়ূর ও বক এরা দুইটিই সুন্দর। আবার এলো একদিন জলের ধারে সারস পাখি—মেঘ যাকে নিজের গায়ের রঙে সাজিয়ে পাঠালে। এমনি একের পর এক সুন্দর দেখতে-দেখতে মানুষ বর্ষাকাল কাটালে, তারপর শরতে দেখা দিলে আকাশে নীল পদ্মমালার দুটি পাপড়িতে সেজে নীলকণ্ঠ পাখি, এমনি ঋতুর পর ঋতুতে সুন্দরের সন্দেশবহ আসতে লাগলো একটির পর একটি মানুষের কাছে—সব শেষে এলো রাতের কালো পাখি আকাশপটের আলো নিভিয়ে অন্ধকার দুখানি পাখ্না মেলে—পৃথিবীর কোনো ফুল, আকাশের কোনো তারার সঙ্গে মানুষ তার তুলনা খুঁজে না পেয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো!

এইযে একটি মানুষের কথা বললেম, এমন মানুষ জগতে একটি দুটি পাই যার কাছে সুন্দর ধরা দিচ্ছেন সকল দিকে নানা সাজে নানা রূপে বর্ণে সুরে ছন্দে। ময়ূরই সুন্দর, কলবিঙ্ক নয়, কাক নয় এই কথা যারা বলছে এমন মানুষই পৃথিবী ছেয়ে রয়েছে দেখতে পাই।

সুরের নানা ভঙ্গি দখল না করে আমাদের গাইয়ে মুখভঙ্গিটাতেই যখন পাকা হয়ে উঠলো, তখন সভার লোকে দূর ছাই করে তাকে গঞ্জনা দিলে, সুরের সৌন্দর্য ফুটলো না তার চেষ্টায় বটে কিন্তু ঐ মুখভঙ্গি অঙ্গভঙ্গির মধ্যে আর-একটা জিনিস ফুটলো যেটি হয়ে উঠলো একখানি সুন্দর ছবি ওস্তাদের!

আর্টিস্টদের কেউ-কেউ ভুল করে বলেন 'সুন্দরের সন্ধানী'। সুন্দর যাকে ঘিরে থাকে না সেই বেড়ায় সুন্দরের খোঁজে গড়ের মাঠে জু গার্ডেনে মিউজিয়ামে—এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সুন্দর কি, সুন্দর কি নয় এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক লেখা-লেখি এবং সৌন্দর্যতত্ত্বের রসতত্ত্বের যত পুঁথি আছে তার বচন ধরে-ধরে যেন লাঠি-হাতে চলা। ততক্ষণ সুন্দর যতক্ষণ কাছে নেই, সুন্দর এলেন তো ওসব ফেলে চললো মন স্বচ্ছন্দে অবাধগতিতে সব তর্ক ভুলে। অজ রাজা যখন নগরে প্রবেশ করেছিলেন তখনকার কথা কার না জানা আছে? ফুল ফুটে গিয়েছিল সেদিন আপনা হতেই। মধুকরের কাছে যেভাবে হাওয়া এসে মধুর খবর দিয়ে যায় সেইভাবে খবর আসে সুন্দরের যে লোক যথার্থ আর্টিস্ট তার কাছে, তাকে ঘুরে বেড়াতে হয় না সুন্দরকে খুঁজে-খুঁজে, আর্টিস্টে আর সুন্দরে লুকোচুরির লীলা চলে অনেক সময়ে কিন্তু সে দুই ছেলেতে পরিচয় হবার পরে খেলার মতো, ইচ্ছা করে গোপন থেকে পর্দা টেনে দিয়ে খেলা,—তার মধ্যে রস আছে বলেই খেলা চলে। যে সুন্দরকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সন্ধান করছে তার ছুটোছুটির সঙ্গে এ খেলার তফাত রয়েছে।

পিঁপড়ে ছুটোছুটি করে চিনির সন্ধানে কিন্তু মধু আহরণে মৌমাছির ছুটোছুটি সে একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। পিঁপড়ের চিনি-সংগ্রহের সঙ্গে তার পেটের যোগ, চিনি না পেলে সে মরা ইঁদুরে গিয়ে চিম্‌টি বসায় কিন্তু পেট খুব তাড়া দিলেও মাছের আর মাংসের যুষ দিয়ে মৌচাক ভর্তি করতে চলে না মৌমাছি। মৌমাছি কি খেয়ে বাঁচে এবং আর্টিস্ট তারাও কি খেয়ে জীবনধারণ করে তার রহস্য এখনো ভেদ হয়নি। শুধু এটুকু বলা যায় যে তারা পিঁপড়ের মতো সুন্দর সামগ্রীকে পেটের তাড়নার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে সুন্দরের সন্ধানে বার হয় না, ফুল ফোটে ওধারে সুন্দর হয়ে খবর আসে বাতাসে তাদের কাছে, চলে যায় তারা সুন্দরের নিমন্ত্রণে, সন্ধানে নয়। মৌচাকে যেমন মধু তেমনি ছবি মূর্তি কবিতা গান কত কি পাত্রে ধরলে মানুষ সুন্দরকে, এদিকে আবার বিশ্বজগতে সুন্দর নিজেকে ধরে দিলেন আপনা হতেই ফুলে ফলে লতায় পাতায় জলে স্থলে আকাশে কত স্থানে তার ঠিকানা নেই, এত সুন্দর আয়োজন কিন্তু ভোগে এলো শুধু দু-চার জনের, আর বাকি অধিকাংশ তারা এসবের মধ্যে থেকে শুধু সৌন্দর্যতত্ত্বই বার করতে বসে গেলো। সেই বেজান্ শহরের কথা মনে হয়; উপবনে সেখানে পাখি গাইলো ফুল ফুটলো মুকুল খুললো ফল ধরলো পাতা ঝরলো, সবই সুন্দরভাবে হয়ে চললো দিনে রাতে, কিন্তু শহরের কোনো মানুষ এগুলো থেকে কিছু নিতে পারলে না, পাথরের চেয়েও

পাথর হয়ে বসে রইলো, শুধু দু-চার জন পথিক দুটো-একটা হতভাগা ভিখিরী নয় পাগল তারাই কেবল থেকে-থেকে এলো গেলো সেই দেশের সেই বাগানে যেখানে দৃষ্টি-ভোলানো সুন্দরের সামনে মুখ করে বসে আছে মূক অন্ধ বধির নিশ্চল মানুষের দল ঘোলা চোখ মেলে।

যার চোখ সুন্দরকে দেখতে পেলে না আজন্ম তার চোখের উপরে জ্ঞানাঞ্জনশলাকা ঘষে-ঘষে ক্ষইয়ে ফেললেও ফল পাওয়া যায় না, আবার যে সুন্দরকে দেখতে পেলে সে অতি সহজেই দেখে নিতে পারলে সুন্দরকে, কোনো গুরুর উপদেশ পরামর্শ এবং ডাক্তারি দরকার হল না তার, বিনা অঞ্জনেই সে নয়নরঞ্জনকে চিনে গেলো।

মাটি থেকে আরম্ভ করে সোনা পর্যন্ত, যে ভাষায় কথা চলে সেটি থেকে ছন্দোময় ভাষা পর্যন্ত, তারের সুর থেকে গলার সুর পর্যন্ত বহুতর উপকরণ দিয়ে রূপদক্ষেরা রচনা করে চলেছেন সুন্দরের জন্য বিচিত্র আসন, মানুষের কাজে কতটা লাগবে কি না-লাগবে এ ভাবনা তাঁদের নেই। কাদায় যে গড়ে সে কাদাছানা থেকেই সুন্দরের ধ্যান করে চলে, না হলে গড়ার উপযুক্ত করে মাটি কিছুতে প্রস্তুত করতে পারে না সে—এ কথাটা কারিগরের কাছে হেঁয়ালি নয়। চাষের আরম্ভ থেকেই সোনার ধানের স্বপ্ন জমিতে বিছিয়ে দেয় চাষা কিন্তু যার সুন্দরের ধ্যান মনে নেই সে যখন ভালো মাটি নিয়ে বসে যায় এবং দেখে মাটি বাগ মানছে না তার হাতে, তখন সে হয়তো বোঝে হয়তো বোঝেও না কথাটার মর্ম।

ছন্দ, সুরসার এবং রঙ প্রস্তুত ও তুলি টানার প্রকরণ সহজে মানুষ আয়ত্ত করতে পারে কিন্তু তুলি টানা হাতুড়ির পেটা কলম চালানোর আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দরের ধ্যানে মনকে স্থির রাখতে সবাই পারে না, এমনকি রূপদক্ষ তারাও সময়ে-সময়ে লক্ষ্য হারিয়ে ফেলছে তাও দেখা যায়।

যে রচনাটি সর্বাঙ্গসুন্দর তার মধ্যে রচনার কল-কৌশল ধরা থাকে না— কথা সে যেন ভারি সহজে বলা হয়ে যায় সেখানে! এইযে সহজ গতি এ থাকে না যা সর্বাঙ্গসুন্দর নয় তাতে—কৌশল নৈপুণ্য সবই চোখে পড়ে। কবিতা থেকে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, ছবি মূর্তি সব থেকে এটা প্রমাণ করা চলে। কর্ম কোনো রকমে নিষ্পন্ন হল এবং কর্ম খুব হাঁকডাক ধুমধামে নিষ্পন্ন হল এ দুয়েরেই চেয়ে ভালো হল কর্মটি যখন সহজে নিষ্পন্ন হয়ে গেলো কিন্তু কর্মের জঞ্জালগুলো চোখে পড়লো না।

অপবিজ্ঞান

রাজশেখর বসু

বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধসংস্কার ক্রমশ দূর হইতেছে। কিন্তু যাহা যাইতেছে তাহার স্থানে নূতন জঞ্জাল কিছু কিছু জমিতেছে। ধর্মের বুলি লইয়া যেমন অপধর্ম সৃষ্ট হয়, তেমনি বিজ্ঞানের বুলি লইয়া অপবিজ্ঞান গড়িয়া উঠে। সকল দেশেই বিজ্ঞানের নামে অনেক নূতন ভ্রান্তি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশে যেসকল ভ্রান্ত ধারণা এদেশে লোকপ্রিয় হইয়াছে, তাহারই কয়েকটির কথা বলিতেছি।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য—বিদ্যুৎ। তীব্র উপহাসের ফলে এই শব্দটির প্রয়োগে আজকাল কিঞ্চিৎ সংযম আসিয়াছে। টিকিতে বিদ্যুৎ, পইতায় বিদ্যুৎ, গঙ্গাজলে বিদ্যুৎ—এখন বড় একটা শোনা যায় না। গল্প শুনিয়াছি, এক সভায় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অগস্ত্যের ক্রুদ্ধ চক্ষু হইতে এমন প্রচণ্ড বিদ্যুৎস্রোত নির্গত হইল যে সমস্ত সমুদ্রের জল এক নিমেষে বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন অক্সিজেন রূপে উবিয়া গেল। সকলে অবাক হইয়া এই ব্যাখ্যা শুনিল, কেবল একজন ধৃষ্ট শ্রোতা বলিল—'আরে না মশায়, আপনি জানেন না, চোঁ ক'রে মেরে দিয়েছিল'।

বিদ্যুতের মহিমা কমিলেও একেবারে লোপ পায় নাই। বৈদ্যুতিক সালসা বৈদ্যুতিক আংটি বাজারে সুপ্রচলিত। অষ্টধাতুর মাদুলির গুণ এখন আর শাস্ত্র বা প্রবাদের উপর নির্ভর করে না। ব্যাটারিতে দুই রকম ধাতু থাকে বলিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, অতএব অষ্টধাতুর উপযোগিতা আরও বেশী না হইবে কেন!

উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শুইতে নাই, শাস্ত্রে বারণ আছে। শাস্ত্র কারণ নির্দেশ করে না সুতরাং বিজ্ঞানকে সাক্ষী মানা হইয়াছে। পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড চুম্বক, মানুষের দেহও নাকি চুম্বকধর্মী। অতএব উত্তরমেরুর দিকে মাথা না রাখাই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু দক্ষিণমেরু নিরাপদ কেন হইল তাহার কারণ কেহ দেন নাই।

জোনাকিপোকা প্রদীপে পুড়িলে যে ধুঁয়া বাহির হয় তাহা অত্যন্ত বিষ এই প্রবাদ বহুপ্রচলিত। অপবিজ্ঞান বলে—জোনাকি হইতে আলোক বাহির হয় অতএব তাহাতে প্রচুর ফসফরস আছে, এবং ফসফরসের ধুঁয়া মারাত্মক বিষ। প্রকৃত কথা—ফসফরস যখন মৌলিক অবস্থায় থাকে তখন বায়ুর স্পর্শে তাহা হইতে আলোক বাহির হয়, এবং

ফসফরস বিষও বটে। কিন্তু জোনাকির আলোক ফসফরস-জনিত নয়। প্রাণিদেহ মাত্রেই কিঞ্চিৎ ফসফরস আছে, কিন্তু তাহা যৌগিক অবস্থায় আছে, এবং তাহাতে বিষধর্ম নাই। এক টুকরা মাছে যত ফসফরস আছে, একটি জোনাকিতে তাহার অপেক্ষা অনেক কম আছে। মাছ-পোড়া যেমন নিরাপদ, জোনাকি-পোড়াও তেমন।

কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক নামের একটা মোহিনী শক্তি আছে, লোকে সেই নাম শিখিলে স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করে। 'গাটাপার্চা' এইরকম একটি মুখরোচক শব্দ। ফাউন্টেন পেন চিরুনি চশমার ফ্রেম প্রভৃতি বহু বস্তুর উপাদানকে লোকে নির্বিচারে গাটাপার্চা বলে। গাটাপার্চা রবারের ন্যায় বৃক্ষবিশেষের নিয্যন্দ। ইহাতে বৈদ্যুতিক তারের আবরণ হয়, জলরোধক বার্নিশ হয়, ডাক্তারি চিকিৎসায় ইহার পাত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণত লোকে যাহাকে গাটাপার্চা বলে তাহা অন্য বস্তু। আজকাল যেসকল শৃঙ্গবৎ কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে তাহার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।—

নাইট্রিক অ্যাসিড তুলা ইত্যাদি হইতে সেলিউলয়েড হয়। ইহা কাচতুল্য স্বচ্ছ, কিন্তু অন্য উপাদান যোগে রঞ্জিত চিত্রিত বা হাতির দাঁতের ন্যায় সাদা করা যায়। ফোটোগ্রাফের ফিল্ম, মোটর গাড়ির জানালা, হার্মোনিয়মের চাবি, পুতুল, চিরুনি, বোতাম প্রভৃতি অনেক জিনিসের উপাদান সেলিউলয়েড। অনেক চশমার ফ্রেমও এই পদার্থ।

রবারের সহিত গন্ধক মিলাইয়া ইবনাইট বা ভল্‌কানাইট প্রস্তুত হয়। বাংলায় ইহাকে 'কাচকড়া' বলা হয়, যদিও কাচকড়ার মূল অর্থ কাছিমের খোলা। ইবনাইট স্বচ্ছ নয়। ইহা হইতে ফাউন্টেন পেন চিরুনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

আরও নানাজাতীয় স্বচ্ছ বা শৃঙ্গবৎ পদার্থ বিভিন্ন নামে বাজারে চলিতেছে, যথা— সেলোফেন, ভিসকোজ, গ্যালালিথ, ব্যাকেলাইট ইত্যাদি। এগুলির উপাদান ও প্রস্তুতপ্রণালী বিভিন্ন। নকল রেশম, নকল হাতির দাঁত, নানারকম বার্নিশ, বোতাম, চিরুনি প্রভৃতি বহু শৌখিন জিনিস ঐসকল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়।

আর একটি ভ্রান্তিকর নাম সম্প্রতি সৃষ্টি হইয়াছে—'আলপাকা শাড়ি'। আলপাকা একপ্রকার পশমী কাপড়। কিন্তু আলপাকা শাড়িতে পশমের লেশ নাই, ইহা কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত।

টিন শব্দের অপপ্রয়োগ আমরা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছি। ইহার প্রকৃত অর্থ রাং, ইংরেজীতে তাহাই মুখ্য অর্থ। কিন্তু আর এক অর্থ—রাং-এর লেপ দেওয়া লোহার পাত অথবা তাহা হইতে প্রস্তুত আধার, যথা 'কেরোসিনের টিন'। ঘর ছাহিবার করুগেটেড লোহায় দস্তার লেপ থাকে। তাহাও 'টিন' আখ্যা পাইয়াছে, যথা 'টিনের ছাদ'।

আজকাল মনোবিদ্যার উপর শিক্ষিত জনের প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহার ফলে এই বিদ্যার বুলি সর্বত্র শোনা যাইতেছে। Psychological moment কথাটি বহুদিন হইতে সংবাদপত্র ও বক্তৃতার অপরিহার্য বুকনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি আর একটি শব্দ চলিতেছে—complex। অমুক লোক ভীরু বা অন্যের অনুগত, অতএব তাহার inferiority complex আছে। অমুক লোক সাঁতার দিতে ভালবাসে, অতএব তাহার water complex আছে। বিজ্ঞানীর দুর্ভাগ্য—তিনি মাথা ঘামাইয়া যে পরিভাষা রচনা করেন সাধারণে তাহা কাড়িয়া লইয়া অপপ্রয়োগ করে, এবং অবশেষে একটা বিকৃত কদর্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বিজ্ঞানীকে স্বাধিকারচ্যুত করে।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য—জটিলকে অপেক্ষাকৃত সরল করা, বহু বিসদৃশ ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র বাহির করা। বিজ্ঞান নির্ধারণ করে—অমুক ঘটনার সহিত অমুক ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ইহাতে এই হয়। কেন হয় তাহার চূড়ান্ত জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে না। গাছ হইতে স্খলিত হইলে ফল মাটিতে পড়ে; কারণ বলা হয়—পৃথিবীর আকর্ষণ। কেন আকর্ষণ করে বিজ্ঞান এখনও জানে না। জানিতে পারিলেও আবার নূতন সমস্যা উঠিবে। নিউটন আবিষ্কার করিয়াছেন, জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পর আকর্ষণ করে। জড়ের এই ধর্মের নাম মহাকর্ষ বা gravitation। এই আকর্ষণের রীতি নির্দেশ করিয়া নিউটন যে সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা law of gravitation, মহাকর্ষের নিয়ম। ইহাতে আকর্ষণের হেতুর উল্লেখ নাই। মানুষ মাত্রই মরে ইহা অবধারিত সত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষের এই ধর্মের নাম মরত্ব। কিন্তু মৃত্যুর কারণ মরত্ব নয়।

বিজ্ঞানশাস্ত্র বারংবার সতর্ক করিয়াছে—মানুষ যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ঘটনার লক্ষিত রীতি মাত্র, ঘটনার কারণ নয়, laws are not causes। যাহাকে আমরা কারণ বলি তাহা ব্যাপারপরম্পরা বা ঘটনার সম্বন্ধ মাত্র, তাহার শেষ নাই ইয়ত্তা নাই। যাহা চরম ও নিরপেক্ষ কারণ তাহা বিজ্ঞানীর অনধিগম্য। দার্শনিক স্মরণাতীত কাল হইতে তাহার সন্ধান করিতেছেন।

স্ত্রীজাতির অবনতি

বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন

আমাদের শয়ন-কক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন—কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোন উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করেন।

সহস্র জনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য নহে। তাই একটু আশার আলোক-দীপ্তি পাইতে-না পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশে লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে, তাঁহারা "স্ত্রীশিক্ষা" শব্দ শুনিলেই "শিক্ষার কুফলের" একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ "শিক্ষার" ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে "স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার"।

আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরী লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকুরী গ্রহণ অসম্ভব, সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি, "ভরসা কেবল পতিতপাবন", কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, উর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে ("God helps those that helps themselves")। তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে, পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয়, স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক

শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয় এবং সেইজন্যে তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা সূচিকর্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া পতি পুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্মণ্য পুরুষেরাই "স্বামী" থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন তিনিও ত স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না। ইহার কারণ এই যে, বহুকাল হইতে নারী-হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায়, নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই "দাসী" হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই—এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কি করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইবে? কি করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমতঃ সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যিক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী-কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী-ব্যারিস্টার, লেডী-জজ — সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে "রানী" করিয়া ফেলিব। উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা "স্বামী"র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?....

আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রেও ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক।

যদি বল, আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ, হীন বুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহু-লতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কি না।

পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে?

পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে — একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা—উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে — সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের অবশ্যক। প্রথমতঃ উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন — আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন। তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।

শিল্পপ্রসঙ্গ

নন্দলাল বসু

শিল্পবস্তু কাকে বলে?

শিল্প হল কল্পনা। রেখায় রঙে রূপে রসানুভূতির প্রকাশ। রসের উদ্রেক করাতেই তার সার্থকতা। প্রকাশের জন্য করণকৌশলের প্রয়োজন আছে; সে হল উপায়, উদ্দেশ্য নয়; করণকৌশলের জ্ঞান শিল্পের প্রেরণাও নয়। শিল্পীর কাজে রসেরই প্রেরণায় রূপের একটি প্রাণময় ছন্দ সৃজিত হয় এবং বিশেষ রূপের বিশেষ ছন্দ বিশ্বব্যাপী প্রাণের ছন্দে মিলিত ও সমন্বিত হয়। একে দরদ বলা চলে; এই দরদের ফলে শিল্পী যা তাঁর ধ্যানের বস্তু, যা তাঁর প্রকাশের বিষয়, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। শিল্পের ভিতর শিল্পীও অমরতা পান। শিল্পীর জীবন—শিল্পীর সত্তা — শিল্পের স্বচ্ছ মুকুরে প্রতিভাত হয়; উভয়কে পৃথক করা চলে না।

শিল্প হল সৃষ্টি। স্বভাবের অনুকরণ নয়। বাহ্য স্বভাবের মধ্যে সৃষ্টির যে আবেগ নিরন্তর ক্রিয়াশীল, শিল্পীর স্ব-ভাবেও তারই প্রেরণা, তারই ক্রিয়া; সুতরাং, অনুকরণের কথা ওঠে না।

শিল্প হল শিল্পীর ধ্যান বা 'চিন্তা'; অন্যের ধ্যানে বা 'চিন্তা'য় সঞ্চারিত হতে হলে তাকে সংহত রূপ নিতে হয়। জনে জনে সঞ্চারিত হয় অনেক-কিছুই অনেক উপায়ে; রসের সঞ্চার হয় একমাত্র শিল্পের ভাষায়।

শিল্প হল ছন্দ। ভাব, অনুভূতি, রূপ, রঙ, গতি, ছন্দিত হলে তবেই নন্দনীয়তা (aesthetic value) লাভ করে; রসের সুষ্ঠুতম প্রকাশ হল ছন্দে। শিল্পসৃষ্টিতে উদ্দেশ্য উপায় ও উপকরণ যখন একই ছন্দে গ্রথিত হয় তখনই শক্তির আর কোনো অপচয় ঘটতে পারে না।

আলংকারিকদের ভাষায় বলতে গেলে, শিল্প হল ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। একটু রূপ, একটু রঙ, একটু রেখা, এই দিয়ে ইঙ্গিতে অনেকখানি ভাবনা ও বেদনার অনুষঙ্গ জাগিয়ে তোলা তার কাজ।

পরিপ্রেক্ষিত কাকে বলে? চিত্রশিল্পে তার উপযোগিতা কী?

'দৃশ্যমান বিষয়ের বিভিন্ন অংশের যেরূপ দূরত্ব নিকটত্ব ঘনত্ব ইত্যাদি বোধ হয় চিত্রে তদ্রূপ প্রকাশ' [১] পরিপ্রেক্ষিত নামে পরিচিত। ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যেতে পারে, চিত্রকরের জানা প্রয়োজন যে, একই আয়তনের দুটি জিনিসের মধ্যে কাছেরটি বড়ো ও দূরেরটি ছোটো দেখায়। ছবি আঁকতে গিয়ে এ কথা ভুললে চক্ষুর অভ্যাসকে বিভ্রান্ত করা হবে বা চাক্ষুষ পরিপ্রেক্ষিতের নিয়ম ভাঙা হবে। কিন্তু, এও তো মনে রাখা দরকার যে, চিত্র কেবল চোখের দেখা নয়। মনের দেখাতে দূরের জিনিসও কাছে আসতে পারে; কাছের জিনিসও দূরে গিয়ে ছোটো হওয়া বা লুপ্ত হওয়া বিচিত্র নয়। নিকট ও দূরের কোনো ধ্রুবমান মনের ভিতর নেই। প্রাচ্য শিল্পী সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে এ কথা মানেন, সেজন্য প্রাচ্য চিত্রকলায় চাক্ষুষ বা স্বাভাবিক পরিপ্রেক্ষিত নষ্ট হলেই-যে সব সময়ে রসসৃষ্টির বা ছন্দসৃষ্টির হানি হবে এ কথা মানেন না। শিল্পীর চোখ তো শিল্পী নয়, মনই শিল্পী। শিল্পের রসগ্রহণও চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে।

আমরা একটা গাছ দেখেও দেখলাম না। যেমনি শিল্পীর তূলিতে তা রূপ পেল অমনি তার গূঢ় সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়ে মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করল—কেন এমন হয়?

শিল্পী তো স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ করেন না। শিল্পের বিষয়ে তিনি কিছু যোগ করেন, তা থেকে কিছু বাদও দেন, রূপের এমন-কিছু রূপান্তর ঘটান যাতে তা নূতনতার চমক দেয় দর্শকের চিত্তে।

এটা তো জানা কথাই যে, একটি বস্তুকে একই কালে সব দিক থেকে, সব ভাব থেকে, দেখা সম্ভব নয় এবং সেই বস্তুর সব দিক বা সব ভাব সকলের মনকে সমানভাবে আকর্ষণ করবে না। পাঁচজন শিল্পী যদি একই গাছের ছবি করেন, পাঁচ রকমের পাঁচখানা ছবি হবে। কেউ দেখবেন ও দেখাবেন তার পাতার সবুজ, কেউ তার পল্লবের দোল, কেউ তার ফুলের বাহার, কেউ তার উপর আলোছায়ার চমক, কেউ বা এ-সবের কিছুই বিশেষ লক্ষ্য না করে দেখবেন ও দেখাবেন—গাছটি যেন সন্ন্যাসী, শূন্য আকাশের নীচে ধ্যানমগ্ন।

শিল্প বুঝতে হলে শিল্পবস্তু দেখতে হবে। কী ভাবে দেখা দরকার?

শিশুর চোখ নিয়ে শিল্পবস্তু দেখতে হয়। অর্থাৎ, আগে থেকেই মনকে কোনো সংস্কারে বা কোনো অভিমতে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। কেবল বিচার করে, বিশ্লেষণ করে শিল্প বোঝা যাবে না।

---

[১] চলন্তিকা অভিধান দ্রষ্টব্য। মনে রাখা দরকার দৃশ্যমান জগৎ—দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ-বিশিষ্ট, কিন্তু চিত্রের আশ্রয়স্থল কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ-বিশিষ্ট বা সমতল।

শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির দান কী?

চীনারা নিসর্গচিত্র বা ল্যাণ্ডস্কেপ অবলম্বন করে আত্মিক উপলব্ধি ও আত্মিক আবেগের প্রকাশে অতুলনীয় সিদ্ধি অর্জন করেছেন।

য়ুরোপে স্বভাবানুগত প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট-রচনার চরম উৎকর্ষ দেখা যায়।

ভারতীয় শিল্পপদ্ধতি মানব বা মানবেতর প্রাণীদের রূপকে প্রতীক করে গভীর অধ্যাত্ম-অনুভবকে ভাষা দিয়েছে। ভারত ও চীনের শিল্পসংস্কৃতিতে প্রভেদ হল এই যে, চীনা শিল্পী নিজেকে স্বভাবের অঙ্গীভূত করে স্বভাবের মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন, আর ভারতীয় শিল্পী নিজেকে ও স্বভাবকে একই ছন্দে ছন্দিত জেনে স্বভাবকে নিজেরই সত্তার আর-এক প্রকাশ বা পরিচয় বলে জানছেন।

বুদ্ধমূর্তির তাৎপর্য কী?

বুদ্ধমূর্তি ঘনীভূত ধ্যানেরই মূর্তি, ব্যক্তিবিশেষের মূর্তি নয়। বিশেষ এক প্রকার ভাব বা উপলব্ধি বিশেষ এক প্রকার বিগ্রহ বা টাইপ সৃষ্টি করতে চায়, সেটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হওয়ার পর সে পথে আর অগ্রসর হওয়া যায় না। বুদ্ধমূর্তি এই রকম নিখুঁত একটি সৃষ্টি।

নটরাজ এরূপ আর-একটি সৃষ্টি। সমস্ত বিশ্বসংসার নিয়ে যে ছন্দ বা যে গতি এক শান্তির কেন্দ্র থেকে প্রসৃত হয়ে সেইখানেই ফিরে ফিরে আসছে, তারই বিগ্রহ।

বুদ্ধমূর্তিতে সমস্ত গতিটি নিয়ত শান্তিতেই বিধৃত হয়ে নিশ্চল চেতনারূপে আছে —নিবাত নিষ্কম্প নির্ধূম দীপশিখা তার উপমা।

একটা হুঁশিয়ারির কথা বলা দরকার। শিল্পের আত্মিক বা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য যা, তার সঙ্গে লৌকিক আচারধর্মের বা নীতিধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। শান্তি সমতা ও চেতনার প্রসার অনুভূত এবং প্রকাশিত হলেই হল।

শব্দের অনুভূতি

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

টং টং টং করে ঘড়িতে নটা শব্দ হল। শুনে ছেলের মনে পড়ে গেল স্কুলের বেলা হয়েছে। মস্তিষ্ক হুকুম চালাতে থাকল। হাতকে খবর দিল, —বই-খাতা বন্ধ করে গুছিয়ে রাখ। পা-কে জানাল, বইখাতা গোছান হলে স্নান করতে যেতে হবে। হাত বই-খাতা গোছাল, পা তাকে নিয়ে চলল যেখানে তেল গামছা আছে, চোখ জায়গাটা চিনিয়ে দিল, তেল গামছা দেখিয়ে দিল। ছেলে তেল মাখল, নাক তাকে জানাল তেলের গন্ধটা কেমন। সে স্নান করল, গায়ের চামড়া বলে দিল জলটা ঠাণ্ডা কি গরম। স্নান শেষ করে খেতে বসল, এখন জিব তরকারিগুলো কেমন হয়েছে তার আস্বাদ দিল।

মানুষের হৃৎপিণ্ড একবার কোঁচকাচ্ছে, পরমুহূর্তে ফুলছে, এর আর বিরাম নেই। ফলে মানুষের সমস্ত দেহে রক্তস্রোত বইছে। মানুষের ফুস্‌ফুস্‌ হাপরের মতো একবার ফুলছে, তারপর কুঁচকে যাচ্ছে, এতে শরীরের রক্ত চলাচল করছে, মানুষের পাকস্থলীতে খাদ্য জীর্ণ হচ্ছে, আর খাদ্যের সারাংশ রক্তে চলে যাচ্ছে। কিন্তু শুধু মানুষের শরীরে তো নয়, জন্তুজানোয়ারের দেহেও এই একই ব্যাপার চলেছে। তবে মানুষের বিশেষত্ব কোথায়?

মানুষের বুদ্ধিশক্তি আছে, স্মৃতিশক্তি আছে, কাজের ফলাফল বিচার করবার ক্ষমতা আছে। একখানা ছবি দেখলে সে পুলকিত হয়, একটা গান শুনলে সে আনন্দ বোধ করে। শীতকালে সে গায়ে গরম কাপড় জড়ায়, গ্রীষ্মকালে পাখার বাতাস খায়। বাইরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলবার তার অসাধারণ ক্ষমতা। এইসব ক্ষমতা জন্তুজানোয়ারের কিছু কিছু থাকলেও অতটা পরিস্ফুট হয়নি, মানুষে যতটা হয়েছে।

মানুষের মাথার খুলির মধ্যে আছে তার মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের তলা থেকে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে মোটা দড়ির মতো একটা জিনিস চলে গিয়েছে। এই জিনিসটাকে বলা হয় সুষুম্না-কাণ্ড, ইংরেজিতে বলে স্পাইনাল-কর্ড। এই সুষুম্না-কাণ্ড থেকে অনেক নার্ভ শরীরের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। আবার শরীরের অনেক জায়গা থেকে অনেক নার্ভ এই সুষুম্না-কাণ্ডে এসে মিশেছে। মানুষের মস্তিষ্ক সুষুম্না-কাণ্ডের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন নার্ভ দিয়ে তার শরীর ও মনকে পরিচালনা করছে। এই নার্ভের মধ্যে কতকগুলি চোখ, কান, নাক,

জিব, ত্বক থেকে এসে মস্তিষ্কে যথাযথ অনুভূতি দিচ্ছে, আর কতকগুলি আছে যাদের দিয়ে মস্তিষ্ক ভিন্ন ভিন্ন পেশীতে সংবাদ পাঠাচ্ছে। এক দল অন্তর্মুখী, অপর দল বহির্মুখী।

যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন সৈন্যদল থাকে। এক এক দল এক এক রকমের কাজ করে, কিন্তু মাথার উপর একজন সেনানায়ক থাকেন, যিনি সকলকে চালান। দেহের সেই সেনানায়ক হল মস্তিষ্ক। কিন্তু মস্তিষ্কের ঠিক নিচের অফিসর হল সুষুম্না-কাণ্ড। পায়ে একটা মশা বসেছে। অন্তর্মুখী নার্ভ সুষুম্না-কাণ্ডকে এই খবরটা দিল। সুষুম্না-কাণ্ড মস্তিষ্কে খবরটা পাঠাল, সেখান থেকে হুকুম এল কি করতে হবে। সুষুম্না-কাণ্ড বহির্মুখী নার্ভ দিয়ে হাতের পেশীকে হুকুম করল চড় দিয়ে মশা মারতে হবে, আর পা-এর পেশীকে জানাল পা সরিয়ে নাও। কিন্তু কোন কোন সময় দেখা যায়, মস্তিষ্ক বিচার করে হুকুম দেবার আগেই সুষুম্না-কাণ্ড একটা ব্যবস্থা করে বসেছে। অস্পষ্ট আলোয় রাস্তায় দড়ির মতো একটা জিনিস দেখলুম, চমকে উঠলুম, আর দৌড় দিলুম। সুষুম্না-কাণ্ড নিজেই এই ব্যবস্থা করল। এটাকে বলা হয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া—রিফ্লেক্স অ্যাক্‌সন। কিন্তু ওই রকম ব্যবস্থা করে সুষুম্না-কাণ্ড সঙ্গে সঙ্গে খবরটি মস্তিষ্কে পাঠিয়েছে। মস্তিষ্কের বিচার বিভাগ বলল,—আরে দূর, ওটা সাপ নয়, দড়ি। অপ্রস্তুত হলুম, আর চারিদিকে তাকালুম, বোকামোটা নিকটে কারুর কাছে ধরা পড়েছে কি না।

মানুষের শরীরে কিন্তু আর এক শ্রেণীর নার্ভ আছে যারা স্বাধীনভাবে কাজ করে, মস্তিষ্কের ধার ধারে না। মানুষের হৃৎপিণ্ড এই জাতীয় নার্ভ দিয়ে শরীরে রক্ত চালায়, মস্তিষ্কের হুকুমের অপেক্ষা রাখে না। আমরা ইচ্ছা করি, না করি, হৃৎপিণ্ডের কাজ চলতে থাকে।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,—এই ভিন্ন ভিন্ন রকমের অনুভূতি কোথাকার কোন্ নার্ভ দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছচ্ছে দেখা যাক।

আমাদের মুখমণ্ডলে দুটি কোটর আছে, তার মধ্যে আছে দুটি চোখ। চোখের প্রধান অংশ হল অক্ষিপট—রেটিনা। ক্যামেরায় যেমন লেন্সের সাহায্যে পিছনে একটা ফটোগ্রাফি কাচের উপর বা একখানা ফিল্মের উপর বাইরের বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে, এখানেও সেইরকম চোখের লেন্স ওই রেটিনার উপর দৃশ্য জিনিসের প্রতিবিম্ব ফেলছে। এখন এই রেটিনা থেকে একটি নার্ভ মস্তিষ্কে চলে গিয়েছে। রেটিনায় যেই কোন বাইরের বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ল অমনি ওই নার্ভ মস্তিষ্ককে জানান দিল, আমরা জিনিসটা দেখলুম।

জিবের উপর কতকগুলি ছোট-ছোট গুটি আছে, তারাই নার্ভের সাহায্যে স্বাদের অনুভূতি দেয়।

নাকের গর্তের পিছনে কতকগুলি বিশেষ কোষ থাকে, আর সেখান থেকে কতকগুলি

নার্ভ চলে গিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁচেছে। বাইরে বাতাস হাসনাহানার উপর দিয়ে বয়ে এল, এসে নাকের ভিতর ঢুকল, তখন ওই নার্ভগুলি উত্তেজিত হয়ে মস্তিষ্কে খবর দিল, আমরা গন্ধ অনুভব করলুম। নাক যখন সর্দিতে ভরা থাকে, তখন ওই কোষগুলি ঢাকা থাকায় আমরা তখন গন্ধ পাই না।

স্পর্শ করে আমরা জিনিসের অস্তিত্ব বুঝি, ঠাণ্ডা-গরম অনুভব করি। ত্বক হল এর ইন্দ্রিয়। ত্বকের সঙ্গে অসংখ্য নার্ভ যুক্ত আছে, তারা স্পর্শের অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছে দিচ্ছে।

এইবার শোনা। শুনি আমরা কান দিয়ে, আর কানের ভিতর থেকে কতকগুলি নার্ভ চলে গিয়ে মস্তিষ্কে শব্দের অনুভূতি দিচ্ছে।

একটা কথা চলিত আছে,—পৃথিবীতে জীব আছে, তাই আলো আছে, শব্দ আছে; জীব না থাকলে আলো শব্দ কিছুই থাকত না। কথাটা খুবই ঠিক। তুমি বলবে,—ঈথর-তরঙ্গ তো আলো, আর বায়ুর ঢেউ তো শব্দ; আমি থাকি আর না থাকি তারা তো থাকছে, সুতরাং আলোও থাকছে, শব্দও থাকছে। কিন্তু তা তো নয়। ঈথর-তরঙ্গ আমার চোখের উপর পড়ে রেটিনায় পৌঁছল, তার সঙ্গে যুক্ত নার্ভকে উত্তেজিত করল, সেই উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছল, তখনই তো অনুভূতি হল আলোর। মনে কর, জীব নেই, জীবের চোখ নেই, চোখের রেটিনা নেই, রেটিনার সঙ্গে যুক্ত নার্ভ নেই, মস্তিষ্ক নেই, তবে কোথায় আলো, কোথায় আলো! জীব না থাকলে শব্দই বা কি? এতো তারই একটা অনুভূতি মাত্র!

সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্র

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

রূসো বঙ্কিমের সাম্যবাদের অন্যতম গুরু ছিলেন। কিন্তু অন্ধ গুরুভক্তি তাঁহার কখনই ছিল না। তিনি তাঁহার মত সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "অবিমিশ্র বিমল সত্যই যে তাঁহা কর্ত্তৃক ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইয়াছিল, এমত নহে। তিনি মহিমময় লোক হিতকর নৈতিক সত্যের সহিত অনিষ্টকারক মিথ্যা মিশাইয়া সেই মিশ্র পদার্থকে আপনার অদ্ভুত বাগিন্দ্রজালের গুণে লোকবিমোহিনী শক্তি দিয়া ফরাসীদিগের হৃদয়াধিকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।"

সাম্যতত্ত্ব তিনি কি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার কথাতেই বলি—"মনুষ্যে মনুষ্যে সমান। কিন্তু এ কথার এমত উদ্দেশ্য নহে যে, সকল অবস্থার সকল মনুষ্যই সকল অবস্থায় সকল মনুষ্যের সঙ্গে সমান। নৈসর্গিক তারতম্য আছে। কেহ দুর্বল, কেহ বলিষ্ঠ, কেহ বুদ্ধিমান, কেহ বুদ্ধিহীন। নৈসর্গিক তারতম্যে সামাজিক তারতম্য অবশ্য ঘটিয়াছে। যে বুদ্ধিমান্ এবং বলিষ্ঠ সে আজ্ঞাদাতা; যে বুদ্ধিহীন এবং দুর্বল সে আজ্ঞাবাহী অবশ্য হইবে। রূসোও একথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সাম্যতত্ত্বের তাৎপর্য, এই যে, সামাজিক বৈষম্য নৈসর্গিক বৈষম্যের ফল, তাহার অতিরিক্ত বৈষম্য ন্যায়বিরুদ্ধ এবং মনুষ্য জাতির অনিষ্টকর। যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহার অনেকগুলি এইরূপ অপ্রাকৃত বৈষম্যের কারণ। সেই ব্যবস্থাগুলির সংশোধন না হইলে মনুষ্য জাতির প্রকৃত উন্নতি নাই; মিল্ এক স্থানে বলিয়াছেন, এখনকার যত সুব্যবস্থা, তাহা পূর্বতন কুব্যবস্থার সংশোধন মাত্র। ইহা সত্য কথা; কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ। তাই বলিয়া কেহ মনে না করেন যে, আমি জন্মগুণে বড়লোক হইয়াছি, অন্যে জন্মগুণে ছোট লোক হইয়াছে। তুমি যে উচ্চ কুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণ নহে; যে নীচ কুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষ নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না; মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই। তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া দুর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত, মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ এবং তাঁহার ভ্রাতা। জন্ম দোষগুণে অধীন নহে। তাহার অন্য কোন দোষ নাই। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী।"

Proletariat এবং Intelligentzia-র ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু সাম্যবাদের ধুয়া ধরিয়া নির্ঘাত একাকার পছন্দ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "যখন জনসমাজে ধন সঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ শ্রম করে, এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম করিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহারা করে না। প্রথম ভাগের উৎপাদিত অতিরিক্ত খাদ্যে তাহাদের ভরণ পোষণ হয়। যাহারা শ্রম করে না, তাহারাই কেবল সাবকাশ, সুতরাং চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদি তাহাদেরই একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায় অর্থাৎ যাহার বুদ্ধিমাৰ্জ্জিত হয়, সে অন্যাপেক্ষা যোগ্য ও ক্ষমতাশালী হয়, সুতরাং সমাজ মধ্যে ইহাদেরই প্রধানত্ব হয়। যাহারা শ্রমোপজীবী, তাহারা ইহাদিগের বশবৰ্ত্তী হইয়া শ্রম করে, অতএব প্রথমে বৈষম্য উপস্থিত হইল। কিন্তু এ বৈষম্য প্রাকৃতিক, ইহার উচ্ছেদ সম্ভব নহে এবং উচ্ছেদ মঙ্গলকর নহে। বুদ্ধ্যপজীবীর জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়। পুরস্কার স্বরূপ উহারা শ্রমোপজীবীর অৰ্জ্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে।"

বঙ্কিম বলেন, লোক সংখ্যার বৃদ্ধি এবং তৎসহ বিবাহ-প্রবৃত্তি দমনে ও উপনিবেশ স্থাপনে অপ্রবৃত্তির কারণে আমাদের দেশের শ্রমোজীবীর অবনতি আরম্ভ হয়। এই অবনতির ফলে ক্রমশঃ শ্রমোপজীবীর ও বুদ্ধ্যপজীবীর মধ্যে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়, তাহা অমঙ্গলজনক। তাঁহার ভাষা উদ্ধৃত করি,—"একবার অবনতি আরম্ভ হইলেই সেই অবনতিরই ফলেই আরও অবনতি ঘটে। শ্রমোপজীবীদিগের যে পরিমাণে দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সহিত সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের তারতম্য অধিকতর হইতে লাগিল। প্রথমে ধনের তারতম্য, তৎপরে ধনের অধিকারের তারতম্য। শ্রমোপজীবীরা হীন হইল বলিয়া তাহাদের উপর বুদ্ধ্যপজীবীদিগের প্রভুত্ব বাড়িতে লাগিল। অধিক প্রভুত্বের ফলে অধিক অত্যাচার এই প্রভুত্বই শূদ্রপীড়ক স্মৃতিশাস্ত্রের মূল। এই বৈষম্যই অস্বাভাবিক, ইহাই অমঙ্গলের কারণ।

"আমরা যে সকল বলিলাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাৎপর্য্য দেখা যায় —

(১) শ্রমোপজীবীদিগের অবনতির যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল ত্রিবিধ। প্রথম ফল—শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দরিদ্রতা, ইহা বৈষম্যবৰ্দ্ধক। দ্বিতীয় ফল,—বেতনে অল্পতা হইলেই পরিশ্রমের আধিক্যের আবশ্যক হয়, কেননা যাহা কমিল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব। অতএব, দ্বিতীয় ফল মূর্খতা, ইহাও বৈষম্যবৰ্দ্ধক। তৃতীয় ফল—বুদ্ধ্যপজীবীদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব। ইহা বৈষম্যের পরাকাষ্ঠা। দারিদ্র, মূর্খতা, দাসত্ব।

(২) ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়।

(৩) শ্রমোপজীবীদিগের দুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয় কেবল তাহাই নহে। তন্নিবন্ধন সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের ধ্বংস হয়। যেমন এক ভাণ্ড দুগ্ধে দুই এক বিন্দু অম্ল পড়িলে সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমনই সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দ্দশায় সকল শ্রেণীরই দুর্দ্দশা জন্মে।"

আজ হরিজন আন্দোলনের দিনে বঙ্কিমের এই সামাজিক দুর্গতির নিদান বিশেষ মনোযোগের সহিত আমাদের অনুধাবন করা কর্ত্তব্য।

জমীদার ও রায়তের বৈষম্য বঙ্কিমের প্রাণে বড় লাগিয়াছিল। তাই তিনি দুঃখে বলিয়াছিলেন, "জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহৎ জন্তু ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুদিগকে ভক্ষণ করে। জমীদার নামে বড় মানুষ কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দ্দশা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্ন-প্রসবিনী বসুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না। কৃষকের পেটে যাইলে জমীদারও টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।"

রায়তের দুর্দ্দশা দেখাইবার জন্য তিনি যে পরাণ মণ্ডলের করুণ চিত্রটি আঁকিয়াছেন, তাহা একবার সকলকে দেখিতে অনুরোধ করি। দীর্ঘতার ভয়ে আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতে অক্ষম। আজ কৃষক আন্দোলনের দিনে ইহা বারংবার পাঠ করার প্রয়োজন আছে।

তিনি বুঝিয়াছিলেন এই, কৃষকের উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি হইবে না। তাই তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এতকাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরেজের শাসন-কৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।"

"এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম সেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটী অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদের ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে; তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে,

ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়, সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাথরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত লুন লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেড়া মাদুরে, না হয় গোহালের ভূমে এক পার্শ্বে শয়ন করিবে —উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে—যাইবার সময় হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয় চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস। বল দেখি চশমা-নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি, ইংরেজ বাহাদুর—তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডূয়িত করিতেছ — তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম সেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে? আমি বলি অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।"

আপনারা দেখিলেন, পরাণ মণ্ডল বা রামা কৈবর্ত্তের জন্য বঙ্কিমের যতটুকু দরদ, হাসিম সেখের জন্যও ততটুকু। এখানে কোন হিন্দু মুসলমানের ভেদ নাই। এই হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে বঙ্কিম বাবু একস্থানে বলিয়াছেন—"আমি : মুসলমানের বাড়ী খাইতে আছে? বাবাজী: এ কান দিয়া শুনিয়া, ও কান দিয়া ভুলিস? যখন সর্ব্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তখন হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি, ও বড় জাতি, এরূপ ভেদ-জ্ঞান করিতে নাই। যে এরূপ ভেদ-জ্ঞান করে, সে বৈষ্ণব নহে।" তিনি অন্য স্থানে বলিয়াছেন—" 'গড' বলি, 'আল্লা' বলি, 'ব্রহ্ম' বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপ জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্ব্বভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দু। তদ্ভিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছা করা পৈতা, কপালে কপালজোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি এবং গায়ে নামাবলি, মুখে হরিনাম থাকিলেও তাহাকে হিন্দু বলিব না।"

যে দিন হিন্দু বঙ্কিমের এই বৈষ্ণবের মত গ্রহণ করিবে, সে দিন হিন্দু-মুসলমান সমস্যা থাকিবে না। সে শুভ দিন কবে আসিবে?

ধনী ও দরিদ্রের চিরন্তন সমস্যাটা বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের বিড়াল প্রবন্ধে কেমন সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা কমলাকান্তর স্থানে ধনী ও বিড়াল স্থানে দরিদ্র দিয়া তাহার কথা উদ্ধৃত করিব।

দরিদ্র : "দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষা অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে, চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে। কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূলে যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজন পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহাদের নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

ধনী : "থাম! থাম! তোমার কথাগুলি ভারী সোশিয়ালিষ্টিক। সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল। যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবেন না। তাহাতে সমাজে ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

দরিদ্র : "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের ক্ষতি কি?"

ধনী : "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।"

দরিদ্র : "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?"

বঙ্কিমচন্দ্র যে সাম্যবাদের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা এখন অঙ্কুরিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে সাম্যতরু নানা ফুল-ফলে সুশোভিত হইয়া বঙ্গ ভূমিকে না, সমগ্র ভারতবর্ষকে ফুল, ফল ও ছায়াদানে আমোদিত, পরিতৃপ্ত ও সুশীতল করিবে।

মানবসভ্যতা ও বিজ্ঞান

প্রিয়দারঞ্জন রায়

মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছে জ্ঞানের আলোকে, তার ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে, যাকে বলা যেতে পারে তার প্রকৃতিদত্ত বা জন্মগত অধিকার। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়ানুভূতির জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। কারণ এই জ্ঞান তার নিজের কোন চেষ্টার অপেক্ষা রাখে না। এটা তার আপন উপার্জিত জ্ঞান নয়। কিন্তু মানুষ তার আপন মন ও বুদ্ধির প্রভাবে যখন এই জ্ঞানের পরিধিকে বাড়িয়ে তুলবার চেষ্টা করে তখন তাকে বলা হয় বিজ্ঞান। প্রকৃতপক্ষে মানুষ জ্ঞানের কোন সীমানা এ পর্যন্ত নির্দেশ করতে পারে নি। এ কারণে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা হচ্ছে এক সতত অপসৃয়মান লক্ষ্যের অভিমুখে বিরামহীন অনুসরণ। এ লক্ষ্য হচ্ছে পরম জ্ঞান বা পরম সত্য, যা জানলে আর কিছুই জানবার থাকে না। জ্ঞান একটি শক্তিবিশেষ। এই জ্ঞানের বা বিজ্ঞানের সাধনাতেই মানুষ হয় শক্তিমান। আপন বুদ্ধির কৌশলে মানুষ এই শক্তিকে বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে তুলতে পারে। বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যে, বিশেষত প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কার ঘটেছে, তার ফলে মানুষের হাতে এসেছে অসাধারণ শক্তি যার প্রয়োগে সে সক্ষম হয়েছে মানবসমাজের বহু কল্যাণ সাধনে এবং বহু দুরূহ সমস্যার সমাধানে। অসাধারণ বেগবান যানবাহনের সৃষ্টি করে মানুষ আজ দেশ ও কালের ব্যবধানকে করেছে খর্ব, বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে পরস্পরের যাতায়াত ও তাদের পণ্যদ্রব্যাদির বিনিময় করেছে সুগম।

দুটি প্রবল সহজাত প্রবৃত্তি বা সংস্কার নিয়ে মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে। এই দুটি প্রবৃত্তি হল ঃ (১) বাঁচবার প্রবৃত্তি বা তাড়না, এবং (২) দৃশ্যমান বহির্জগৎকে জানবার আকাঙ্ক্ষা। অবশ্য এই দুটি পরস্পরের পরিপূরক। বিজ্ঞান এই বহির্জগতের বিচিত্র জ্ঞেয় বস্তুর উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে। দর্শন জানতে চায় জ্ঞাতাকে। সংক্ষেপে বলা যায় দর্শন অনুসন্ধান করে বহুর মধ্যে এক-কে, আর বিজ্ঞানও জানতে চায় সেই বহুর উৎস এক-কে অথবা খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে। কিন্তু বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োগে (প্রযুক্তিবিদ্যা) মানুষ ব্যবহারিক জীবনে বহু সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে তার জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সক্ষম হয়েছে, একথা কারো অবিদিত নয়। মানুষের জ্ঞানের প্রসার বেড়ে গেছে বিস্ময়করভাবে।

এর দৃষ্টান্ত আমরা পাই আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোয়াসার (Quasar), পালসার

(Pulsar), নিউট্রন নক্ষত্র, ব্ল্যাকহোল (black hole) ইত্যাদি নক্ষত্রের বা তাদের দেহপিণ্ডের ভগ্নাবশেষের আবিষ্কারে। বিজ্ঞানীদের গণনায় এইসব নক্ষত্রের এক ঘন ইঞ্চি পরিমাণ দেহপিণ্ডের ওজন দশ হাজার লক্ষ টন। ব্রহ্মাণ্ডের সীমান্তনিবাসী (পৃথিবী থেকে ১২ শত লক্ষ আলোকবর্ষের দূরবর্তী) কোয়াসার নক্ষত্রের দেহপিণ্ডের দীপ্তি বিজ্ঞানীদের হিসেবে এক লক্ষাধিক কোটি সূর্যের দীপ্তির সমান। এসব তথ্য মানুষের ধারণার অতীত।

পদার্থবিজ্ঞানীরা প্রখর সংবেদনশীল যন্ত্রযোগে এখন গামা রশ্মি, একস্‌রশ্মি, রেডিওতরঙ্গ রশ্মির অস্তিত্বের সন্ধান করতে, এমন কি দৃশ্যমান বর্ণালীর মধ্যপ্রদেশ থেকে বিদ্যুৎচৌম্বক শক্তির বিকিরণ প্রক্রিয়াও পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

রসায়ন বিজ্ঞানেও বিজ্ঞানীদের আধুনিক সফল গবেষণার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— ত্রিমাত্রিক আণবিক গঠনের উপলব্ধি, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গতিবেগের নির্ধারণ, আণবিক কোয়ানটাম তত্ত্ব ইত্যাদি।

ভূবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে আমাদের পৃথিবী গ্রহের গঠন সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বিবিধ শিলা ও ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরের গঠন সম্বন্ধে জ্ঞান (plate tectonics)।

জীববিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটেছে অভূতপূর্বভাবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— জননকোষের অভ্যন্তরে যুগ্ম উপাদান জিনের (gene) রাসায়নিক ভিত্তির উপলব্ধি, জিন থেকে প্রোটিন (আমিষ জাতীয়) পদার্থের সৃষ্টি, যে অবস্থাবিশেষে জিনের ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে, প্রোটিন অণুর ত্রৈমাত্রিক গঠন যা জীবকোষের অভ্যন্তরের সকল প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, প্রত্যেক জীবকোষ যে যুগপৎ হাজার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আধার ও নিয়ামক, এই সকল প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটির গতিবেগ যে সমতালে বাঁধা ও প্রত্যেক বিশিষ্ট জীবের জীবনের প্রয়োজনের অনুবর্তী ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান।

জীবকোষের সুসঙ্গত ও সুষম সমাবেশ এখন আমাদের কাছে সহজবোধ্য। এ থেকে বলা যায় যে, গেনোমে (genome) পরিচিহ্নত প্রোটিন সংশ্লেষণের যাবতীয় বিবরণ থেকে আমরা জীবকোষের গঠন ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সকল প্রকার জ্ঞানলাভ করতে পারি। গেনোমে বলতে বোঝায় জীবকোষের কেন্দ্রে অবস্থিত ক্রোমোসোম (chromosome) নামক দীর্ঘসূত্রাকার অতিকায় রাসায়নিক অণুর সংযোগবিশেষ। বহু গেনোমে মিলে গড়ে ওঠে অর্গানেলস্ (organells—জীবকোষের কেন্দ্রের বহিঃস্থ অংশবিশেষ)। এইসব অর্গানেলস্ জুড়ে সৃষ্টি হয় জীবকোষের একজাতীয় বহুকোষ, এইগুলি মিলে জীবের এক একটি অঙ্গের সৃষ্টি করে এবং অঙ্গসমূহ পরস্পর জুড়ে সৃষ্টি করে একটি পূর্ণাবয়ব জীব, এক জাতীয় বহুজীব আপনা থেকে জড় হয়ে গড়ে একটি সংঘ (colony), সংঘ পরিবার (pack), এমন কি দল (flock) ইত্যাদি।

জীবকোষের অভ্যন্তরে জীবনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছে, সেই সঙ্গে শরীরতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের গবেষণাও দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—যকৃৎ শরীরের মধ্যে একটি কারখানার কাজ করে, যকৃতের মধ্যে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন, স্নায়বিক আবেগের পরিবহণ পরিচালনার ব্যাপার, রক্তের সংযুতি (composition) সংরক্ষণে কিডনির কৃতিত্ব, মাংসপেশীর সংকোচন, উদ্ভিদদেহে আলোকের মাধ্যমে রাসায়নিক সংশ্লেষণ (photosynthesis) ইত্যাদি।

চিকিৎসাবিজ্ঞান নতুন নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে : দেহের পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান, রন্ধ্রবিহীন গ্রন্থির (Indocrine) বিকার, রোগবীজাণুর (bacteria) সংক্রমণ এবং রোগোৎপাদক কয়েকজাতীয় বিষের (virus) সংক্রমণ, যাদের প্রতিষেধক পদ্ধতি হচ্ছে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থায় (vaccination)। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হয়েছে সুপ্রজনন (Genetics) রোগের ক্ষেত্রে, যার প্রায় দু হাজার রকম রোগের মধ্যে মাত্র দশ শতাংশ সম্বন্ধে আমরা অবহিত আছি। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, বহু দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও ফলপ্রসূ কিছু আবিষ্কার করতে পারেন নি। মানবজীবনের ভাগ্যলিপির রাসায়নিক ভিত্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে কতদূর অগ্রসর হয়েছে —এটি তারই বিবরণ। কিন্তু আমরা এখনও মস্তিষ্কের কোষরাজির অপূর্ব সমাবেশ ও তাদের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানের উপলব্ধিতে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারি নি।

বর্তমান যুগে Computer যন্ত্রের উদ্ভাবন ও ব্যবহার গণিতশাস্ত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। কোন জটিল অঙ্কের ফলাফল কষে বের করতে আগে যেখানে কোন সুদক্ষ বিজ্ঞানীর সাত-আট দিন সময় লাগত, বর্তমানে কমপিউটার যন্ত্রের সাহায্যে তা কয়েক মিনিটের মধ্যে জানা যায়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের সাম্প্রতিক অগ্রগতির অতি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণী উপরে দেওয়া হলো।

যদিও আমরা জানি, Science for its own sake, অর্থাৎ কেবল জ্ঞান অর্জনের জন্যই বিজ্ঞানের চর্চা, তবুও এই অর্জিত জ্ঞানকে মানবকল্যাণে ও সমাজ উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ করে আধুনিক জীবনযাপনের মান উন্নীত করা হয়েছে। এই বিশ্বাস আজ প্রতি মানুষের মনে দৃঢ়বদ্ধ যে, কালক্রমে একদিন বিজ্ঞান মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সাধন করবে : জন সাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি, উন্নত উপায়ে কৃষিকর্মে খাদ্যোৎপাদন, বাসগৃহ নির্মাণের উন্নয়ন, উন্নত পরিবহণ, শিক্ষাবিধির উন্নতি সাধন, মানুষের শ্রমের লঘুকরণ ইত্যাদি। আধুনিক প্রয়োগবিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যা শুধু যে ব্যবহারিক জগতে আমাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করেছে তা নয়, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পরম উৎকর্ষ সাধন করেছে।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিজ্ঞানচর্চার ফলে মানুষের হাতে এসেছে আজ অভাবনীয় ক্ষমতা (দেবতার ক্ষমতা) ও কুবেরের ধনভাণ্ডার। কিন্তু অপরিসীম পরিতাপের বিষয় এই যে, মানুষ অনেক ক্ষেত্রে আজ সে ক্ষমতা ও সম্পদকে ব্যবহার করছে দানবের মনোবৃত্তি দিয়ে। তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি, দুটি বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা এবং অন্যান্য দূরগামী মারণাস্ত্রের ব্যবহারে। আজ বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সৃষ্টি হয়েছে তথাকথিত ঠাণ্ডা লড়াই বা Cold war যার বিষময় পরিণতিতে যদি আরো কোন বিশ্বযুদ্ধ বাধে, তবে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী পরমাণু বোমার প্রয়োগে মুহূর্ত মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কিছুকাল আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভায় এক বিবরণী পেশ করা হয়েছিল। তা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭৪ সালের শেষ অবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চার লক্ষ পারমাণবিক বোমা তৈরি করে মজুদ করেছেন এবং একই সময়ে সোভিয়েট রাষ্ট্র নির্মাণ ও মজুদ করেছেন এক লক্ষ অনুরূপ বোমা। বর্তমানে প্রত্যহ মার্কিন রাষ্ট্র নির্মাণ করছে চারটি করে বোমা ও সোভিয়েট রাষ্ট্র করছে একটি। বলা প্রয়োজন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের একটি পারমাণবিক বোমা তার ধ্বংসের শক্তিতে মার্কিন রাষ্ট্রের চারটি বোমার সমান। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দুটি রাষ্ট্রই মনে করে যে এরূপেই তাদের শক্তির ভারসাম্য সংরক্ষিত হবে ও পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি বজায় থাকবে। কিন্তু রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পরস্পরের মধ্যে ব্যবহারে সহৃদয়তার এতই অভাব এবং কূটনীতির বাকপটুতার এতই প্রভাব যে তাদের মধ্যে এই জাতীয় চুক্তি ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই আজও মধ্য-এশিয়া (ভিয়েতনাম) ও পশ্চিম এশিয়া (জেরুজালেম, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ইত্যাদি) রাষ্ট্রগুলিতে যুদ্ধের আগুন নেভবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। সম্প্রতি চীনও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রই আজ আপন আপন নিরাপত্তার অজুহাতে পারমাণবিক বোমা ও অন্যান্য মারণাস্ত্রের নির্মাণে প্রয়াসী হয়ে উঠেছেন।

সুতরাং বলা যায় পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে এক বিপুল সংকট-সংকুল অবস্থার অভিমুখে। আমাদের প্রাচীন সভ্যতা যাচ্ছে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে এবং তার শাশ্বত মূল্যবোধ ওলটপালট ও ধূলিসাৎ হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, সামরিক আয়োজন মেটাতেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের তাগিদে মানুষ আজ পৃথিবীর খনিজ সম্পদকে নির্বিচারে শোষণ করছে। পৃথিবীর এই বর্তমান পরিস্থিতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অসংযত ক্ষমতা ও আধিপত্যের লোভ সৃষ্টি করে মানুষে মানুষে বা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব-বিরোধের এবং ব্যাপকভাবে তাদের বহু দুঃখ দুর্দশার সৃষ্টি করছে। সুতরাং বলা যায় যে, মানুষের কল্যাণের জন্য পার্থিব সমৃদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও নীতিবোধের প্রভাবে। কারণ মানুষ এবং তার সভ্যতাকে

এই আসন্ন সংকট-সংকুল পরিস্থিতি থেকে কোন যান্ত্রিক উপায়ে বা বুদ্ধিকৌশলের প্রভাবে রক্ষা করার সম্ভাবনা নেই। এই প্রসঙ্গে বর্তমান শতাব্দীর বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী Albert Einstein-এর উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মনে করি। তিনি বলেছেন ঃ 'Science is lame without Religion, and Religion is blind without Science'। এর বাংলা হচ্ছে, ধর্মবিহীন বিজ্ঞান হচ্ছে খোঁড়া এবং বিজ্ঞানহীন ধর্ম হচ্ছে অন্ধ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্ময়কর অগ্রগতি এবং মানব-সভ্যতা ও সমাজের উপর তাদের ফলাফল সম্বন্ধে যে বিবৃতি উপরে দেওয়া হলো তা থেকে পরিস্ফুট হয় যে, বিজ্ঞানের জ্ঞানের অনুশীলনের ফলে মানুষ তার মন ও বুদ্ধির অপরিসীম উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ, এবং পৃথিবীতে দুর্বলতম জীব হয়েও অভূতপূর্ব কৃতিত্ব ও প্রতিপত্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তবুও একথা মানতে হবে যে, বিজ্ঞানীর পক্ষে বিজ্ঞানের অনুশীলনই তাঁর একমাত্র আনন্দ ও পুরস্কার হলেও আপন জীবনের মূল্যবোধের পক্ষে তা বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে নি। কারণ, আজকের পৃথিবী ও মানবসভ্যতা একটি চরম নির্বাচন ও সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে; আরাম ও প্রাচুর্যভরা ভবিষ্যৎজীবন, যাতে মানুষ স্বাধীনভাবে শান্ত ও সুন্দর পরিবেশে তার অভিব্যক্তির তুঙ্গতম সোপানে আরোহণের চেষ্টা করবে; অথবা, মনুষ্যত্বের ঘোরতর অবনমনে এক পারমাণবিক প্রলয়ঙ্কর বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের অভিমুখে অগ্রসর হয়ে মানবসমাজ ও সভ্যতার বিলোপ ঘটাবে। এই দুইটি সম্ভাবনার মধ্যে ভবিষ্যতে মানুষের ভাগ্যে কোন্‌টি সত্য হয়ে উঠবে তা নির্ভর করবে বিজ্ঞানীদের ধর্মবুদ্ধি ও মনোবৃত্তির উপর।

এই প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী ও দার্শনিক মনীষী প্যাসকেল, তাঁর 'পেনসিজ' গ্রন্থে যা লিখে গেছেন, পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে তা আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মনে করি।—

'মানুষ তো নলখাগড়ার চেয়ে বড় বেশি কিছু নয়; প্রাকৃতিক জগতে দুর্বলতম প্রাণী মানুষ, কিন্তু তবু সে চিন্তাশীল। তাকে পিষে মারবার জন্য সমগ্র বিশ্বের অস্ত্রসজ্জার দরকার নেই। একটু বাষ্প, একবিন্দু জলই তাকে মেরে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু বিশ্বজগৎ যদি তাকে মেরেই ফেলে তা হলে মানুষ তার হত্যাকারীর চেয়ে বেশি মহীয়ান হবে। কেন না সে জানে সে মৃত্যুবরণ করেছে আর বিশ্বজগৎ তার বিন্দুবিসর্গ কিছু জানে না।

আমাদের তাবৎ মর্যাদার উৎস চিন্তাশীলতা। এর সাহায্যে আমাদের উন্নীত হতেই হবে, মহাশূন্য ও অপূরণীয় দিয়ে নয়। মহাকাশে, আমি আমার মর্যাদার (Pérsonal potential) সন্ধান নিশ্চয়ই করব না, কিন্তু আমার চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করে যদি নিজস্ব জগতের অধিকারী হই, তা হলে চাইবার মত আর বেশী কিছু আমার থাকবে না।'

মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের বিবিধ অবদানের পরিচয় উপরে দিয়েছি এবং এও বলেছি যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অপব্যবহারের ফলে আজ বিশ্ব জুড়ে মানুষ ও তার সভ্যতার এক চরম সংকট দেখা দিয়েছে। বিশ্বভুবনের তুলনায় মানুষ ক্ষুদ্রতম অণু থেকেও অণুর ছোট (অণোরণীয়ান্) হয়েও সে তার চিন্তা ও মননশীলতার প্রভাবে মহৎ থেকেও মহানের (মহতো মহীয়ান্) কল্পনা করে তার উপলব্ধির প্রয়াসী হওয়াই সবচেয়ে বড় আশ্চর্য। এই হলো বিজ্ঞানের সাধনা ও অপরপক্ষে ধর্মেরও সাধনা। এরই প্রেরণায় মানুষ চায় তার অন্তর্জগতের মধ্যেই অসীম বিশ্বজগতের উপলব্ধি করতে বা অনন্তের সঙ্গীত শুনতে—সীমার মাঝে অসীমের সুর শুনতে।

জনগণ ও থিয়েটার

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

সম্প্রতি 'সর্বভারতীয় জননাট্যসঙ্ঘে'র কার্যাবলি সম্বন্ধে কিছু কাগজপত্র আমার হস্তগত হয়েছে। বোম্বাই থেকে এই সঙ্ঘ কার্য শুরু করেছেন, চিত্র আর অভিনয়ের ভেতর দিয়ে। অল্পদিন হয়, বিখ্যাত শিল্পী হারীন চট্টোপাধ্যায়, কলকাতার এক রঙ্গমঞ্চে জনসঙ্গীত ও জননাট্যের সামান্য নমুনা দেখিয়ে গিয়েছেন। খবর পেয়েছি, বাংলার কর্মীরা, কৃষক ও শ্রমিকদের উপযোগী সঙ্গীত রচনা ক'রে তাঁদের নিয়ে কোথাও কোথাও গানের আসর জমিয়েছেন। সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির প্রচারই যে এ-সব উদ্যমের স্পষ্ট উদ্দেশ্য এ-কথা গোড়ায় ব'লে রাখাই ভালো।

প্রচারের জন্য কলা, না শুধু কলার খাতিরেই কলা, এ-বিবাদের দিন চলে গিয়েছে। মানুষ যখন সমাজের কোনো সাময়িক সুব্যবস্থার মধ্যে বাস করে তখন তার কলার খাতিরে কলার চাষের বিলাসিতা পোষায়। কালিদাস-শেক্‌স্‌পিয়রের পেছনে রয়েছে বিক্রমাদিত্যের-এলিজাবেথের সম্পদপ্রাচুর্যের আমল। কলার খাতিরে কলার অন্তরালেও চল্‌তি ব্যবস্থা কায়েমী রাখবার প্রচারচেষ্টা লুক্কায়িত থাকে। সম্পদের উৎস যে-নিপীড়িত জনগণ, শিল্পকলায় তাঁদের ব্যথা বেদনা নালিশের কথার যে উল্লেখ থাকে না, সে-অবহেলা অনেক সময় অনিচ্ছাকৃত নয়।

জননাট্য যখন স্বতঃস্ফূর্ত, অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিকরা স্বয়ং যখন তার স্রষ্টা, তখন সেটা তাঁদের জাগৃতির চিহ্ন। বাইরে থেকে তাঁদের জন্য সৃষ্টি, তাঁদের জাগরণ-উদ্দেশ্যে। জনগণের সেই অফুরন্ত শক্তির উৎস খুলে দেওয়াই এখন কর্মীদের কাজ।

বাংলায় এ-ব্যাপারে কী করা যেতে পারে ঠিক করার আগে দেখা উচিত কী বাংলায় আছে। কলকাতা সহরে পাঁচটি সাধারণ রঙ্গালয় বর্তমানে চলছে, ধনী দরিদ্র সর্বশ্রেণীর বাঙালী পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে দেখছেন ব'লেই চলছে। এই সস্তা সিনেমার বাজারে পাঁচটি থিয়েটার চলায় বোঝা যায় বাঙালী থিয়েটারকে অন্তরে গ্রহণ করেছেন। ভারতের অন্য প্রদেশের এ-সৌভাগ্য হয় নি শুনতে পাই। সম্প্রতি ঢাকাতেও একটি সাধারণ রঙ্গালয় খোলার সংবাদ এসেছে। ইতিপূর্বে ঢাকাতে কখনো একটি, কখনো দুটি থিয়েটার কিছুদিন চ'লে বন্ধ হয়েছিল, সিনেমার ঢেউয়ে টিকে থাকতে পারে নি। আবার যে খোলবার

সাহস হয়েছে, এটা থিয়েটারের জীবনীশক্তিরই প্রমাণ। তাছাড়া সহরে মফঃস্বলে বাংলার সর্বত্র সৌখীন থিয়েটারের প্রাচুর্য। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যেও এ-বিষয়ে উৎসাহ প্রচুর। এ-সমস্ত থিয়েটারের উৎসাহী ও উৎসাহদাতারা সম্পূর্ণ মধ্যশ্রেণীর, বা ভদ্রলোক-শ্রেণীর। দরিদ্র কৃষক-শ্রমিকশ্রেণী থিয়েটারের আনাচ কানাচ মাত্র স্পর্শ করতে পেরেছেন। কী ক'রে সে-শ্রেণীর কাছে থিয়েটার আপনার ক'রে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই হচ্ছে সমস্যা।

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গমঞ্চ ছিল কিনা, থাকলে তার রূপ ছিল কী, সেসব তথ্য প্রাচীন পুঁথির পাতায় থাকতে পারে। কিন্তু বাংলার চল্‌তি অভিনয়ে মঞ্চের বালাই কিছু ছিল না। অভিনয় হ'ত খোলা প্রাঙ্গণে বা প্রান্তরে, ওপরে একটা আচ্ছাদন থাকত কি থাকত না। মনসার পাঁচালী, মঙ্গলচণ্ডীর গান, রামায়ণ, কৃষ্ণযাত্রা, শেষদিককার থিয়েটারী যাত্রা, সবই অভিনয় হয়ে আসছে আসরে, দর্শক বা শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যস্থলে, কোনো আলাদা মঞ্চের ওপর নয়। আর, গাজনের হরগৌরী কালিকা প্রভৃতি নৃত্য, গণক বেদে বেদিনী প্রভৃতি প্রাকৃত সঙ্গীতাভিনয়, বহুরূপীদের নানা চরিত্রাভিনয় তো নটেরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে দেখিয়ে আসতেন। পারিতোষিক যে যার খুশি দিতেন, না দিতেন, ধনীদের বদান্যতায় অথবা তোলা-টোলা তুলে একরকম ব্যয়ভার বহন করা হ'ত।

রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার সম্পূর্ণ ইংরেজদের আমদানি। সাহেবরা এদেশে এসে প্রথমে উদাহরণ দেখান। তারপর কলকাতা সহরের ধনী ইংরেজিওয়ালারা তার সৌখীন অনুসরণ করতে আরম্ভ করেন। ক্রমে মধ্যশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপ্ত হ'য়ে থিয়েটার ব্যবসায় হিসাবে চলতে আরম্ভ হয়। ব্যবসায় হিসাবে চলার জন্য থিয়েটারকে জনপ্রিয় করবার তাগিদ আসে, আর জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা ছিল ব'লেই ব্যবসায়ীর দৃষ্টি থিয়েটারের ওপর পড়ে।

থিয়েটার যখন ব্যবসায়ে নামে, তখন বাংলায় হিন্দুর পুনরুত্থানের কল্পনা প্রবল। বিলাতী সংস্কৃতির মোহে বিচলিত ইয়ংবেঙ্গলকে ব্রাহ্মসমাজের অতিরিক্ত খৃষ্টানী ছুঁৎমার্গীভাব বাংলার জনমন থেকে ব্রাহ্মসমাজকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখল। বঙ্কিম তখন হিন্দুয়ানীর দিকে নজর ফিরিয়ে আনছেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে তার পরিণতি। সেই হিন্দুভাবধারার প্রাবল্যের মধ্যে কলকাতার রঙ্গালয় যাত্রা শুরু করে। গিরিশ সেই ভাবধারা থিয়েটারের খাদে চালিয়ে জনমনকে নিলেন টেনে। তারপর এল বাংলায় স্বাদেশিকতার বন্যা। সে-উদ্বেলও হিন্দুরঙে রঞ্জিত। থিয়েটারের পক্ষে সে-ভাবধারায় যুক্ত হতে বিলম্ব হ'ল না।

এ-সমস্ত আন্দোলন ও প্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল প্রধানতঃ মধ্যশ্রেণীর মধ্যে। সে জন্যে বাংলার সংখ্যাধিক্য মুসলমান অবহেলিত থাকলেও এসে যায় নি। কিন্তু স্বাধীনতার আন্দোলন যখন দরিদ্র জনগণের মধ্যে প্রসারের আবশ্যকতা এল তখন থিয়েটার ফেলল খেই হারিয়ে। বিরাট গান্ধী-আন্দোলনের সঙ্গে থিয়েটার সে জন্যে তাল রেখে চলতে পারে নি। আন্দোলনের প্রসারতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দরিদ্রকে (কাজেই মুসলমানকেও) বাদ দিয়ে থিয়েটার চলতে গেলে, এখন খুঁড়িয়েই চলবে, যতদিন পারে।

যদি আবার থিয়েটার সুস্থ হ'য়ে জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলতে চায়, তবে ধর্মবিশেষের একদর্শিতা বর্জন ক'রে সর্বমানবের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, শক্তি-সামর্থ্যের বাণী শোনাতে হবে তাকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। নব জাতীয়তায়, নব মানবতায়, উদ্বুদ্ধ মন এজন্যে থিয়েটারে আসবার প্রয়োজন—নট, নাট্যকার, পরিচালক, প্রযোজক হিসেবে। মঞ্চ রচনা বর্তমানে ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার, সৌন্দর্যের চাইতে ঐশ্বর্যপ্রকাশের চেষ্টা অধিকতর। নতুন মঞ্চকারকের দৃষ্টিভঙ্গী হবে বদলাতে, কত অল্প ব্যয়ে কত বেশি সুন্দর সৃষ্টি সম্ভব, তা ক'রে দেখাতে হবে তাকে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জনগণের বোধ্য ভাষায় ভঙ্গীতে অভিনয় শিখতে হবে নাটকে। জনগণের ব্যথার কথা আশা ও শক্তির কথা রচনা করতে হবে নাট্যকারকে। জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার মতো ব্যয়সঙ্কোচ অথবা লোভদমন করতে হবে দরদী ব্যবসায়ীকে। জনগণের মনে সৃষ্টিচেতনা জেগে উঠলে তাঁরা এর প্রচুর প্রতিদান দেবেন একদিন, এ-সত্য পরীক্ষিত।

থিয়েটারের কথাই বেশি বলছি, সিনেমার কথা এখন বলছি না। কারণ, সিনেমা যদিও জনগণের মধ্যে প্রচারের পথ ও সস্তায় প্রচার করতে পারছে, তবু তাঁদের মধ্যে সিসৃক্ষা জাগাবার সাহায্য করছে না। সে-বিষয়ে থিয়েটারের সম্ভাবনা বেশি।

আগেকার আসরী যাত্রা-পাঁচালীর সম্ভাবনা তো আরো বেশি। কেবল জনগণকে শিখিয়ে দিতে হবে, কেমন ক'রে গোস্বামী-ভূস্বামীদের অনুকরণ বর্জন ক'রে তাঁরা আপনাদের কথা বলতে পারেন আপনাদের জীবন দেখাতে পারেন।

ইতিহাস

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ইতিহাসের অর্থ ও রীতি সূচনায় ইঙ্গিত করা হয়েছে। দৃষ্টান্তের দ্বারা সেই ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট করাই প্রবন্ধের এই অংশের উদ্দেশ্য।

ইতিহাসের স্থূলধারাটি এক হলেও, বিভিন্ন দেশের পারিপার্শ্বিকের জন্য সে ধারা ভিন্নরূপ ধারণ করে ও ভিন্ন গতিতে চলে। যে দেশ কোনো কারণে কৃষিপ্রধানই রয়ে গেল, চাষবাস ব্যতীত যে দেশের লোকের জীবিকা-সংগ্রহের অন্য উপায় আবিষ্কৃত কিংবা অনুকৃত হল না, সেখানে সমাজের গঠন নির্ভর করে প্রধানতঃ জমির সত্ত্বের উপর। কৃষিপ্রধান দেশে জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধটি অন্যান্য সামাজিক সম্বন্ধের মূলসূত্র হয়ে ওঠে। হপ্‌কিন্‌স্ নামক একজন চিন্তাশীল লেখক পিতাপুত্রের সম্বন্ধ বিচার করে এক পুস্তক লিখেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি দেখাচ্ছেন যে, সম্পত্তির উপর পিতার একচেটিয়া অধিকারের বিপক্ষে পুত্র বরাবরই আপত্তি করে এসেছে এবং সেই বিরোধের ফলে সমাজধর্মে অনেক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। তাঁর ভাষায়, কৃষিপ্রধান সমাজে পিতার স্থান বর্তমান সমাজের মনোপলিস্ট ক্যাপিটালিস্টের (Monopolist Capitalist)—একচেটিয়া সত্ত্বভোগী পুঁজিপতির মতন। রোমান আইনে পিতার অধিকার গোড়ায় কি ছিল এবং পরপর কিভাবে কমে এসেছিল দেখলে হপ্‌কিন্‌সের মন্তব্যে সায় দিতে হয়। চীন সভ্যতাকে আমরা নিতান্তই ধর্মপ্রাণ ও অটল-অচল বলে শ্রদ্ধা করি—কারণ সেটি গোষ্ঠীপ্রধান। গ্রানে সাহেব দেখিয়েছেন যে, চীন-গোষ্ঠীর মধ্যে পিতা-পুত্রের আদর্শ সম্বন্ধের ভিত্তি হল জমিদারের প্রতি প্রজার শ্রদ্ধাভক্তি। ঈজিপ্টেও এই জমিসত্ত্ব-সম্বন্ধ মনসবদারিতে পরিণত হয়ে সমাজের অন্যান্য কর্মে ও চিন্তায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস থাকলেও ঐতিহাসিক নেই—সেজন্য এই কৃষিপ্রধান দেশের সম্পত্তিজ্ঞান কিভাবে তার সমাজকে গড়ে তুলেছিল আমরা ঠিক জানি না। একটা কথা তবু জোর করে বলা চলে, মুসলমান ও ইংরেজ যুগে জমিদারিসত্ত্বের ইতিহাস না জানলে লোক-সমাজের ইতিহাস বুঝতে পারা যায় না। আমাদের লোকাচার বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে লোক-ধর্মে, আমাদের বিবাহাদি অনুষ্ঠানে, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধে, শ্রাদ্ধতর্পণে, গ্রাম্য সমাজের মনোভাবে জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। ভগবানকে রাজা এবং ভক্তকে প্রজা বলবার প্রথাটি অপ্রাচীন নয়। পৌরাণিক স্বর্গের সমাজও এই সমাজের প্রতীক। তা ছাড়া, মুসলমান সাম্রাজ্যের

উৎপত্তি, বিস্তার ও পতনের মধ্যেও এ সম্বন্ধটি যে বিশেষভাবে কার্যকরী তা দেখতে পাই। মুসলমান রাজারা জমির ভোগদখলে বিশেষভাবে হস্তক্ষেপ করেননি বলেই তাঁদের প্রভুত্ব ভারতের ঐতিহাসিক ধারাকে বিশেষভাবে পরিবর্তিত করেনি। ইংরেজ যুগের আইনে ভোগসত্ত্ব পরিবর্তিত হচ্ছে, সেজন্য আমাদের ইতিহাসের ধারাও বদলাচ্ছে। একদিকে স্থায়ী বন্দোবস্ত, অন্যদিকে প্রজাসত্ত্বের আইন,—ও খানিকটা তারই ফলে ফ্যাক্টরী-প্রতিষ্ঠা, এইগুলোই হল ভারতের বর্তমান যুগের নির্দেশ-চিহ্ন।

কৃষিকার্যের অপেক্ষা জীবনধারণের আরো ভালো উপায় আছে ইংরেজের কাছেই প্রথমতঃ আমরা এ খবরটি পেয়েছি। সেজন্য ইংলণ্ডের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইংলণ্ডে জীবনধারণের রূপ-পরিবর্তন এতই অদ্ভুত বলে লোকের মনে ঠেকে যে তাকে রেভলিউশন বা বিপ্লব বলা হয়। কিন্তু এই ইনডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বা শিল্প-বিপ্লবের পূর্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে দেশে আর একটা বিপ্লব লোক-চক্ষুর অন্তরালে সাধিত হয়েছিল। পশমের ব্যবসার জন্য মেষপালনের প্রয়োজন, সেজন্য অনেক জমি একত্রে থাকা চাই, তাই চাষার দখলে যেসব খণ্ড খণ্ড জমি ছিল সেগুলিকে এই জমিদার-ব্যবসাদার সম্প্রদায়ের দখলে আনা হল। পার্লামেন্ট কোনো আপত্তি করলে না, পার্লামেন্টের প্রায় সব সভ্যই তখন ঐ দলের। ইংলণ্ডের গ্রাম অবস্থা তখন অন্য গ্রাম ও কৃষিপ্রধান দেশের মতই ছিল। এখনকার ইংলণ্ডের অবস্থা দেখলে সে অবস্থা বোঝা যায় না, কেন না ইংলণ্ডই বোধ হয় একমাত্র দেশ যেখানে উৎপাদনের উপায়ভেদে, অর্থাৎ কলকারখানার জন্য, সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ের পাতা শেষ করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ পর্যন্ত ইংলণ্ড কৃষিপ্রধান ছিল, (১৭৯২ সালেই প্রথম রীতিমত শস্য আমদানি হতে লাগল), অনেক জমি তখনও ছোট জমিদারের হাতে। কুটির-শিল্পের সাহায্যে তখনও অনেক লোকে জীবনধারণ করছে। কিন্তু এই সময় জমিদারের হাতে ব্যবসালব্ধ টাকা জমতে শুরু হয়। তাঁরা উদ্বৃত্ত টাকায় নতুন জমি, চাষবাসের নতুন কল কিনলেন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে শস্যের দাম কমালেন। ছোট চাষীরা হটে গেল, কুটির-শিল্প নষ্ট হল, টুকরো টুকরো জমি বড় বড় জমিদারের দখলে এল। জমি দখলের জন্য অনেক সময় আইনের সাহায্যও নিতে হত না, তিন ভাগের দু' ভাগ চাষী সম্মতি দিলেই চলত। সম্মতি তাদের দিতেই হত। ফলে ১৮০০ সাল থেকে ১৮১৯ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষ একর জমি জমিদারের হাতে এল, ১৮৫০ সালে আর কিছুই বাকি রইল না। চাষী ও গ্রামবাসীদের common land-এর উপর অধিকারও চলে গিয়েছিল। গরীবের দুঃখ উপশমের জন্য একটা পরিবেষ্টন-সমিতিও যে বসেনি তা নয়, ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু টাকাও চাষীরা পায়—কিন্তু সে টাকা দু'দিনেই উবে যায়। তখন জমি ও গ্রাম থেকে বিতাড়িত চাষী বাধ্য হয়ে কলকারখানায় যোগ দেবার জন্য শহরে এল, কিংবা এই জমিদার ও প্রজার বেড়াজালের বাইরে নতুন দেশে, আমেরিকায় চলে গেল।

ইতিমধ্যে আবার কলকারখানার নতুন মালিকরা জমিদার হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এইজন্য জমির দাম খাজনার চল্লিশগুণ হয়। পুরানো জমিদারের গোষ্ঠী লোপ পেল, নতুন বড়লোকের সঙ্গে বিবাহাদি চলতে লাগল। রিফর্ম বিলের সময় ১৮৩০।৪০ সালে, পশ্চিম য়ুরোপের মধ্যে ইংলণ্ডেই জমিদারপিছু গড়পড়তা সবচেয়ে বড় এবং জমির সত্ত্বাধিকারী চাষীপিছু গড়পড়তা সবচেয়ে ছোট জমির চাষ হত। ইংলণ্ডের গ্রাম্য সমাজ এইভাবে তিন ভাগে বিভক্ত হল—খাজনা উপভোগী জমিদার, ফসলের ব্যবসাদার জমিদার এবং চাষের মজুর সম্প্রদায়। কিন্তু গ্রাম্যসমাজও ক্রমে লোপ পেল, ইংরেজ শহরবাসী হল। যেখানে কলকারখানা সেখানেই ভিড়, সেখানেই শহর।

ইংরেজ-সমাজের আমূল পরিবর্তন ও নতুন শ্রেণী-বিভাগের জন্য একধারে যেমন ধনতান্ত্রিক কৃষিকর্ম তেমনি অন্যধারে নতুন কলকব্জার আবিষ্কার ও ঔপনিবেশিক ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ-সমাগমই দায়ী। এই সময়কার কলকব্জার আবিষ্কারের বিবরণ পড়লে মনে হয় যে, আবিষ্কারকদের প্রেরণা একেবারেই নিঃস্বার্থ ছিল না। কয়লার খনিতে জল ভরে উঠছে, সেই জল তুলে ফেলতে হবে, মজুররা পারছে না, নতুন কল চাই, অশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়াররা ব্যবহারিক বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ চালানো কল একটা খাড়া করলেন, পরে একজন আবিষ্কারক সেই কলগুলোকে অদলবদল করে নতুন কল সৃষ্টি করলেন, যার সাহায্যে খনি থেকে জল তোলাও হল, আবার এক শহর থেকে অন্য শহরে দ্রুততরভাবে এবং সস্তায় মাল পাঠানোও হল। এই উপায়ে তুলোর কারখানায়, রাস্তা তৈরিতে, খাল কাটানোতে, সরবরাহের উপায় রেল-জাহাজে, কলের বহুল প্রয়োগ শুরু হল। অবশ্য এ সবই বিজ্ঞানের দৌলতে। আজকালকার বৈজ্ঞানিকদের আপত্তি মঞ্জুর করে এই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ-বিজ্ঞান কিংবা টেকনলজি বলা চলতে পারে। কলের প্রয়োগ থেকে শুধু উৎপাদনের সংখ্যা ও হার বৃদ্ধি হল তা নয়, বহিঃপ্রকৃতির কাছ থেকে জীবনধারণের উপায়ও পরিবর্তিত হল। প্রথম পরিবর্তন উৎপাদনের উপায়ভেদে; মানুষের বদলে কল, যার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ দূর থেকে দূরতর হতে চলল, যার ফলে আবার উৎপাদন নামক প্রকৃত সামাজিক প্রক্রিয়াটি নৈর্ব্যক্তিক ও অমানুষিক হয়ে উঠল। দ্বিতীয় পরিবর্তন সামাজিক শক্তির রূপভেদে—পূর্বে ছিল যার অন্নসংস্থান বেশী তারই প্রতিপত্তি, এখন হল যার হাতে টাকা কিংবা যার টাকা ধার করবার ক্ষমতা বেশী তারই প্রভাব বেশী। পূর্বে সমাজিক প্রতিপত্তির মাপকাঠি ছিল প্রতিপালন, এখন সে ক্ষমতা সমাজিক কল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উৎপাদনের পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্যই নিয়োজিত হল। পূর্বে ক্ষমতার দায়িত্ব ছিল সমাজের প্রতি, এখন শক্তির দায়িত্ব হল শুধু নিজের অর্থবৃদ্ধি এবং শক্তির প্রয়োগ হল শক্তিশালী ব্যক্তির এবং শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্য চাই প্ল্যান, চাই নতুন কল, চাই নতুন বাজার, কিংবা পুরানো বাজারে চাহিদার নতুন স্তর, চাই র‍্যাশনালিজ্‌ম্‌, চাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির বুদ্ধি, চাই ব্যবহারিক ধর্ম, চাই মুনাফা বাড়বার জন্য একনিষ্ঠতা। যত টাকা জমছে, ততই

কল বাড়ছে; যত কল বাড়ছে, ততই টাকা জমছে—এ যেন একটা স্বাভাবিক নিয়ম! আগে, মধ্যযুগে, একজোড়া কাপড়ের জন্য তাঁতির বাড়ি যেতে হত, তাঁতি অর্ডার না পেলে ভালো কাপড় তৈরি করত না। কলের মালিক এই রকম ব্যক্তিগত অর্ডারের জন্য বসে থাকতে পারেন না। কল ও টাকাকে সর্বদাই খাটানো চাই, বসে থাকলেই তাদের মালিককে তারা, গল্পের ভূতের মতন, মেরে ফেলবে। সব জিনিস এক ছাঁচে ঢালাই হল ও বেশী পরিমাণে প্রস্তুত হল। সেজন্যই শ্রমবিভাগ, যাতায়াতের সুগমতা এবং নতুন বাজারে অবাধ বাণিজ্য ও ব্যবসা চাই। উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিহাসের মূল কথা এই প্রয়োজনগুলো। এদের তাগিদেই ইংলণ্ড এখনকার বৃটিশ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

বাংলার নবজাগরণের সূচনা

কাজী আবদুল ওদুদ

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে ব্যাপক জাগরণ ঘটে তার কথা ভাবতে গিয়ে স্বতঃই মনে পড়ে ইউরোপের সুবিখ্যাত রেনেসাঁসের কথা।

মধ্যযুগের শেষের দিকে পশ্চিম-ইউরোপের ফ্রান্স ইতালি ইংল্যাণ্ড জার্মেনি এবং আরো কয়েকটি দেশে মানুষের অন্তর ও বাহির দুই ক্ষেত্রেই কয়েক শতাব্দী ধরে চলে নতুন নতুন উদ্যম—কাব্যকলা দর্শনবিজ্ঞান এসব ক্ষেত্রে ঘটে বহু প্রাচীন সম্পদের সঙ্গে নতুন পরিচয় আর নতুন নতুন সৃষ্টি, ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মতো দূর দূরান্তের দেশ হয় আবিষ্কৃত, আর বহু-কাল-ধরে-চলে-আসা ধর্মব্যবস্থা প্রায় আগাগোড়া বদলে যায়। এইসব ঘটনা যা ঘটে বা ঘটাবার চেষ্টা যা হয় তার সবটাই যে ভালো, অর্থাৎ বাঞ্ছনীয়, হয়েছিল তা বলা যায় না; বরং সময় সময় অবাঞ্ছিত অনেক ব্যাপারও এই যুগের লোকদের জীবনে দেখা দিয়েছিল, তবু মোটের উপরে, চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত, অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, এক অসাধারণ-প্রাণসমৃদ্ধ ধারাবাহিক প্রচেষ্টা যে এইসব দেশে লক্ষণীয় হয়েছিল, তা সর্ববাদিসম্মত বলা চলে।

এই অভিব্যক্তির সাধারণ নাম রেনেসাঁস, অর্থাৎ নবজন্ম। সাধারণত তিনটি ধারায় ভাগ করে দেখা যেতে পারে এই নবজন্মকে—প্রাচীন জ্ঞান ও কাব্য-কলার নতুন আবিষ্কার, জীবন সম্বন্ধে মানুষের নতুন আশা আনন্দ, ধর্ম বা জীবনাদর্শ সম্বন্ধে নতুন বোধ। এই নবজন্মের বা ব্যাপক জাগরণের প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী—প্রধানত এর সাহায্যে ইউরোপ, অথবা পাশ্চাত্য-জগৎ, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যযুগীয় খোলস চুকিয়ে দিয়ে আধুনিক হয়ে ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে জাগরণ ঘটে তাও এমনি একটা রেনেসাঁস : তার প্রভাবও হয়েছিল সুদূরপ্রসারী—সমস্ত ভারতবর্ষ তার দিকে তাকিয়েছিল বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে, ধর্ম সংস্কৃতি সাহিত্য রাজনীতি রাষ্ট্রীয় আদর্শ, সব ক্ষেত্রেই নবীন ভারতে যে রূপান্তর ঘটল তার মূলে এক বড়ো শক্তিরূপে কাজ করেছে এই রেনেসাঁস।

কিন্তু এই জাগরণ সম্বন্ধে যোগ্য চেতনার অভাব একালে সুস্পষ্ট—বাংলার বাইরে তো বটেই, বাংলার বুদ্ধিজীবীরাও এ-সম্বন্ধে যে চেতনার পরিচয় দিচ্ছেন তা ক্ষীণ। এর

একটি কারণ মনে হয় এই : বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের স্বদেশী আন্দোলনে এই জাগরণ নিজেকে জানান দেয় এক অসাধারণ বিক্রমে; কিন্তু তার পর বাংলায় শুরু হয় এক উন্মাদনার কাল—সন্ত্রাসবাদ, রাজরোষ, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এমনি বিচিত্রমূর্তির উন্মাদনার দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্ব। সেই প্রলয়রাত্রির অবসান হয়েছে বটে, তার পর ঘটেছে স্বাধীনতার নব অরুণোদয়; কিন্তু সাধারণভাবে আজও বাংলার ও বাঙালীর অবস্থার তুলনা হতে পারে অশেষ দুর্ভোগে সন্তানের জন্ম দিয়ে মাতার যে দশা হয় তার সঙ্গে।

হয়তো সেইজন্যই যে-জাগরণ বাংলার ও সমস্ত দেশের এমন সৌভাগ্যের মূলে, তাকে যোগ্য অভিনন্দন জানাবার আগ্রহ বাঙালীদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এই জাগরণ যোগ্য অভিনন্দনেরই দাবি রাখে। সেই দাবি মিটানোর উপরেই হয়তো নির্ভর করছে বাংলার ও ভারতের ভবিষ্যৎ। যা সুন্দর মহৎ ও সার্থক, বিশেষ করে নিজেদের ইতিহাসের ভিতরে, তার খোঁজ মানুষকে নিতে হয় চিরকাল—সুন্দর ও সার্থক হবার গরজ যখনই তাদের ভিতরে দেখা দেয়।

কিন্তু বাংলার এই জাগরণের সূচনা কখন থেকে ধরা হবে? সে-সম্বন্ধে উত্তর নির্ভর করে, এই জাগরণ বলতে কি বোঝা হবে প্রধানত তার উপরে। পরকালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষ যখন ইহকালের দিকে ভালো করে তাকিয়েছিল তখন সূচনা হয়েছিল রেনেসাঁসের, এই ধারণা থেকে কেউ কেউ কবি ভারতচন্দ্রের কাল থেকে এর সূচনা দেখেছেন। তাঁদের যুক্তি, ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেব-দেবীরা মানব মানবী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এ মত গ্রহণযোগ্য নয়, তার কারণ, যে মানবিকতা রেনেসাঁসের মূল্য বহন করে, অর্থাৎ বিকাশধর্মী মানবিকতা, সে-মানবিকতা ভারতচন্দ্রের দেব-দেবীতে নেই। ভারতচন্দ্রের দেব-দেবীদের মানবিকতা অনেকটা তাঁর পরবর্তীকালের কবি-খেউড়ের পতনধর্মী মানবিকতার সঙ্গে তুলনীয়—ভারতচন্দ্রের বহু আগে থাকতে মঙ্গলকাব্যগুলোতে দেবতার এই ধরনের মানবিকতা চিত্রিত হয়ে আসছিল। বলা বাহুল্য, বাংলার একালের জাগরণে এই ধরনের মানবিকতার প্রতিবাদ অবশ্য নীরব নবপ্রত্যয়-সমৃদ্ধ প্রতিবাদ—সুস্পষ্ট। ভারতচন্দ্রের পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর বড়ো কবি রামপ্রসাদ। তাঁর জনপ্রিয়তা আজও ব্যাপক এবং গভীর; আর বাংলার রেনেসাঁসের অন্যতম ধুরন্ধর পরমহংস রামকৃষ্ণ মুখ্যত তাঁর ভাবধারায় বর্ধিত। তবু রামপ্রসাদ থেকেও এই জাগরণের সূচনা ধরা যায় না; কেননা, রামপ্রসাদের জীবনবোধ ও সাধনা প্রধানত মধ্যযুগীয় ও ইহবিমুখ, কিন্তু বাংলার জাগরণের একটি বড়ো ঘোষণা 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'। বাংলায় ইংরেজের রাজত্ব ও নতুন যন্ত্রপাতির আমদানি থেকেও ইংরেজের রাজ্যলাভ ঘটেছিল, নতুন যন্ত্রপাতির আমদানিও হয়েছিল, কিন্তু সেসব জায়গায় রেনেসাঁস দেখা দেয় নি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকেও এই রেনেসাঁসের আরম্ভ ভাবা যায় না, কেননা ফোর্ট উইলিয়ম ছিল বিদেশী শাসকদের প্রয়োজনে গড়া প্রতিষ্ঠান মাত্র, তাতে বাংলা গদ্যের

গোড়াপত্তনের সহায়তা যা হয়েছিল তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে, কিন্তু সাহিত্যিক মূল্য কিছু যে আছে তা স্বীকার করা কঠিন—অন্তত তার প্রভাব বাংলার জীবন অথবা সাহিত্যের উপরে কিছু পড়ে নি অথবা যা পড়েছে তা সামান্য। রেনেসাঁস অর্থাৎ কোনো জাতির বা দেশের ব্যাপক জাগরণ, মুখ্যত চিৎ-সম্পদ, বস্তুসম্পদ তাতে কম অর্থপূর্ণ নয়, কিন্তু তা আনুষঙ্গিক—এই গোড়ার কথাটা ভুললে বস্তুর ও ঘটনার অরণ্যে দিশাহারা হওয়াই হবে আমাদের ভাগ্য।

বাংলার এই জাগরণের সূচনা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বসাধক রামমোহন রায়ের কলকাতায় বসবাস থেকে, আরো ঠিক ঠিক বলতে গেলে তাঁর বেদান্তগ্রন্থ ও তার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের কাল থেকে, অর্থাৎ ১৮১৫-১৬ খৃস্টাব্দ থেকে—এ মত স্বীকার্য বলেই মনে হয়। এই বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই রামমোহনের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অথবা পুস্তিকা 'তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন' (একেশ্বরবাদীদের জন্য উপহার) প্রকাশিত হয়েছিল, রংপুরে অবস্থানকালে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের সঙ্গে আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদও তাঁর হয়েছিল, প্রবল প্রতিপক্ষও তাঁর সেখানে জুটেছিল; তবু তাঁর কলকাতায় বসবাস ও বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশই বাংলার রেনেসাঁসের মূল ঘটনা বলে গণ্য হবার যোগ্য এই কারণে যে, দেশের বহুলোকের মধ্যে একটা নতুন চেতনার সূচনা হল এর থেকে, আর নিকটের ও দূরের অনেক জ্ঞানী গুণী বিদেশীর মনেও নতুন করে একটা চমক লাগল পুরাতন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থ অবশ্য ধর্মসংস্কার-মূলক, কিন্তু রামমোহন ধর্ম বলতে যা বুঝলেন তা বিধিবিধান-সর্বস্ব বা পরকাল-সর্বস্ব ব্যাপার যে নয়, বরং প্রধানত জীবনের উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপার, অচিরে তাঁর বহুমুখী প্রচেষ্টায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কীর্তন

দিলীপকুমার রায়

বাংলা সঙ্গীতে সবচেয়ে বৃহদঙ্গ সঙ্গীত যে কীর্তন সঙ্গীতসমাজে এ-বিষয়ে মতভেদ নেই—যদিও কীর্তনের সাঙ্গীতিক মূল্য নিয়ে নানান্ তর্ক আছে। একে কেউ বলেন লোকসঙ্গীত, কেউ বা বলেন সেন্টিমেন্টাল সঙ্গীত, কেউ বলেন কথাপ্রধান সুরবৈচিত্র্যহীন সঙ্গীত—কেউ বা বলেন মহান নাট্যসঙ্গীত। আমরা এই শেষের দলে। আমরা আরো বলি যে যদি বিশুদ্ধ সুরকারু শ্রুতিবিশুদ্ধির মাপকাটি দিয়ে না মেপে মানব-মনপ্রাণআত্মার বহুবিচিত্র গভীর আবেগমূলক নাট্যরাগ প্রেম ও ভক্তির মাপকাটি দিয়ে কোনো জাতীয় সঙ্গীতকে বিচার করতে হয়* তাহ'লে রবীন্দ্রনাথের মতে সায় না দিয়ে উপায় থাকে না যে, "উচ্চ অঙ্গের কীর্তন গানের পরিসর হিন্দুস্থানি গানের চেয়ে বড়ো। তার মধ্যে যে বহুশাখায়িত নাট্যরস আছে তা হিন্দুস্থানি গানে নেই।... চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম যে-হিল্লোল তুলেছিল সে একটা শাস্ত্রছাড়া ব্যাপার। তাতে মানুষের মুক্তি-পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করতে ব্যাকুল হোলো। সেই অবস্থায় মানুষ কেবল স্থাবরভাবে ভোগ করে না, সচলভাবে সৃষ্টি করে। এই জন্য সেদিন কাব্যে ও সঙ্গীতে বাঙালি আত্মপ্রকাশ করতে বসল।" (সঙ্গীতের মুক্তি)

কীর্তনকে যাঁরা লোকসঙ্গীতের কোঠায় ফেলেন তাঁদের ভুল এইখানে যে লোকসঙ্গীতের আঙ্গিক ও গঠনপদ্ধতি এত বহুবিচিত্র হয় না, হ'তে পারে না। বাউল ভাটিয়ালি সারি রামপ্রসাদী এরাই হ'ল যথার্থ লোকসঙ্গীত। কীর্তনের গঠনপদ্ধতিতে যে "বহুশাখায়িত নাট্যরস" আছে, যে মহৎ স্থাপত্যশিল্প আছে, যে ছবি ও সুর, প্রেম ও কাব্য, রূপ ও ভাবের একত্র-সমাবেশ, তাল ও আঁখরের বৈচিত্র্য আছে সে-সবই

---

* একথা বলছি এইজন্যে যে একই বস্তুকে দৃষ্টিভঙ্গি বা মাপকাঠি দিয়ে মাপলে বিচারী মনের রায়ও বিভিন্ন হতে পারে, এই কথাটি অনেকে ভুলে যান। য়ুরোপীয় সংধ্বনি সঙ্গীতকে (সিম্ফনি) যখন বিচার করি তখন তার মধ্যে মেলডির দৈন্য থাকলেও মেলডির দুর্ভিক্ষে তার শ্রেষ্ঠতা নাকচ করা চলে না। তেম্‌নি রাগসঙ্গীতের বিচারে স্বরসঙ্গতি (হার্মনি) খুঁজে এ-সঙ্গমের সৌন্দর্য না পেলে বলা চলে না যে রাগ সঙ্গীত নিম্নশ্রেণীর সঙ্গীত। উইলার্ড সাহেব একথা বুঝতেন, সেই জন্যে বারবার তাঁর বইয়ে লিখে গেছেন যে হার্মনি ও মেলডিকে এক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে গেলেই ভুল হবে। কীর্তন ও রাগ সঙ্গীত সম্বন্ধেও ঐ কথা: দুয়ের লক্ষ্য, রস, দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। কাজেই তুলনা করতে যাওয়াটাই ভুল।

সঙ্গীতের একটি উচ্চ সাধনার পরিণাম। বস্তুত কীর্তনের নানামুখী সমৃদ্ধির কথা ভাবলে মনে সম্ভ্রম না জেগে পারে না, এ-সিদ্ধান্ত না ক'রে থাকা যায় না যে, একটা উদার সুরের আলো নেমেছিল প্লাবনের কূলছাপানো কল্লোলে—সে-আলো মানব হৃদয়ের আবেগতটে লেগে উচ্ছ্বসিত উচ্ছলিত হয়েছিল প্রেমের তরঙ্গভঙ্গে—যার ফলে দিকে দিকে ছুটেছিল সে গানে তানে, ছবিতে রেখায়, গন্ধে বর্ণে, আঁখরে ভাবে—সর্বোপরি ভক্তিরসের মন্দাকিনী মাধুরী-বন্যায়।

যতদূর জানা যায় কীর্তনের প্রবর্তক—স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে: "বহিরঙ্গ সনে নামসঙ্কীর্তন, অন্তরঙ্গ সনে রস আস্বাদন।" এখনো এই দুই শ্রেণীর কীর্তনের চল আছে—নামকীর্তন ও রসকীর্তন। রসকীর্তনের চারটি প্রধান শাখা: গরানহাটি, মনোহরসাহি, রেনেটি ও মন্দারিনি। শেষের দুটি হাল্কা, প্রথম দুটি উদাত্ত গভীর ঠায় লয়ে গেয়। শ্রেষ্ঠ কীর্তন বলতে গরানহাটি মনোহরসাহিই বোঝায়। তবে এ ব্যাখ্যা বা ইতিহাস এ-বইয়ের লক্ষ্যবহির্ভূত। তাই এ-প্রসঙ্গে শুধু নাম কয়টি উল্লেখ ক'রেই সমাপ্তি টানছি—বিশেষ আরো এই কারণে যে কীর্তনের মতন বহুসমৃদ্ধ সঙ্গীতের যথাযথ বর্ণনা এ ছোট পরিসরে সম্ভবও নয়—এখানে তার দরকারও দেখি না। তাই আমি কীর্তনের ধারা ও আমাদের সঙ্গীতে তার ভাস্বর স্থানটি কোথায় সে-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ব'লেই ইতি করব।

কীর্তন সম্বন্ধে প্রথম কথা যেটা মনে আসে সেটা এই যে ওর যথার্থ বিশেষণ হচ্ছে "ক্লাসিক"। তাই ওকে লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে ফেললে জহুরিপনার পরিচয় দেওয়া হয় না। একথা মানি অবশ্য যে কীর্তন লোকপ্রিয়—কিন্তু কীর্তনের মূল্যনির্ধারণে এ-বিচার অবান্তর। কেননা কীর্তন যেজন্যে লোকপ্রিয় সেজন্যে বড় নয়। পপুলারিটি বা লোকপ্রিয়তা কোনো বড় শিল্পকলার মহত্বের পক্ষে প্রামাণিক নয়। এমন কি, একথাও বোধ হয় অকুতোভয়ে বলা যেতে পারে যে, কীর্তন অধিকাংশ স্থলেই পপুলার হয় তার ছোট আবেদনটুকুরই জন্যে সবাই জানেন কীর্তন ও বাউল এ দুয়ের নাম প্রায়ই একনিশ্বাসে করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু ওদের ভাবগত কিছু সামান্য সাদৃশ্য থাকলেও রূপগত কোনো মিলই নেই—বিশেষ সঙ্গীতরাজ্যে। বাউলই হ'ল সত্যকার লোকসঙ্গীত। অল্প এর গণ্ডি, অল্প এর কল্পনা, অল্প এর প্রতিভা, অল্প এর উচ্চাশা। এ মিষ্টি, সহজ আবেদনে সুললিত—যাকে ইংরাজিতে বলে 'প্রেটি' বাংলায় বলে—চিকণ বা চটকদার। এথেকে যেন কেউ আমাকে ভুল না বোঝেন। বাউল খুবই ভালো জিনিষ। কিন্তু বাউল হল একতারা, একমুখী, অল্পসুখী। পক্ষান্তরে কীর্তন হ'ল বহুতন্ত্রী, বহুবল্লভ, বহুঝঙ্কার, বহুছন্দিত। রেশ ওর অশেষ, সুরের ভাবের সুষমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—বহুমুখী। নানা বিকাশ-সম্ভাবনার ইঙ্গিতই ওর মধ্যে—প্রাণসম্পদ ওর অজস্র: শুধু কথায় নয়—আঁখরে, তানে, তালে, ছন্দে, নাট্য-পরিকল্পনায় ও মহীয়ান্। তাই কীর্তনকেও ক্ল্যাসিক্যাল বা মার্গসঙ্গীতের পর্যায়েই ফেলা উচিত—দেশী-

সঙ্গীতের পর্যায়ে ফেললে অবশ্য আপত্তি নেই যদি না কীর্তনের গরিমা নাকচ করা হয় এই ব'লে যে ও মাত্র লোকপ্রিয়। একথা জানা এবং মানা দরকার যে কীর্তন একটি অতি উচ্চবিকশিত সমৃদ্ধ সঙ্গীত—কৌলীন্য শালীনতায় অচলপ্রতিষ্ঠ।

কিন্তু কীর্তনের ক্লাসিসিসম্ বা কৌলীন্য হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের সমশ্রেণিক নয়, ওর জাতই আলাদা। কী জাত ওর? বলি।

রবীন্দ্রনাথ কীর্তন সম্বন্ধে একটি পত্রে লিখেছেন: "বাংলাদেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানি গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না, সে বন্ধন হোক না সোনার, বাদশাহি হাটে তার দাম যত উঁচুই হোক। অথচ হিন্দুস্থানি রাগরাগিণীর উপাদান সে বর্জন করেনি। সে সমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন সঙ্গীতলোক সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করতে হ'লে চিত্তের বেগ এম্‌নিই প্রবলরূপে সত্য হওয়া চাই।"

কীর্তন সম্বন্ধে এ হ'ল লাখ কথার এক কথা। কেবল একটি কথা: কীর্তন হিন্দুস্থানি রাগরাগিণীর কাছে হাত পাতেনি: সুরসম্পদে ও একেবারেই স্বকীয়—রাগসঙ্গীতের সঙ্গে ওর নাড়ির যোগ নেই। তবে সে যাক্, কবির আসল কথাটি সত্য: যে, কীর্তনের প্রেরণা এল মানুষের অন্তর্নিহিত গভীর ও দুর্নিবার হৃদয়াবেগ থেকে—বাইরের কোনো কলাকারু বা এস্থেসিস থেকে নয়।

সমবায় ও রবীন্দ্রনাথ

ভবতোষ দত্ত

'স্বদেশী সমাজ'-এর চিন্তাধারার পরের ধাপই সমবায়। যে সময়ে 'স্বদেশী সমাজ' রচিত হয়েছিল, সে সময়েই আমাদের দেশে সমবায়-প্রথার গোড়াপত্তন হচ্ছে। উনিশ শতকের শেষ দিকেই একটি দুটি করে সমবায়-সমিতি আমাদের দেশে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু এই প্রথার সুপ্রকট সূচনা হল তখনই, যখন সরকারি সহায়তা এবং আইনের ব্যবস্থা সহজপ্রাপ্য হল। ফ্রেড্রিক নিকলসনের রিপোর্টেরই ফলে ১৯০৪ সালে সমবায়-প্রথায় গঠিত ঋণদান-সমিতিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত এবং সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে প্রথম ভারতীয় সমবায়-আইন বিধিবদ্ধ হল। ১৯১২ সালে সর্বপ্রকার সমবায়-সমিতি সম্বন্ধে আইন পাশ হয়। এর দু বছর পরে ম্যাক্‌লাগান কমিটি ভারতের সমবায় আন্দোলনের সুবিধা অসুবিধা, ভবিষ্যৎ এবং প্রতিবন্ধক সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের অন্য অনেক সমস্যার মধ্যেও সমবায়নীতি ও কর্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের দেশে চলতে থাকে।

ভারতবর্ষের সমবায়-প্রতিষ্ঠানসমূহের ইতিহাসে একটা প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হল যে ঋণদান-সমিতি ছাড়া আর কোনো দিকে এর বিশেষ অগ্রগতি হয় নি। ১৯১৮-১৯ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় সমবায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন তখন বাংলাদেশে সমবায়-ঋণদানসমিতির সংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার, কিন্তু কৃষকদের ক্রয়বিক্রয়-সমিতির সংখ্যা ছিল মাত্র আটটি, গ্রামাঞ্চলে দুগ্ধ-উৎপাদনসমিতির সংখ্যা ছিল মাত্র চার এবং অন্য জাতীয় উৎপাদন এবং বিক্রয় সমিতির সংখ্যা ছিল ৯৫। ১৯১৭ সালে একমাত্র উল্লেখযোগ্য কৃষি-উৎপাদনসমিতি ছিল রাজসাহী-নওগাঁর গাঁজা-চাষীদের সমিতি, কিন্তু এই সমিতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূলে ছিল একচেটিয়া কারবার ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ।

সমবায়-সংগঠনের প্রয়োজন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে যে যুক্তি দিয়েছিলেন সেগুলি সহজ এবং সর্বজনগ্রাহ্য। সমবায়ের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি নীতিগত নয়; কার্যকরতার সম্ভাবনা কতটা সে সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায় বা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আশাভঙ্গ হয় বলেই নিরুৎসাহ হবার কারণ ঘটে। তা ছাড়া সমবায়ের মূলসূত্র ধরে অগ্রসর হলে ঋণদানের চেয়েও বড় প্রয়োজন উৎপাদন সংহতির, এ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ বার বার প্রকাশ করেছিলেন। অনেকটা দুঃখের সঙ্গেই এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন —

আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায়-প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিৎ শোধিত আকারে বহন করছে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা-উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।

—রাশিয়ার চিঠি, ১৩৬৩ সংস্করণ, পৃ. ১১৭

আর-এক জায়গায় এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ অন্যভাবে বলেছিলেন—

কো-অপারেটিভের যোগে অন্যদেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলছে, আমাদের দেশের টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার বেশি কিছু এগোয় না। কেন না, ধার দেওয়া, তার সুদকষা এবং দেনার টাকা আদায় করা অত্যন্ত ভীরু মনের পক্ষেও সহজ কাজ, এমন কি ভীরু মনের পক্ষেই সহজ; তাতে যদি নাম্‌তার ভুল না ঘটে তাহলে কোনো বিপদ নেই।

— রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ২৩

এটা লক্ষ্য করা উচিত যে এসব কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৯৩০ সালে, তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'তে। সমবায়-সম্বন্ধে তাঁর লেখা যে প্রবন্ধগুলি বিশ্বভারতী একত্রিত করে প্রকাশ করেছেন তাতে এই নৈরাশ্যটা ফুটে ওঠে নি। এই শেষোক্ত প্রবন্ধগুলি ১৯১৮ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে লেখা এবং তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মনে প্রধান প্রশ্ন হল কি করে সমবায়ের বাণী কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। তাঁর প্রবন্ধের পাঠক বা বক্তৃতার শ্রোতা অবশ্য কৃষকশ্রেণী নয়, কিন্তু শিক্ষিত সমাজকে আগে অবহিত করে না তুললে কোনো দিকেই যে অগ্রসর হওয়া যাবে না, এই কথাটা বোধ হয় তাঁর মনে তখনকার অবস্থায় বদ্ধমূল ছিল। ১৯৩০ সালের 'রাশিয়ার চিঠি'তে পরিশিষ্টে মুদ্রিত 'গ্রামবাসীদের প্রতি' নামক বক্তৃতা কিন্তু সাধারণ পল্লীবাসীদের কাছে দেওয়া হয়েছিল। এখানে এটাও উল্লেখযোগ্য যে সমবায়-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি যখন রচিত হয়েছিল, সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথের নিজের পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টায় শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা (১৯২২) হয়। ১৯২২ সালের আদর্শবাদ ১৯৩০ সালে অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

সমবায় সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলিতে চাষীদের প্রত্যেকের আলাদা কাজের চেয়ে একত্রিত কাজ যে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে এই কথাটাই বারবার জোর দিয়ে বলা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে যে কৃষিপদ্ধতির গুণগান করা হয়েছিল সেটা আমাদের দেশের চিরাচরিত পদ্ধতি নয়, সেটা পাশ্চাত্য ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার পদ্ধতি। যেখানে প্রত্যেক চাষীই দরিদ্র সেখানে কোনো আধুনিক কৃষিকর্ম ব্যক্তিগত চাষে হওয়া সম্ভব নয়, সমবায়ই সেখানে উন্নতির একমাত্র পন্থা। সমবায়ের পথে অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকের কথা তখনও তাঁকে বিশেষ চিন্তিত করে নি, সমবায়ের কর্মপদ্ধতিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করাটাই তখন

পর্যন্ত সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বলে তাঁর মনে হয়েছে। যে বাণী এই প্রবন্ধগুলিতে বারবার উচ্চারিত হয়েছে সেটা প্রবল আশ্বাবাদীর বাণী। যেমন —

সমবায়প্রণালীতে চাতুরী কিম্বা বিশেষ-একটা সুযোগ পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড়ো হইতে চাহিবে না। মিলিয়া বড়ো হইবে। এই প্রণালী যখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া যাইবে তখন রোজগারের হাটে আজ মানুষে মানুষে যে একটা ভয়ংকর রেষারেষি আছে তাহা ঘুচিয়া গিয়া এখানেও মানুষ পরস্পরের আন্তরিক সুহৃদ্‌ হইয়া, সহায় হইয়া, মিলিতে পারিবে।

—সমবায়নীতি, পৃ. ১২

কিংবা —

আজ প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের অন্তর ও বাহ্যশক্তির ঐক্যে বিরাট শক্তি সম্পন্ন। তাই মানুষ পৃথিবীর জীবলোক জয় করছে। আজ কিছুকাল থেকে মানুষ অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই সত্যকে আবিষ্কার করেছে। সেই নূতন আবিষ্কারেরই নাম হচ্ছে সমবায় প্রণালীতে ধন-উপার্জন।

—সমবায়নীতি, পৃ. ২৮

রবীন্দ্রনাথের চোখে সমবায়প্রণালী শুধু ব্যক্তিগত উপার্জনপদ্ধতিকে একত্রিত করে কার্যকর আকারের উৎপাদন-সংস্থা গঠনের পন্থাই নয়; উল্টো দিক থেকে সমবায় বিকেন্দ্রীকরণের সহায়তা করবে এমন বিশ্বাসও তাঁর ছিল —

অতিকায় ধনের শক্তি বহুকায়ায় বিভক্ত হয়ে ক্রমে অন্তর্ধান করবে, এমন দিন এসেছে। —সমবায়নীতি, পৃ. ২৮

সমবায় অতিক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-সংস্থা এবং অতিবৃহদায়তন উৎপাদন-সংস্থা, এই দুইয়েরই অসুবিধা, অন্যায় এবং আতিশয্য পরিহার করে কর্মদক্ষ, অথচ অন্যায়বলহীন উৎপাদনপদ্ধতির সূচনা করবে।

ঐ সময়ে সমবায়-প্রথার প্রসারের জন্য তাঁর এই আগ্রহ জন্মেছিল দেশের আর্থিক অবস্থা এবং ব্যবস্থার নানা প্রকারের সমস্যা অবধান করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তখনকার রাষ্ট্রীয় শক্তির কাছে কতটা কি আশা করা সম্ভব সেটা বিচার করে। মনে রাখা প্রয়োজন যে ঐ সময়েই ভারতবর্ষ হোমরুল আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগ এবং অসহযোগ ইত্যাদির ধাপে ধাপে রাষ্ট্রীয় শক্তির উপরে বিশ্বাস হারিয়েছে। অন্যদিকে ১৯১৮ সালে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিশনের রিপোর্টে মদনমোহন মালবীয় ভারতের আর্থিক উন্নতির ধারা কি রকম হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একটা জাতীয়তাপন্থী নির্দেশ দিয়েছেন। এই সব রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক

আলোচনার সবটাতেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের সম্মতি ছিল না। কিন্তু আবেদনের চেয়ে স্বাবলম্বনে ফল হবে বেশি, এটা তাঁর বিশ্বাস ছিল এবং অন্য দিকে এটাও বিশ্বাস ছিল যে উৎপাদনপদ্ধতিতে চিরকালীন প্রথাগুলিকে ত্যাগ করতে হবে।

এর সঙ্গে সঙ্গে ছিল আরও একটা বড় কথা—আর্থিক অসাম্যের অন্যায়। ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনৈতিক নেতারা বা অর্থনীতির পণ্ডিতেরা এ দিকে খুব বেশি জোর দেন নি। রবীন্দ্রনাথের চোখে আর্থিক অসাম্যসঞ্জাত সমস্যাগুলি বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, এবং অর্জিত বা অনর্জিত সঞ্চয়ের অধিকারী এবং শ্রমিকদের মধ্যে যে বিরোধ ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছিল সেটাও তাঁকে পীড়া দিয়েছিল। দু একটি উক্তি উদ্ধৃত করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে —

যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেন না, সকল-রকম প্রতাপের প্রধান বাহক হচ্ছে অর্থ। সেই অর্থ-অর্জনে যেখানে ভেদ আছে সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতেই পারে না। —সমবায়নীতি, পৃ. ১৭-১৮

রাশিয়া-ভ্রমণের ফলে সোভিয়েট আর্থিক ব্যবস্থার প্রতি রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সে-আকর্ষণের একটা বড় কারণ আর্থিক অসাম্য-সম্বন্ধে সোভিয়েট-নীতি। ভ্রমণের প্রথম দিকেই তিনি লিখছেন —

এখানে এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে এই, ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। —রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ১১

এবং অন্যত্র —

যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।

—রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ১৩

রাশিয়ার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের আর-একটা বড় কারণ কৃষি-উন্নতি সম্বন্ধীয় তাঁর নিজস্ব ধারণার সঙ্গে রাশিয়ার 'কালেক্টিভ ফার্ম' বা ঐকত্রিক কৃষিব্যবস্থার তুলনীয়তা। কালেক্টিভ ফার্মের পটভূমিকায় যে রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমিকাও অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল তার সবটা হয়তো ১৯৩০ সালের রাশিয়াতে রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে নি। কিন্তু যেটুকু তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল সেটা সহজ—ব্যক্তিগত কৃষির বদলে সমবেত কৃষি এবং তার ফলে আধুনিকতম প্রণালীর ব্যবহার, যান্ত্রিক কৃষির প্রসার এবং উৎপাদনের হার বৃদ্ধি। 'রাশিয়ার

চিঠি' যখন লেখা হয়েছিল তখন সমবায়-প্রথা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে বিরাট আশা দশ-পনেরো বছর আগে ছিল সেটা অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। সমবায়ের অগ্রগতি আমাদের দেশে যেটুকু হয়েছিল তার অনেকটাই যে উৎপাদনের দিকে না গিয়ে ঋণদানের দিকে গিয়েছিল সেটা তাঁকে বিশেষভাবে পীড়া দিয়েছিল। কতকগুলো আপাত-সহজ সমাধান যে ঠিক সমাধান নয় তাও তখন তিনি বুঝতে পেরেছেন।

যেমন —

চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বই কমবে না। —রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ২২

অর্থাৎ, আমাদের কৃষিব্যবস্থার উন্নতি আনতে হলে একটা বড় রকমের পরিবর্তন দরকার এটা বোধ হয় তিনি তখন বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন।

এই ধরনের একটা বড় পরিবর্তন রাশিয়াতে দেখতে পেয়ে স্বভাবতই তিনি আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রের আকার, কলের লাঙলের সংখ্যা এবং উৎপাদনের পরিমাণ দেখে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অবশ্য এ রকম কৃষিব্যবস্থায় নিজের স্বতন্ত্র সম্পত্তি যৌথ সম্পত্তিতে মিলিয়ে দিতে যে কেউ কেউ আপত্তি করতে পারে, এ প্রশ্ন তাঁর মনে জেগেছিল। তাঁর নিজের মনে হয়েছে যে একটা মাঝামাঝি সমাধান করা যেতে পারে —

ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তাহলে সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতায় প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না;

এবং এটাও তিনি উপলব্ধি করেছেন যে —

সোভিয়েটরা এই সমস্যাকে সমাধান করতে গিয়ে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। সে জন্যে জবর্দস্তির সীমা নেই। —রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ৩৪

কিন্তু অন্য দিকে যৌথ চাষে রাশিয়ার কৃষিজ উৎপন্নের প্রভূত বৃদ্ধি উপেক্ষার জিনিস নয়। জবরদস্তি বাদ দিয়ে ঐকত্রিক চাষ যদি সাধারণগ্রাহ্য করে দেওয়া যায় তাহলে যা হয় তারই নাম কো-অপারেটিভ্ ফার্মিং—যার কথা বহুদিন পরে আমাদের দেশে আবার শোনা যাচ্ছে।

লোকায়ত ঃ অর্থ বিচার

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় দার্শনিক পরিভাষার একটি চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য বর্তমান। আমাদের দেশে 'জনসাধারণের দর্শন' ও 'বস্তুবাদী দর্শন' বোঝাবার জন্য দুটি স্বতন্ত্র শব্দের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে একটি শব্দ : লোকায়ত। লোকায়ত মানে জনসাধারণের দর্শন, লোকায়ত মানে বস্তুবাদী দর্শনও। (নামান্তরে অবশ্য এ-দর্শন চার্বাক বা বার্হস্পত্য বলেও প্রসিদ্ধ।) কিন্তু লোকায়ত নামটিরই দ্বিবিধ তাৎপর্যের উপর আপাতত দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা যাক।

লোকেষু আয়তো লোকায়তঃ। জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলেই নাম লোকায়ত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[১] যেমন ব্যাখ্যা করে বলছেন, "লোকায়ত-মত লোকে আয়ত অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই ঐ নাম পাইয়াছে"। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'-র তর্জমায় কাওয়েল[২] লোকায়ত শব্দকে এই অর্থেই গ্রহণ করেছেন এবং সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত[৩] বলেছেন, নামটির আক্ষরিক অর্থ হল—জনসাধারণের মধ্যে যার পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক বিদ্বানদের এ-জাতীয় ব্যাখ্যার পিছনে বৃদ্ধসম্মতি অবশ্যই বর্তমান। দাসগুপ্ত[৪] যেমন বৌদ্ধ গ্রন্থ 'দিব্যাবদান'-এর নজির দিয়েছেন, —সেখানে লোকায়ত নাম এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই ব্যবহৃত। জৈন লেখক গুণরত্ন[৫] বলছেন সাধারণ লোকের মতো যারা নির্বিচারে আচরণ করে তাদেরই নাম লোকায়ত বা লোকায়তিক: "লোকা নির্বিচারাঃ সামান্য লোকাস্তদ্বদাচরন্তি স্মেতি লোকায়তা লোকায়তিকা ইত্যপি"। শঙ্করাচার্যরও[৬] বক্তব্য এই যে প্রাকৃতজন এবং লোকায়তিকেরা চৈতন্যবিশিষ্ট দেহমাত্রকেই আত্মা জ্ঞান করে: "দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মেতি প্রাকৃতা জনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ"। এইভাবে প্রাকৃতজন এবং

১। 'বৌদ্ধধর্ম', ৩৭-৮।

২। Cowell & Gough SDS 2n.

৩। Dasgupta HIP i. 78n. প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই গ্রন্থেরই তৃতীয় খণ্ডে দাসগুপ্ত বিস্তৃততর ভাবে 'লোকায়ত' শব্দর অর্থ বিচার করেছেন; HIP iii. 512 ff.

৪। Ib. iii. 514 n.

৫। 'তর্করহস্যদীপিকা', ৩০০।

৬। 'শারীরকভাষ্য', ১।১।১।

লোকায়তিকদের একত্রে উল্লেখ করার যেন প্রকৃত তাৎপর্যটুকু স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই শঙ্করের অনুগামী মাধবাচার্য[৭] বলছেন, সাধারণ লোকে মনে করে অর্থ ও কামই বুঝি পরম পুরুষার্থ, পরলোক কল্পনামাত্র—তারা চার্বাকমতানুসারী এবং এই কারণে চার্বাকমত লোকায়ত নামেই প্রসিদ্ধ: "নীতিকামশাস্ত্রানুসারেণার্থকামাবেব পুরুষার্থৌ মন্যমানাঃ পারলৌকিকমর্থমপহ্নুবানাশ্চার্বাকমতমনুবর্তমানা এবানুভূয়ন্তে। অতএব তস্য চার্বাকমতস্য লোকায়তমিত্যন্বর্থমপরং নামধেয়ম্"।

অতএব, লোকায়ত বলতে শুধু যে জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত তাইই নয়, এই মতে দেহাতিরিক্ত আত্মা ও পরলোকের কথা কল্পনামাত্র, পুরুষার্থ বলতে শুধু অর্থ ও কাম। অর্থাৎ সংক্ষেপে বস্তুবাদী মত। স্বভাবতই আধুনিক বিদ্বানেরা লোকায়ত শব্দটিকে সরাসরি বস্তুবাদ অর্থেও গ্রহণ করেছেন। যেমন, পিটার্সবার্গ অভিধানে[৮] লোকায়তর শব্দার্থ "মেটিরিয়ালিস্‌ম্' বা বস্তুবাদ। মনিয়ার-উইলিয়ম্‌স্-এর[৯] মতে পুংলিঙ্গে শব্দটির অর্থ বস্তুবাদী দার্শনিক, ক্লীবলিঙ্গে নিরীশ্বর বস্তুবাদী দর্শন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,[১০] পঞ্চানন তর্করত্ন,[১১] রাধাকৃষ্ণণ[১২] প্রমুখের রচনাতেও লোক-বা ইহলোক-সর্বস্ব,—অর্থাৎ বস্তুবাদী,—দর্শন অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত। এই অর্থগ্রহণের সমর্থনে তুচ্চি[১৩] প্রাচীন রচনার নজিরও দেখাতে চেয়েছেন: বুদ্ধঘোষ আয়ত শব্দকে আয়তন বা ভিত্তি অর্থে গ্রহণ করেছেন, অতএব যে-দর্শনের ভিত্তি বলতে লোক বা ইহলোক তারই নাম লোকায়ত। জৈন গ্রন্থকারদের বক্তব্য বোধ হয় স্পষ্টতর। 'ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়'-এ[১৪] উক্ত হয়েছে, 'এতাবানেব লোকোঽয়ং যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ'—লোক বলতে শুধু সেইটুকুই যা হল ইন্দ্রিয়গোচর। টীকাকার মণিভদ্র ব্যাখ্যা করেছেন, লোক অর্থে পদার্থসার্থ বা পদার্থসমূহ।

অতএব সংক্ষেপে, প্রত্যক্ষগোচর পদার্থই একমাত্র সত্য। তারই নাম লোক। লোক-সর্বস্ব বলেই দর্শনটির নাম লোকায়ত।

লোকায়তিকদের প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা প্রসঙ্গে মণিভদ্র একাধিক যুক্তির অবতারণা করেছেন। তার মধ্যে অন্তত একটি যুক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা ধর্মপ্রবঞ্চনার প্রতিষেধক; কেননা অনুমান, আগম প্রভৃতির নজির দেখিয়ে পরবঞ্চনপ্রবণ

৭। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ', ১।

৮। Roth & Bohtlingk v. 235.

৯। Monier-Williams 907 ; এই অর্থ গ্রহণের সমর্থনে কোলব্রুকের নজির দেখানো হয়েছে।

১০। বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮১ : 'ইহলোক ঐ দর্শনের সর্বস্ব, তজ্জন্যই উহার ঐরূপ নামকরণ হয়'।

১১। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, চতুর্দশ অধিবেশন, দর্শন শাখার সভাপতির ভাষণ।

১২। Radhakrishnan IP i. 279 n.

১৩। দাসগুপ্ত তুচ্চির এই মত উদ্ধৃত করেছেন : Dasgupta HIP iii. 514-5

১৪। 'ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়', শ্লোক ৮১।

ধর্মছদ্মধূর্তেরা সাধারণ মানুষের মনে স্বর্গাদিপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অন্ধ মোহের সঞ্চার করে: তাই প্রত্যক্ষ ছাড়া প্রমাণান্তরের স্বীকৃতি নিরাপদ নয়: "এবম্ অমী অপি ধর্মছদ্মধূর্তাঃ পরবঞ্চনপ্রবণা যৎ কিংচিৎ অনুমানাগমাদিদার্ঢ্যম্ আদর্শ্য ব্যর্থং মুগ্ধজনান্ স্বর্গাদিপ্রাপ্তিলভ্য-ভোগাভোগপ্রলোভনয়া ভক্ষ্যাভক্ষ্যগম্যাগম্যহেয়োপাদেয়াদি সংকটে পাতয়ন্তি, মুগ্ধধার্মিকান্ধ্যম্ চ উৎপাদয়ন্তি"।[১৪ক]

লোকায়তিকদের প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা এবং ধর্ম—তথা অধ্যাত্মবাদ-বিরোধিতা ভারতীয় দর্শনে অবশ্যই সুপ্রসিদ্ধ। আমরা পরে উভয় বিষয়েই বিস্তৃততর আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করবো। আপাতত অর্থবিচার প্রসঙ্গে একটি সাধারণ মন্তব্য করা যায়। লোকায়ত মানে জনসাধারণের দর্শন; লোকায়ত মানে বস্তুবাদী দর্শনও। অগ্রণী আধুনিক বিদ্বানদের রচনায় নামটির উভয় অর্থই সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত।

১৪ক। 'ষড়দর্শন সমুচ্চয়'-এর শ্লোক ৮১-র উপর মণিভদ্রর টীকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় গুণরত্নও লোকায়তিকদের প্রত্যক্ষপরায়ণতার ব্যাখ্যায় একই যুক্তি উল্লেখ করেছেন : "তথা বহবোহপামী বাদিনো ধার্মিকচ্ছদ্মধূর্তাঃ পরবঞ্চনৈকপ্রবণা যৎকিংচিদনুমানাগমাদিভির্দার্ঢ্যমাদর্শ্য জীবাদ্যস্তিত্বং সদৃশমেব ভাবমাণা অপি মুধৈব মুগ্ধজনান্ স্বর্গাদিপ্রাপ্তিলভ্যসুখসংততিপ্রলোভনয়াভক্ষ্যাভক্ষ্য-গম্যাগম্য-হেয়ো-পাদেয়াদিসংকটে পাতয়ন্তো বহুমুগ্ধধার্মিক-ব্যামোহমুৎপাদয়ন্তোহপি চ সতামবধীরণীয়-বচনা এব ভবন্তীতি"।—তর্করহস্যদীপিকা', ৩০৪।

আমার ছবি

ঋত্বিক কুমার ঘটক

আমরা এক বিড়ম্বিতকালে জন্মেছি। আমাদের বাল্যকাল বা আমাদের কিশোর বয়স যে-সময়ে কাটে সে-সময়ে দেখেছি বাংলার পরিপূর্ণ রূপ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিগ্বিজয়ী প্রতিভায় সাহিত্যকীর্তির তুঙ্গে অবস্থান করছেন, কল্লোলগোষ্ঠীর সাহিত্যকর্মে বাংলাসাহিত্য নব-বিকশিত, স্কুল-কলেজ ও যুবসমাজে জাতীয়-আন্দোলন পূর্ণ প্রসারী। রূপকথা, পাঁচালী আর বারো মাসের তেরো পার্বণের গ্রামবাংলা নবজীবনের আশায় থৈ থৈ করছে। এমন সময়, এলো যুদ্ধ, এলো মন্বন্তর, দেশের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেশটাকে টুকরো করে আদায় করল ভগ্ন স্বাধীনতা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বন্যা ছুটল চারদিকে। গঙ্গা পদ্মার জল ভাইয়ের রক্তে লাল হয়ে গেল। এ আমাদের নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতা। আমাদের স্বপ্ন গেল বিলীন হয়ে। আমরা এক লক্ষ্মীছাড়া জীর্ণ বাংলাকে আঁকড়ে ধরে মুখ থুবড়ে রইলাম। এ কোন্ বাংলা, যেখানে দারিদ্র আর নীতিহীনতা আমাদের নিত্যসঙ্গী, যেখানে কালোবাজারী আর অসৎ রাজনৈতিকের রাজত্ব, যেখানে বিভীষিকা আর দুঃখ মানুষের নিয়তি!

আমি যে-কটি ছবিই শেষের দিকে করেছি, কল্পনায় ও ভাবে এই বিষয় থেকে মুক্ত হতে পারি নি। আমার সবচেয়ে যেটা জরুরি বলে বোধ হয়েছে সেটা : এই বিভক্তবাংলার জরাজীর্ণ চেহারাটাকে লোকচক্ষে উপস্থিত করা, বাঙালীকে নিজেদের অস্তিত্ব, নিজেদের অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা। শিল্পী হিসেবে সর্বদাই সৎ থাকতে চেষ্টা করেছি, কতটুকু কৃতকার্য তা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারেই বলবে।

'মেঘে ঢাকা তারা' আর 'কোমল গান্ধার' করার পর 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে হাত দিই। যত অনায়াসে ঘটনাটিকে ব্যক্ত করলাম, বাস্তবে তা মোটেই ঘটে নি। প্রতিটি ছবি করার পর প্রচণ্ড মানসিক দুশ্চিন্তা, কাঠখড় পোড়ান আর শরীর ক্ষয়।

একদিনের ঘটনার কথা বলি, শুটিং তখন শুরু হয়ে গেছে। সুবর্ণরেখা নদীর কাছে আমরা তাঁবু পত্তন করেছি। ছবির ঘটনার ধারাবাহিকতা খুব পরিকল্পিতভাবে মাথায় নেই, বিচ্ছিন্নভাবে আউটডোর-শুটিং করে চলেছি। হঠাৎ একদিন সকালে আমার ছোটমেয়ে দৌড়ে এসে বললে, সে ভীষণ ভয় পেয়েছে, মাঠের পথে একা ছিলো, হঠাৎ একজন বহুরূপী এসে উপস্থিত, কালী সেজে তাকে যেন ভয় দেখিয়ে তাড়া করেছে। আমার

সঙ্গেসঙ্গে মনে পড়ল ছবির সীতার কথা, আজকের দিনের একটি শিশুর কথা। সেও হয়ত, যেন ঐভাবেই, মহাকালের সামনে পড়ে গিয়ে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠছে।

আমি খোঁজ করলাম বহুরূপীর। কীভাবে ব্যবহার করব, তার তখনও কোন নির্দিষ্ট ধারণা নেই, কিন্তু শুটিং করে নিলাম। পরে, ছবিতে ঘটনাটা দর্শকের কাছে কতটা বুদ্ধিগ্রাহ্য মনে হয়েছে জানি না, তবে আমার কাছে বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। মহাকালের প্রসঙ্গকে নানাভাবে ছবিতে টেনে এনে একটি পৌরাণিক ধারা-বিচ্যুত আধুনিক জীবনের শূন্যগর্ভ মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছি।

পুরাণকে এভাবে যথেচ্ছ ব্যবহার করা আমার আগের ছবিতেও আছে। যেমন 'মেঘে ঢাকা তারা'য় বা 'কোমল গান্ধারে'। উমার শ্বশুরালয়ে যাওয়ার সময় যে-প্রচলিত গীত বাংলাদেশে মুখে মুখে আবৃত্ত হয়, তাকে সঙ্গীতাংশে 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে ব্যবহার করেছি, আর 'কোমল গান্ধারে' ছিলো বিবাহের গানের প্রাচুর্য। দুই-বাংলার মিলন আমার কাম্য তাই, মিলনোৎসবের গানে ছবিটি ভরপুর। রেলওয়ে ট্রাকিং-এর ওপর এসে যেখানে ক্যামেরা অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়, পূর্ববঙ্গে যাওয়ার জন্য যেটা পথ ছিলো তা এখন বিচ্ছিন্ন, তা যেন কোন্ এক মুহূর্তে (ছবির শেষদিকে) অনসূয়ার বুকেও আর্তনাদের সুর তোলে।

মহাকালকে এভাবে ব্যবহার করলে কতকগুলো সুবিধা থেকে যায়, যে-সুবিধাগুলির জন্য শিল্পে mythologyর প্রসঙ্গ উত্থিত হয়। সুবর্ণরেখার ধারে দেখেছি বিস্তৃত পটভূমি জুড়ে পড়ে আছে এরোড্রোম। সেই এরোড্রোমের ভগ্নস্তূপের মধ্যে দিশেহারা হয়ে বিস্ময়মুগ্ধ দুটি বালকবালিকা তাদের বিস্মৃত অতীতকে অন্বেষণ করে ফিরছে। কী নিষ্পাপ প্রাণী দুটি! তারা জানে না, তাদের জীবনে যে-সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে তার ভিত্তিভূমি ঐরকম আরও কতকগুলো ভগ্ন বিমানপোত। চতুর্দিকের ধ্বংস আর ভগ্নস্তূপের মাঝখানে আজ তারা খেলা করছে। তাদের এই অজ্ঞান-সারল্য কী ভয়াবহ!

'সুবর্ণরেখা' ত্রুটিমুক্ত ছবি নয়। এতে যে-কাহিনী নির্বাচন করা হয়েছে তা খুব চড়াসুরের মেলোড্রামা। একটা পর্বের সংগে আর একটা পর্বকে মিলিয়ে মিলিয়ে এই ছবির কাহিনীটি বিস্তার করেছি, a story of fateful coincidences। এভাবে কাহিনীকে গ্রন্থনা করার উপমা আগের অনেক উপন্যাসে পাওয়া যাবে। যেমন রবিঠাকুরের গোরা বা নৌকাডুবি, কি শেষের কবিতা। যেখানে কাহিনীকে বলে যাওয়াই লেখকের একমাত্র বক্তব্য নয়, ঘটনার সঙ্গেসঙ্গে মনোভাবের প্রতিই তাঁর প্রধান দৃষ্টি নিবদ্ধ, সেখানে এরূপ মিল, মাঝেমাঝে যা অসম্ভবও মনে হতে পারে, তাও দৃষ্টিকটু মনে হবে না, তবে সবকিছুর মধ্যে যেন বাস্তবতাটি বজায় থাকে।

'সুবর্ণরেখা' ছবিতে যদি অভিরাম আর সীতা, হরপ্রসাদ আর ঈশ্বরের সমস্যাকে যথাযথ মূর্ত করে থাকতে পারি তবে অভিরামের মায়ের মৃত্যু, পতিতালয়ে ঈশ্বরের সীতাকে আবিষ্কার প্রভৃতি ঘটনাকে খুব অসম্ভব বলে ঠেকবে না।

বিভক্ত জরাজীর্ণ বাংলার যে-রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি দিনের পর দিন, তার ঐ পতিতালয়ে সীতার মতই দশা। আর আমরা অবিভক্তবঙ্গের বাসিন্দেরা যেন উন্মত্ত নিশাযাপনের পর আচ্ছন্নদৃষ্টি বেঁচে আছি।

'সুবর্ণরেখা' নিয়ে এত বক্তৃতামালা, এত আলোচনা হয়েছে যে, এর বেশি আর বলার কিছুই নেই। অথচ আশ্চর্য, 'কোমল গান্ধার', যেটা আমার মতে আমার সবচেয়ে ইন্টেলেকচুয়াল ছবি সেটা দর্শকেরা খুব স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারল না। আমার মনে হয়, আর বিশ-পঁচিশ বছর পরে হয়ত ঐ ছবির কদর ফিরে আসবে। হয়ত বাঙালীর কাছে ঐ সমস্যা এখনও তীব্রমুখী হয়ে তাদের অস্তিত্বকে খুব সংকটাপন্ন করে তোলে নি।

যাই হোক, আমার শিল্পীজীবনের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই অবস্থাতেই বুঝেছি যে, সংগ্রামকে শিল্পীজীবনের নিত্যসঙ্গী করে তুলতে হয়। নানা প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কাজ করে যেতে হবে। সাময়িকভাবে কোন সঙ্কট আচ্ছন্ন করে ফেললেও সামগ্রিকভাবে তা যেন আপোসের পথে টেনে না নিয়ে যায়, অর্থাৎ সঙ্কটের কাছে যেন আমরা বিবেক বুদ্ধি সবকিছু নিয়ে আত্মসমর্পণ না করি।

পরিভাষা

Abeyance স্থগিতকরণ
Abstract সার, বিমূর্ত, বস্তুনিরপেক্ষ
Abstract Budget সংক্ষিপ্ত বাজেট, আয় ব্যয়ক
Accident-prone দুর্ঘটনাপ্রবণ
Accountant General মহাগাণনিক
Adaptation অভিযোজন, সাঙ্গীকরণ, গ্রহণ
Ad hoc committee তদর্থক সমিতি
Adjourned sine die অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত স্থগিত
Adjournment মুলতুবি
Administrative প্রশাসনিক
Ad valorem duty মূল্যানুসারী শুল্ক
Advocate General মহাধিবক্তা
Aesthetics নন্দনতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, কাব্যজিজ্ঞাসা
Agrarian ভৌম, কার্ষ, ভূমিজীবী, কৃষি-বিষয়ক
Agricultural census কৃষি-শুমারি, কৃষি-গণনা
Agricultural Co-operative Credit Society কৃষি-সমবায়-ঋণদান-সমিতি
Agronomy কৃষিবিদ্যা
Amendment সংশোধন
Amusement tax বিনোদন-কর, প্রমোদ কর
Anomalous ব্যত্যয়ী, অনিয়ত
Anti-corruption দুর্নীতি-নিরোধ
Appointing-Authority নিয়োগ-কর্তৃপক্ষ
Arbitration শালিসি, মধ্যস্থতা
Arboriculturist বৃক্ষপালনবিদ্
Archives লেখ্যাগার, মহাফেজখানা
Art Council চারুকলা পরিষদ্
Article অনুচ্ছেদ

Atomic Energy Commission পারমাণবিক শক্তি আয়োগ
Atticism এথেনীয় শিল্পরীতি, মার্জিত শৈলী
Audio-visual aid শ্রাব্য-দৃশ্য অবলম্বন
Auditor-General মহানিরীক্ষক
Autonomous স্বশাসিত
Back door policy দুর্নীতি, পশ্চাদ্দ্বার নীতি
Basic democracy বুনিয়াদি গণতন্ত্র
Basic pay মূল বেতন
Belles lettre রম্যরচনা
Benefit of doubt সন্দেহাবকাশ
Bidding নিলামডাক
Block Development Officer ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক
Blood-transfusion রক্ত পরিসঞ্চালন
Board of trustees অছিপর্ষৎ
Bourgeois পরশ্রমজীবী, পরশ্রমভোগী
Brackish water নোনা জল
Broadcasting সম্প্রচারণ
Cacology অশুদ্ধ শব্দপ্রয়োগ, ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ
Calligraphist হস্তলিপিবিশারদ
Capital expenditure মুখ্য ব্যয়
Catharsis বিশোধন, মোক্ষণ, উপশম
Chauvinism জাত্যভিমান, উগ্র-স্বাদেশিকতা
Cast জাত
Casual আকস্মিক, নৈমিত্তিক
Censor Board বিবাচন পর্ষৎ
Charge sheet অভিযোগপত্র
Chief Election Commissioner নির্বাচন মহাধ্যক্ষ
Chief Engineer মুখ্য বাস্তুকার, মুখ্য যন্ত্রবিদ
Chief Secretary মুখ্য সচিব
Chief Whip মুখ্য সচেতক
Chorus সম্মেলক সঙ্গীত
Civil disobedience আইন অমান্য
Cliche ছাঁচে ঢালা শব্দ, বাহুল্য বাগ্‌রীতি, জরাজীর্ণ শব্দ

Coalition Government যৌথ সরকার, মিলিজুলি সরকার
Columnist স্তম্ভকার, সংবাদভাষ্যকার, কলমচি
Comptroller হিসাব-নিয়ামক
Confidential Assistant আপ্ত-সহায়ক
Connoisseur রসিক, সমঝদার, রসজ্ঞ
Connotation গূঢ়ার্থ, অন্তর্নিহিত অর্থ
Conservancy staff ময়লা-নিষ্কাশন কর্মিবৃন্দ
Contingent allowance উপনিমিত্ত ভাতা
Cut motion ছাঁটাই প্রস্তাব
Defamation মানহানি
Dehydration জলবিয়োজন
Demography জনতত্ত্ব
Demurrage বিলম্ব শুল্ক, বিলম্বজনিত খেসারত
Detenu রাজবন্দি
Director অধিকর্তা
Disbursing Officer ব্যয়ন আধিকারিক
Duet দ্বৈত-সঙ্গীত
Efficiency bar সামর্থ্যবাধ, যোগ্যতাগত বাধা
Elevator উত্তোলক
Embezzlement তহবিল তছরুপ
Essential Service অত্যাবশ্যক কৃত্যক
Fisheries Service মীনপোষ কৃত্যক
Forest Entomology বনকীটবিজ্ঞান
Free-lance Journalist বিলগ্ন-সাংবাদিক
Grant অনুদান, মঞ্জুরি
Grotesque অদ্ভুত, হাস্যোদ্দীপক
Habeas Corpus বন্দিপ্রদর্শন
Horticulture উদ্যানপালন
Human Rights মানবাধিকার
Hypothecated দায়বদ্ধ
Immigration অভিবাসন
Impasse অচলাবস্থা
Impulse প্রেরণা, আবেগ

Inevitable অবর্জনীয়, অনিবার্য
Industrial Tribunal শিল্পন্যায়পীঠ
Infrastructure পরিকাঠামো
Injunction আসেধাজ্ঞা, নিবারাজ্ঞা
Inscription plate উৎকীর্ণ ফলক
Interdepartmental আন্তর্বিভাগীয়
Interlingua আন্তর্জাতিক ভাষা
Jargon পেশাগত ভাষা, বৃত্তিগত ভাষা
Jurisdiction অধিকার ক্ষেত্র, একতিয়ার
Justice of the Peace ন্যায়পাল
Juvenile delinquency শিশু-অপরাধ
Know-how কৌশল, কৃৎকৌশল
Laissez faire অবাধ-নীতি, অবাধ বাণিজ্য
Letter of Guarantee প্রত্যাভূতিপত্র
Lexicon অভিধান
Lingua-franca মিশ্রভাষা
Linguistics ভাষাবিদ্যা
Malafide অসদ্‌বুদ্ধিকৃত
Maternity Leave প্রসূতি ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি
Memorandum স্মারকলিপি
Modus Operandi ক্রিয়াপদ্ধতি
Modus Vivendi সাময়িক চুক্তি
Monogram অভিজ্ঞান
Mysticism অতীন্দ্রিয়তা, অতীন্দ্রিয়বাদ
Mythology পুরাবৃত্ত
Narcissism আত্মরতি
Nation রাষ্ট্র, জাতি
Nihilism অবিশ্বাসবাদ
Nomads যাযাবর
Note of Dissent ভিন্ন মন্তব্য
Note Sheet মন্তব্যপত্র
Notification প্রজ্ঞাপন
Obscene language অশ্লীল ভাষা

Occidental পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্য জগতের লোক
On a point of order বৈধতার প্রশ্নে
Ordinance অধ্যাদেশ
Osteology অস্থিবিজ্ঞান
Pagan বহুদেববাদী
Page make-up পৃষ্ঠাসজ্জা
Pantomime মূকাভিনয়
Paper under disposal বিবেচ্যপত্র
Paraphernalia আনুষঙ্গিকী
Pastoral poetry রাখালী কবিতা, গোষ্ঠগীতি
Pedigree বংশবিবরণী, কুলুজী
Pensioner উত্তরবেতনভোগী, বৃত্তিভোগী
Pilot project অগ্রণী প্রকল্প
Plebiscite গণভোট
Posthumous মরণোত্তর
Power of Atorney মোক্তারনামা
Prima facie দৃশ্যত
Proletariat পরার্থশ্রমী, সর্বহারা, শ্রমজীবী
Prologue প্রস্তাবনা
Proper channel যথাযথ প্রণালী
Provident fund ভবিষ্যনিধি
Proscenium রঙ্গমঞ্চের সম্মুখভাগ
Pseudonym ছদ্মনাম
Public Relations Officer জনসংযোগ আধিকারিক
Public Welfare জনকল্যাণ
Quack হাতুড়ে
Race জাতি, প্রবংশ, জাতিকুল
Rationalisation যুক্তিসংগত পুনর্গঠন
Realisation of Arrear Dues বকেয়া প্রাপ্য আদায়
Receptionist আপ্যায়ক/আপ্যায়িকা
Recommended and Forwarded সুপারিশ করে প্রেরিত হল
Recruiting Officer প্রবেশন আধিকারিক
Recurring Expenditure আবর্তক ব্যয়

Redundant অপ্রয়োজনীয়, অপিরিমিত, বাড়তি
Referendum গণভোট
Regionalism আঞ্চলিকতাবাদ
Relativism অপেক্ষবাদ
Remote control দূর-নিয়ন্ত্রণ
Requisitioned meeting তলবি সভা
Reserved Forest সংরক্ষিত বন
Reservoir জলাধার
Resurgence পুনরুত্থান;, পুনরুদয়, পুনরভ্যুদয়
Retrospective effect অতীত থেকে কার্যকর করা
Returning Officer নির্বাচন আধিকারিক
Revisionism শোধনবাদ, সংশোধনবাদ
Sabotage অন্তর্ঘাত
Saga বীরকাহিনী, বীরগাথা
Sanatorium স্বাস্থ্যনিবাস
Satellite town উপ-নগর
Schedule of expenditure খরচের তালিকা
Search-warrant তল্লাশি পরোয়ানা
Seasonal unemployment মরশুমি বেকারত্ব
Secularism লোকায়তিক, ধর্মনিরপেক্ষতা
Seismograph ভূকম্পলেখ
Select Committee প্রবর সমিতি
Service-book কৃত্যক-বই
Shibboleth বাগ্‌বৈশিষ্ট্য
Shipping Corporation পোতনিগম
Soil erosion Control ভূ-ক্ষয়-নিয়ন্ত্রণ
Solicitor General মহাব্যবহারদেশক
Solo একক সঙ্গীত
Sovereignty সার্বভৌমিকতা, সার্বভৌমত্ব
Sponsor পোষক
Stamp Duty মুদ্রাঙ্ক-শুল্ক
State of emergency জরুরি অবস্থা
Stream of consciousness চেতনাপ্রবাহ

Strong Room দুর্ভেদ প্রকোষ্ঠ
Subject to approval অনুমোদন সাপেক্ষ
Sublimity মহত্ত্ব
Succession Certificate উত্তরাধিকার পত্র
Sundry expenses বিবিধ ব্যয়, রকমারি খরচ
Suo motu স্বত
Surrealism অতিবাস্তবতা, পরাবাস্তবতা
Suspense accounts তোলা হিসাব
Symbolist প্রতীকবাদী
Symphony একতান, ধ্বনিসাম্য
Synonym সমার্থ শব্দ, প্রতিশব্দ
Synopsis সংক্ষিপ্তসার, চুম্বক
Syntax বাক্যপ্রকরণ, পদবিন্যাস
Synthesis সংশ্লেষ, সমন্বয়
Technique গঠন-কৌশল, আঙ্গিক
Terminology পরিভাষা, পারিভাষিক শব্দ
Terms of Reference বিচার্য বিষয়
Testimonial শংসাপত্র
Test-tube Baby নলজাত শিশু
Theism আস্তিকতা, আস্তিকতাবাদ
Theory of Evolution অভিব্যক্তিবাদ
Theory of Relativity আপেক্ষিকতাবাদ
Through proper channel যথাযথ প্রণালী-মাধ্যমে
Title page নাম-পত্র
Toll Collector পারানি-সংগ্রাহক
To whom it may concern সংশ্লিষ্টের প্রতি
Trading Corporation বাণিজ্য-নিগম
Tradition ঐতিহ্য
Transparency স্বচ্ছতা
Treasury Officer কোষাগার আধিকারিক
Trustee অছি, ন্যায়রক্ষক
Ultimatum চরম পত্র, চরম প্রস্তাব, চরম দাবি
Under consideration বিবেচ্য, বিবেচনাধীন

Under-garment অন্তরীয়, অন্তর্বাস
Urban Development Project - নগর উন্নয়ন প্রকল্প
Utilitarianism উপযোগবাদ, হিতবাদ
Valency যোজ্যতা
Velocity বেগ
Vanguard অগ্রদূত
Verbiage বাগাড়ম্বর, শব্দবাহুল্য
Veterinary পশুচিকিৎসা
Viscera আন্তরশারীর যন্ত্র
Vocational বৃত্তীয়
Warehouse পণ্যাগার, গুদাম
Warmonger যুদ্ধবাজ
Waste land reclamation পতিত জমি উদ্ধার
Water proof জলরোধক
Weather-chart আবহচিত্র
Welfare centre কল্যাণ-কেন্দ্র
Wilful neglect of duty ইচ্ছাকৃত কর্ম-অবহেলা
Within one's hearing শ্রুতিগোচর হয় এমনভাবে
Without prejudice অপক্ষপাত, অনিষ্টবর্জিত
Working Capital চালু মূলধন
Working journalist বার্তাজীবী
Xenophobia বিদেশী-বিদ্বেষ, বিদেশী-বিরোধিতা
Youth Welfare Officer যুব-কল্যাণ আধিকারিক
Zionist ইহুদিবাদী
Zonal Office আঞ্চলিক কার্যালয়

নৈবেদ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরান
দুঃখেরি সাথে দুঃখেরি ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মোর মাথার মানিক
সাথে যদি দাও ভকতি।

যত দিতে চাও কাজ দিয়ো, যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে—
অন্তর যদি জড়াতে না দাও
জাল-জঞ্জালগুলিতে।
বাঁধিয়ো আমায় যত খুশি ডোরে,
মুক্ত রাখিয়ো তোমা-পানে মোরে,
ধুলায় রাখিয়ো পবিত্র ক'রে
তোমার চরণধূলিতে।
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসারতলে,
তোমারে দিয়ো না ভুলিতে।

যে পথে ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরিব,
যাই যেন তব চরণে।
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে
সকল-শ্রান্তি-হরণে।

দুর্গমপথ এ ভবগহন,
কত ত্যাগ শোক বিরহ-দহন,
জীবনে মরণ করিয়া বহন
প্রাণ পাই যেন মরণে।
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায়
নিখিলশরণ চরণে।

২

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।

অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

৩

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহো
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।

করো মোরে সম্মানিত নব বীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন

৪

অন্ধকার গর্তে থাকে অন্ধ সরীসৃপ;
আপনার ললাটের রতন-প্রদীপ
নাহি জানে, নাহি জানে সূর্যালোকলেশ।
তেমনি আঁধারে আছে এই অন্ধ দেশ
হে দণ্ডবিধাতা রাজা—যে দীপ্তরতন
পরায়ে দিয়েছ ভালে তাহার যতন
নাহি জানে, নাহি জানে তোমার আলোক।

নিত্য বহে আপনার অস্তিত্বের শোক,
জনমের গ্লানি। তব আদর্শ মহান
আপনার পরিমাপে করি খান খান
রেখেছে ধূলিতে। প্রভু, হেরিতে তোমায়
তুলিতে হয় না মাথা ঊর্ধ্ব-পানে হায়।

যে এক তরণী লক্ষ লোকের নির্ভর
খণ্ড খণ্ড করি তারে তরিবে সাগর?

৫

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি, প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

৬

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতি-মাঝে দারুণ আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কাল-ঝঞ্ঝা-ঝংকারিত দুর্যোগ-আঁধারে।
একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।

স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ-ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে— বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পুরিতে চায়। বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ
তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।

৭

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার, হে রাজাধিরাজ।
সে গুরু সম্মান তব সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে, তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে।

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গ-সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে, আর, অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

৮

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

৯

শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।
দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তার
শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার।
যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে।

৯

বস্তুভারহীন মন সর্ব জলে স্থলে
পরিব্যাপ্ত করি দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্বভূতে অবারিত ধ্যান
পশিত আত্মীয়রূপে। আজি তাহা নাশি
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।

১০

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ, শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।

ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

পোস্টমাস্টার

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্ট-আপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যে-রকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো-কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্তদিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়—কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোলকরতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত— যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার

ডাকিতেন 'রতন'। রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না— বলিত, 'কী গা বাবু কেন ডাকছ।'

পোস্টমাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনি চুলো ধরাতে যেতে হবে — হেঁশেলের —

পোস্টমাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন—একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্টমাস্টার ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে?' সে অনেক কথা; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারি মধ্যে দৈবাৎ দুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত তাহার একটি ছোটো ভাই ছিল— বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল— অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশি উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে-মাঝে বেশি রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসি ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত— তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-এক দিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন— ছোটোভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিত ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা, দিদি, দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন-কি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালের মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে, এবং কোথাকার এক

নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বার বার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না— সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময়ে কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত— হৃদয়ের সহিত একান্তসংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ঐ কথাই বার বার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ঐরূপ । কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন 'রতন'। রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল— হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'দাদাবাবু, ডাকছ?' পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।' বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণমাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ— নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্টমাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন— বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল 'রতন'। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'দাদাবাবু ঘুমোচ্ছিলে?' পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, 'শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না— দেখ্‌ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।'

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারীরূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন, এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে। এবং এস্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল,

বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি।'

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন— মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে-মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্টমাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান-প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরানো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্‌বেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে?'

পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'রতন, কালই আমি যাচ্ছি।'

রতন। কোথায় যাচ্ছ দাদাবাবু।

পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে।

পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর-কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্যদিনের মতো তেমন চটপট হইল না। বোধ করি মধ্যে-মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?'

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, 'সে কী করে হবে।' ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল, 'সে কী করে হবে'।

ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে; কলিকাতার অভ্যাস অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি যাত্রা করিবেন সে কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশপ্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, 'রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।' এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।'

পোস্টমাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনো দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

নূতন পোস্টমাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্টমাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, 'রতন, তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিনকয়েক চলবে।'

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না'—বলিয়া একদৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া, মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'— কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে— এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট-আপিস গৃহের চারি দিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে— সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়। ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

দালিয়া

ভূমিকা

পরাজিত শা সুজা ঔরঙ্গজীবের ভয়ে পলায়ন করিয়া আরাকান-রাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সঙ্গে তিন সুন্দরী কন্যা ছিল। অরাকান-রাজের ইচ্ছা হয়, রাজপুত্রদের সহিত তাহাদের বিবাহ দেন। সেই প্রস্তাবে শা সুজা নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করাতে, একদিন রাজার আদেশে তাঁহাকে ছলক্রমে নৌকাযোগে নদীমধ্যে লইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। সেই বিপদের সময় কনিষ্ঠা বালিকা আমিনাকে পিতা স্বয়ং নদীমধ্যে নিক্ষেপ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা করিয়া মরে। এবং সুজার একটি বিশ্বাসী কর্মচারী রহমত আলি জুলিখাকে লইয়া সাঁতার দিয়া পালায়, এবং সুজা যুদ্ধ করিতে করিতে মরেন।

আমিনা খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া দৈবক্রমে অনতিবিলম্বে এক ধীবরের জালে উদ্‌ধৃত হয় এবং তাহারই গৃহে পালিত হইয়া বড়ো হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইয়াছে এবং যুবরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদিন সকালে বৃদ্ধ ধীবর আসিয়া আমিনাকে ভর্ৎসনা করয়িা কহিল, 'তিন্নি।' ধীবর আরাকান ভাষায় আমিনার নতুন নামকরণ করিয়াছিল। 'তিন্নি, আজ সকালে তোর হইল কী। কাজকর্মে যে একেবারে হাত লাগাস নাই। আমার নতুন জালে আঠা দেওয়া হয় নাই, আমার নৌকো—'

আমিনা ধীবরের কাছে আসিয়া আদর করিয়া কহিল, 'বুঢ়া, আজ আমার দিদি আসিয়াছেন, তাই আজ ছুটি।'

'তোর আবার দিদি কে রে তিন্নি।'

জুলিখা কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, 'আমি।'

বৃদ্ধ অবাক হইয়া গেল। তার পর জুলিখার অনেক কাছে আসিয়া ভালো করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল।

খপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই কাজ-কাম কিছু জানিস?'

আমিনা কহিল, 'বুঢ়া, দিদির হইয়া আমি কাজ করিয়া দিব। দিদি কাজ করিতে পারিবে না।'

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই থাকিবি কোথায়।'

জুলিখা বলিল, 'আমিনার কাছে।'

বৃদ্ধ ভাবিল, এও তো বিষম বিপদ। জিজ্ঞাসা করিল, 'খাইবি কী।'

জুলিখা বলিল, 'তাহার উপায় আছে'— বলিয়া অবজ্ঞাভরে ধীবরের সম্মুখে একটা স্বর্ণমুদ্রা ফেলিয়া দিল।

আমিনা সেটা কুড়াইয়া হাতে তুলিয়া দিয়া চুপিচুপি কহিল, 'বুঢ়া, আর কোনো কথা কহিস না। তুই কাজে যা, বেলা হইয়াছে।'

জুলিখা ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমিনার সন্ধান পাইয়া কী করিয়া ধীবরের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে-সমস্ত কথা বলিতে গেলে দ্বিতীয় আর-একটি কাহিনী হইয়া পড়ে। তাহার রক্ষাকর্তা রহমত শেখ ছদ্মনামে আরাকান-রাজসভায় কাজ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছোটো নদীটি বহিয়া যাইতেছিল এবং প্রথম গ্রীষ্মের শীতল প্রভাতবায়ুতে কৈলু গাছে রক্তবর্ণ পুষ্পমঞ্জরী হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

গাছের তলায় বসিয়া জুলিখা আমিনাকে কহিল, 'ঈশ্বর যে আমাদের দুই ভগ্নীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন সে কেবল পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য। নহিলে আর তো কোনো কারণ খুঁজিয়া পাই না।'

আমিনা নদীর পরপারে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী, সর্বাপেক্ষা ছায়াময়, বনশ্রেণীর দিকে দৃষ্টি মেলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, 'দিদি, আর ও-সব কথা বলিস নে ভাই। আমার এই পৃথিবীটা এক রকম বেশ লাগিতেছে। মরিতে চায় তো পুরুষগুলো কাটাকাটি করিয়া মরুক গে, আমার এখানে কোনো দুঃখ নাই।'

জুলিখা বলিল, 'ছি ছি আমিনা, তুই কি শাহজাদার ঘরের মেয়ে। কোথায় দিল্লির সিংহাসন আর কোথায় আরাকানের ধীবরের কুটীর।'

আমিনা হাসিয়া কহিল, 'দিদি, দিল্লির সিংহাসনের চেয়ে আমার বুঢ়ার এই কুটীর এবং কৈলু গাছের ছায়া যদি কোনো বালিকার বেশি ভালো লাগে তাহাতে দিল্লির সিংহাসন এক বিন্দু অশ্রুপাত করিবে না।'

জুলিখা কতকটা আনমনে কতকটা আমিনাকে কহিল, 'তা, তোকে দোষ দেওয়া যায় না, তুই তখন নিতান্ত ছোটো ছিলি। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, পিতা তোকে সব চেয়ে বেশি ভালবাসিতেন বলিয়া তোকেই স্বহস্তে জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই পিতৃদত্ত মৃত্যুর চেয়ে এই জীবনকে বেশি প্রিয় জ্ঞান করিস না। তবে যদি প্রতিশোধ তুলিতে পারিস তবেই জীবনের অর্থ থাকে।

আমিনা চুপ করিয়া দূরে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বেশ বুঝা গেল, সকল কথা সত্ত্বেও বাহিরের এই বাতাস এবং গাছের ছায়া এবং আপনার নবযৌবন এবং কী-একটা সুখস্মৃতি তাহাকে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'দিদি, তুমি একটু অপেক্ষা করো ভাই। আমার ঘরের কাজ বাকি আছে। আমি না রাঁধিয়া দিলে বুঢ়া খাইতে পাইবে না।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুলিখা আমিনার অবস্থা চিন্তা করিয়া ভারি বিমর্ষ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ ধুপ করিয়া একটা লম্ফের শব্দ হইল এবং পশ্চাৎ হইতে কে একজন জুলিখার চোখ টিপিয়া ধরিল।

জুলিখা ত্রস্ত হইয়া কহিল, 'কে ও।'

স্বর শুনিয়া যুবক চোখ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; জুলিখার মুখের দিকে চাহিয়া অম্লানবদনে কহিল, 'তুমি তো তিন্নি নও'। যেন জুলিখা বরাবর আপনাকে 'তিন্নি' বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল কেবল যুবকের অসামান্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির কাছে সমস্ত চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

জুলিখা বসন সংবরণ করিয়া দৃপ্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কে তুমি।'

যুবক কহিল, 'তুমি আমাকে চেন না। তিন্নি জানে। তিন্নি কোথায়।'

তিন্নি গোলযোগ শুনিয়া বাহির হইয়া আসিল। জুলিখার রোষ এবং যুবকের হতবুদ্ধি বিস্মিতমুখ দেখিয়া আমিনা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কহিল, 'দিদি, ওর কথা তুমি কিছু মনে করিয়ো না। ও কি মানুষ, ও একটা বনের মৃগ। যদি কিছু বেয়াদপি করিয়া থাকে আমি উহাকে শাসন করিয়া দিব।— দালিয়া, তুমি কী করিয়াছিলে।'

যুবক তৎক্ষণাৎ কহিল, 'চোখ টিপিয়া ধরিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম তিন্নি। কিন্তু ও তো তিন্নি নয়।'

তিন্নি সহসা দুঃসহ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া উঠিয়া কহিল, 'ফের! ছোটো মুখে বড়ো কথা! কবে তুমি তিন্নির চোখ টিপিয়াছ। তোমার তো সাহস কম নয়।'

যুবক কহিল, 'চোখ টিপিতে তো খুব বেশি সাহসের দরকার করে না; বিশেষত পূর্বের অভ্যাস থাকিলে। কিন্তু সত্য বলিতেছি তিন্নি, আজ একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম।'

বলিয়া গোপনে জুলিখার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমিনার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

আমিনা কহিল, 'না, তুমি অতি বর্বর, শাহজাদীর সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য নও। তোমাকে সহবত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। দেখো, এমনি করিয়া সেলাম করো।'

বলিয়া আমিনা তাহার যৌবনমঞ্জরিত তনুলতা অতি মধুর ভঙ্গিতে নত করিয়া জুলিখাকে সেলাম করিল। যুবক বহুকষ্টে তাহার নিতান্ত অসম্পূর্ণ অনুকরণ করিল।

বলিল, 'এমনি করিয়া তিন পা পিছু হঠিয়া আইস।' যুবক পিছু হঠিয়া আসিল।

'আবার সেলাম করো।' আবার সেলাম করিল।

এমনি করিয়া পিছু হঠাইয়া, সেলাম করাইয়া, আমিনা যুবককে কুটীরের দ্বারের কাছে লইয়া গেল।

কহিল, 'ঘরে প্রবেশ করো।' যুবক ঘরে প্রবেশ করিল।

আমিনা বাহির হইতে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল, 'একটু ঘরের কাজ করো। আগুনটা জাগাইয়া রাখো।' বলিয়া দিদির পাশে আসিয়া বসিল।

কহিল, 'দিদি, রাগ করিস নে ভাই, এখানকার মানুষগুলো এই রকমের। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেছে।'

কিন্তু আমিনার মুখে কিংবা ব্যবহারে তাহার লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় না। বরং অনেক বিষয়ে এখানকার মানুষের প্রতি তাহার কিছু অন্যায় পক্ষপাত দেখা যায়।

জুলিখা যথাসাধ্য রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, 'বাস্তবিক আমিনা, তোর ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হইয়া গেছি। একজন বাহিরের যুবক আসিয়া তোকে স্পর্শ করিতে পারে এত বড়ো তাহার সাহস।'

আমিনা দিদির সহিত যোগ দিয়া কহিল, 'দেখ্ দেখি বোন। যদি কোনো বাদশাহ কিংবা নবাবের ছেলে এমন ব্যবহার করিত, তবে তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিতাম।'

জুলিখার ভিতরের হাসি আর বাধা মানিল না; হাসিয়া উঠিয়া কহিল, 'সত্য করিয়া বল্ দেখি আমিনা, তুই যে বলিতেছিলি পৃথিবীটা তোর বড়ো ভালো লাগিতেছে, সে কি ঐ বর্বর যুবকটার জন্য।'

আমিনা কহিল, 'তা, সত্য কথা বলি দিদি, ও আমার অনেক উপকার করে। ফুলটা ফলটা পাড়িয়া দেয়, শিকার করিয়া আনে, একটা-কিছু কাজ করিতে ডাকিলে ছুটিয়া আসে। অনেকবার মনে করি উহাকে শাসন করিব। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। যদি খুব চোখ রাঙাইয়া বলি, দালিয়া, তোমার প্রতি আমি ভারি অসন্তুষ্ট হইয়াছি— দালিয়া মুখের দিকে চাহিয়া পরম কৌতুকে নিঃশব্দে হাসিতে থাকে। এদের দেশে পরিহাস বোধ করি এই রকম; দু-ঘা মারিলে ভারি খুশি হইয়া উঠে, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ঐ দেখো-না, ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছি— বড়ো আনন্দে আছে, দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব মুখ চক্ষু লাল করিয়া মনের সুখে আগুনে ফুঁ দিতেছে। ইহাকে লইয়া কী করি বল্ তো বোন। আমি তো আর পারিয়া উঠি না।'

জুলিখা কহিল, 'আমি চেষ্টা দেখিতে পারি।'

আমিনা হাসিয়া মিনতি করিয়া বলিল, 'তোর দুটি পায়ে পড়ি বোন। ওকে আর তুই কিছু বলিস না।'

এমন করিয়া বলিল, যেন ঐ যুবকটি আমিনার একটি বড়ো সাধের পোষা হরিণ, এখনো তাহার বন্য স্বভাব দূর হয় নাই— পাছে অন্য কোনো মানুষ দেখিলে ভয় পাইয়া নিরুদ্দেশ হয় এমন আশঙ্কা আছে।

এমন সময় ধীবর আসিয়া কহিল, 'আজ দালিয়া আসে নাই তিন্নি?'

'আসিয়াছে।'

'কোথায় গেল।'

'সে বড়ো উপদ্রব করিতেছিল, তাই তাহাকে ঐ ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছি।'

বৃদ্ধ কিছু চিন্তান্বিত হইয়া কহিল, 'যদি বিরক্ত করে সহিয়া থাকিস। অল্প বয়সে অমন সকলেই দুরন্ত হইয়া থাকে। বেশি শাসন করিস না। দালিয়া কাল এক থলু[১] দিয়া আমার কাছে তিনটি মাছ লইয়াছিল।'

আমিনা কহিল, 'ভাবনা নাই বুঢ়া, আজ আমি তাহার কাছে দুই থলু[১] আদায় করিয়া দিব, একটিও মাছ দিতে হইবে না।'

---

[১] থলু অর্থে স্বর্ণমুদ্রা।

বৃদ্ধ তাহার পালিত কন্যার এত অল্প বয়সে এমন চাতুরী এবং বিষয়বুদ্ধি দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া তাহার মাথায় সস্নেহ হাত বুলাইয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশ্চর্য এই, দালিয়ার আসা-যাওয়া সম্বন্ধে জুলিখার ক্রমে আর আপত্তি রহিল না। ভাবিয়া দেখিলে, ইহাতে আশ্চর্য নাই। কারণ, নদীর যেমন এক দিকে স্রোত এবং আর-এক দিকে কূল, রমণীর সেইরূপ হৃদয়াবেগ এবং লোকলজ্জা। কিন্তু, সভ্যসমাজের বাহিরে আরাকানের প্রান্তে এখানে লোক কোথায়।

এখানে কেবল ঋতুপর্যায়ে তরু মুঞ্জরিত হইতেছে; এবং সম্মুখে নীলা নদী বর্ষায় স্ফীত, শরতে স্বচ্ছ এবং গ্রীষ্মে ক্ষীণ হইতেছে; পাখির উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে সমালোচনার লেখামাত্র নাই; এবং দক্ষিণবায়ু মাঝে মাঝে পরপারের গ্রাম হইতে মানবচক্রের গুঞ্জনধ্বনি বহিয়া আনে, কিন্তু কানাকানি আনে না।

পতিত অট্টালিকার উপরে ক্রমে যেমন অরণ্য জন্মে এখানে কিছু দিন থাকিলে সেইরূপ প্রকৃতির গোপন আক্রমণে লৌকিকতার মানবনির্মিত দৃঢ় ভিত্তি ক্রমে অলক্ষিতভাবে ভাঙিয়া যায় এবং চতুর্দিকে প্রাকৃতিক জগতের সহিত সমস্ত একাকার হইয়া আসে। দুটি সমযোগ্য নরনারীর মিলনদৃশ্য দেখিতে রমণীর যেমন সুন্দর লাগে এমন আর-কিছু নয়। এত রহস্য, এত সুখ, এত অতলস্পর্শ কৌতূহলের বিষয় তাহার পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না। অতএব এই বর্বরকুটীরের মধ্যে নির্জন দারিদ্র্যের ছায়ায় যখন জুলিখার কুলগর্ব এবং লোকমর্যাদার ভাব আপনিই শিথিল হইয়া আসিল তখন পুষ্পিত কৈলুতরুচ্ছায়ে আমিনা এবং দালিয়ার মিলনের এই এক মনোহর খেলা দেখিতে তাহার বড়ো আনন্দ হইত।

বোধ করি তাহারও তরুণ হৃদয়ের একটা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত এবং তাহাকে সুখে দুঃখে চঞ্চল করিয়া তুলিত। অবশেষে এমন হইল, কোনোদিন যুবকের আসিতে বিলম্ব হইলে আমিনা যেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত জুলিখাও তেমনি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিত এবং উভয়ে একত্র হইলে, চিত্রকর নিজের সদ্যসমাপ্ত ছবি ঈষৎ দূর হইতে যেমন করিয়া দেখে তেমনি করিয়া সস্নেহে সহাস্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত। কোনো কোনো দিন মৌখিক ঝগড়াও করিত, ছল করিয়া ভর্ৎসনা করিত, আমিনাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া যুবকের মিলনাবেগ প্রতিহত করিত।

সম্রাট এবং অরণ্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়ে স্বাধীন, উভয়েই স্বরাজ্যের একাধিপতি, উভয়কেই কাহারও নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না। উভয়ের মধ্যেই প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক বৃহত্ত্ব এবং সরলতা আছে। যাহারা মাঝারি, যাহারা দিনরাত্রি লোকশাস্ত্রের

অক্ষর মিলাইয়া জীবন যাপন করে, তাহারাই কিছু স্বতন্ত্র গোছের হয়। তাহারাই বড়োর কাছে দাস, ছোটোর কাছে প্রভু এবং অস্থানে নিতান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়ায়। বর্বর দালিয়া প্রকৃতি-সম্রাজ্ঞীর উচ্ছৃঙ্খল ছেলে, শাহজাদীর কাছে কোনো সংকোচ ছিল না, এবং শাহজাদীরাও তাহাকে সমকক্ষ লোক বলিয়া চিনিতে পারিত। সহাস্য, সরল, কৌতুকপ্রিয়, সকল অবস্থাতেই নির্ভীক, অসংকুচিত তাহার চরিত্রে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণই ছিল না।

কিন্তু এই-সকল খেলার মধ্যে এক-একবার জুলিখার হৃদয়টা হায়-হায় করিয়া উঠিত; ভাবিত সম্রাটপুত্রীর জীবনের এই কি পরিণাম!

একদিন প্রাতে দালিয়া আসিবামাত্র জুলিখা তাহার হাত চাপিয়া কহিল, 'দালিয়া, এখানকার রাজাকে দেখাইয়া দিতে পার?'

'পারি। কেন বলো দেখি।'

'আমার একটা ছোরা আছে, তাহার বুকের মধ্যে বসাইতে চাহি।'

প্রথমে দালিয়া কিছু আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার পরে জুলিখার হিংসাপ্রখর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল; যেন এতবড়ো মজার কথা সে ইতিপূর্বে কখনো শোনে নাই।— যদি পরিহাস বল তো এই বটে, রাজপুত্রীর উপযুক্ত। কোনো কথা নাই, বার্তা নাই, প্রথম আলাপেই একখানি ছোরার আধখানা একটা জীবন্ত রাজার বক্ষের মধ্যে চালনা করিয়া দিলে,-এইরূপ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ব্যবহারে রাজাটা হঠাৎ কিরূপ অবাক হইয়া যায়, সেই চিত্র ক্রমাগত তাহার মনে উদিত হইয়া তাহার নিঃশব্দ কৌতুকহাসি থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাস্যে পরিণত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিনই রহমত শেখ জুলিখাকে গোপনে পত্র লিখিল যে, 'আরাকানের নূতন রাজা ধীবরের কুটীরে দুই ভগ্নীর সন্ধান পাইয়াছেন এবং গোপনে আমিনাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন— তাহাকে বিবাহার্থে অবিলম্বে প্রাসাদে আনিবার আয়োজন করিতেছেন। প্রতিহিংসার এমন সুন্দর অবসর আর পাওয়া যাইবে না।'

তখন জুলিখা দৃঢ়ভাবে আমিনার হাত ধরিয়া কহিল, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আমিনা, এইবার তোর জীবনের কর্তব্য পালন করিবার সময় আসিয়াছে— এখন আর খেলা ভালো দেখায় না।'

দালিয়া উপস্থিত ছিল, আমিনা তাহার মুখের দিকে চাহিল; দেখিল সে সকৌতুকে হাসিতেছে।

আমিনা তাহার হাসি দেখিয়া মর্মাহত হইয়া কহিল, 'জান দালিয়া, আমি রাজবধূ হইতে যাইতেছি।'

দালিয়া হাসিয়া বলিল, 'সে তো বেশিক্ষণের জন্য নয়।'

আমিনা পীড়িত বিস্মিত চিত্তে মনে মনে ভাবিল, 'বাস্তবিকই এ বনের মৃগ, এর সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা আমারই পাগলামি।'

আমিনা দালিয়াকে আর একটু সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য কহিল, 'রাজাকে মারিয়া আর কি আমি ফিরিব।'

দালিয়া কথাটা সংগত জ্ঞান করিয়া কহিল, 'ফেরা কঠিন বটে।'

আমিনার সমস্ত অন্তরাত্মা একেবারে ম্লান হইয়া গেল।

জুলিখার দিকে ফিরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'দিদি, আমি প্রস্তুত আছি।'

এবং দালিয়ার দিকে ফিরিয়া বিদ্ধ অন্তরে পরিহাসের ভান করিয়া কহিল, 'রানী হইয়াই আমি প্রথমে তোমাকে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়া অপরাধে শাস্তি দিব। তার পরে আর যাহা করিতে হয় করিব।'

শুনিয়া দালিয়া বিশেষ কৌতুক বোধ করিল, যেন প্রস্তাবটা কার্যে পরিণত হইলে তাহার মধ্যে অনেকটা আমোদের বিষয় আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অশ্বারোহী, পদাতিক, নিশান, হস্তী, বাদ্য এবং আলোকে ধীবরের ঘর-দুয়ার ভাঙিয়া পড়িবার জো হইল। রাজপ্রাসাদ হইতে স্বর্ণমণ্ডিত দুই শিবিকা আসিয়াছে।

আমিনা জুলিখার হাত হইতে ছুরিখানি লইল। তাহার হস্তিদন্তনির্মিত কারুকার্য অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। তাহার পর বসন উদ্‌ঘাটন করিয়া নিজে বক্ষের উপর একবার ধার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। জীবনমুকুলের বৃন্তের কাছে ছুরিটি একবার স্পর্শ করিল, আবার সেটি খাপের মধ্যে পুরিয়া বসনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

একান্ত ইচ্ছা ছিল, এই মরণযাত্রার পূর্বে একবার দালিয়ার সহিত দেখা হয়, কিন্তু কাল হইতে সে নিরুদ্দেশ। দালিয়া সেই-যে হাসিতেছিল তাহার ভিতর কি অভিমানের জ্বালা প্রচ্ছন্ন ছিল।

শিবিকায় উঠিবার পূর্বে আমিনা তাহার বাল্যকালের আশ্রয়টি অশ্রুজলের ভিতর হইতে একবার দেখিল— তাহার সেই ঘরের গাছ, তাহার সেই ঘরের নদী। ধীবরের

হাত ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কম্পিত স্বরে কহিল, 'বুঢ়া, তবে চলিলাম। তিন্নি গেলে তোর ঘরকন্না কে দেখিবে।'

বুঢ়া একেবারে বালকের মতো কাঁদিয়া উঠিল।

আমিনা কহিল, 'বুঢ়া, যদি দালিয়া আর এখানে আসে তাহাকে এই আঙটি দিয়ো। বলিও, তিন্নি যাইবার সময় দিয়া গেছে।'

এই বলিয়াই দ্রুত শিবিকায় উঠিয়া পড়িল। মহাসমারোহে শিবিকা চলিয়া গেল। আমিনার কুটীর, নদীতীর, কৈলুতরুতল অন্ধকার, নিস্তব্ধ, জনশূন্য হইয়া গেল।

যথাকালে শিবিকাদ্বয় তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দুই ভগ্নী শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

আমিনার মুখে হাসি নাই, চোখেও অশ্রুচিহ্ন নাই। জুলিখার মুখ বিবর্ণ। কর্তব্য যখন দূরে ছিল ততক্ষণ তাহার উৎসাহের তীব্রতা ছিল— এখন সে কম্পিতহৃদয়ে ব্যাকুল স্নেহে আমিনাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। মনে মনে কহিল, 'নব প্রেমের বৃন্ত হইতে ছিন্ন করিয়া এই ফুটন্ত ফুলটিকে কোন্ রক্তস্রোতে ভাসাইতে যাইতেছি।'

কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় না। পরিচারিকাদের দ্বারা নীত হইয়া শত সহস্র প্রদীপের অনিমেষ তীব্র দৃষ্টির মধ্য দিয়া দুই ভগিনী স্বপ্নাহতের মতো চলিতে লাগিল, অবশেষে বাসরঘরের দ্বারের কাছে মুহূর্তের জন্য থামিয়া আমিনা জুলিখাকে কহিল, 'দিদি।'

জুলিখা আমিনাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া চুম্বন করিল।

উভয়ে ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল।

রাজবেশ পরিয়া ঘরের মাঝখানে মছলন্দ-শয্যার উপর রাজা বসিয়া আছে। আমিনা সসংকোচে দ্বারের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

জুলিখা অগ্রসর হইয়া রাজার নিকটবর্তী হইয়া দেখিল, রাজা নিঃশব্দে সকৌতুকে হাসিতেছেন।

জুলিখা বলিয়া উঠিল 'দালিয়া!'— আমিনা মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

দালিয়া উঠিয়া তাহাকে আহত পাখিটির মতো কোলে করিয়া তুলিয়া শয্যায় লইয়া গেল। আমিনা সচেতন হইয়া বুকের মধ্য হইতে ছুরিটি বাহির করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিল, দিদি দালিয়ার মুখের দিকে চাহিল, দালিয়া চুপ করিয়া হাস্যমুখে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল— ছুরিও তাহার খাপের মধ্য হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া এই রঙ্গ দেখিয়া ঝিকমিক করিয়া হাসিতে লাগিল।

জীবিত ও মৃত

প্রথম পরিচ্ছেদ

রানীহাটের জমিদার শারদাশংকরবাবুদের বাড়ির বিধবা বধূটির পিতৃকুলে কেহ ছিল না; সকলেই একে একে মারা গিয়াছে। পতিকুলেও ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই, পতিও নাই পুত্রও নাই। একটি ভাসুরপো, শারদাশংকরের ছোটো ছেলেটি, সেই তাহার চক্ষের মণি। সে জন্মিবার পর তাহার মাতার বহুকাল ধরিয়া শক্ত পীড়া হইয়াছিল, সেইজন্য এই বিধবা কাকী কাদম্বিনীই তাহাকে মানুষ করিয়াছে। পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরো যেন বেশি হয়, কারণ তাহার উপরে অধিকার থাকে না; তাহার উপরে কোনো সামাজিক দাবি নাই, কেবল স্নেহের দাবি— কিন্তু কেবলমাত্র স্নেহ সমাজের সমক্ষে আপনার দাবি কোনো দলিল অনুসারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না, কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধনটিকে দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ভালোবাসে।

বিধবার সমস্ত রুদ্ধ প্রীতি এই ছোটো ছেলেটির প্রতি সিঞ্চন করিয়া একদিন শ্রাবণের রাত্রে কাদম্বিনীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। হঠাৎ কী কারণে তাহার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গেল— সময় জগতের আর-সর্বত্রই চলিতে লাগিল, কেবল সেই স্নেহকাতর ক্ষুদ্র কোমল বক্ষটির ভিতর সময়ের ঘড়ির কল চিরকালের মতো বন্ধ হইয়া গেল।

পাছে পুলিসের উপদ্রব ঘটে এইজন্য অধিক আড়ম্বর না করিয়া জমিদারের চারি জন ব্রাহ্মণ কর্মচারী অনতিবিলম্বে মৃতদেহ দাহ করিতে লইয়া গেল।

রানীহাটের শ্মশান লোকালয় হইতে বহুদূরে। পুষ্করিণীর ধারে একখানি কুটীর এবং তাহার নিকটে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, বৃহৎ মাঠে আর-কোথাও কিছু নাই। পূর্বে এইখান দিয়া নদী বহিত, এখন নদী একেবারে শুকাইয়া গেছে। সেই শুষ্ক জলপথের এক অংশ খনন করিয়া শ্মশানের পুষ্করিণী নির্মিত হইয়াছে। এখনকার লোকেরা এই পুষ্করিণীকে পুণ্য স্রোতস্বিনীর প্রতিনিধিস্বরূপ জ্ঞান করে।

মৃতদেহ কুটীরের মধ্যে স্থাপন করিয়া চিতার কাঠ আসিবার প্রতীক্ষায় চার জনে বসিয়া রহিল। সময় এত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল যে অধীর হইয়া চারি জনের মধ্যে নিতাই এবং গুরুচরণ কাঠ আনিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন দেখিতে গেল, বিধু এবং বনমালী মৃতদেহ রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি। থমথমে মেঘ করিয়া আছে, আকাশে একটি তারা দেখা যায় না; অন্ধকার ঘরে দুই জন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একজনের চাদরে দিয়াশলাই এবং বাতি বাঁধা ছিল। বর্ষাকালের দিয়াশলাই বহু চেষ্টাতেও জ্বলিল না— যে লণ্ঠন সঙ্গে ছিল তাহাও নিবিয়া গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একজন কহিল, 'ভাই রে, এক ছিলিম তামাকের যোগাড় থাকিলে বড়ো সুবিধা হইত। তাড়াতাড়িতে কিছুই আনা হয় নাই।'

অন্য ব্যক্তি কহিল, 'আমি চট করিয়া এক দৌড়ে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারি।'

বনমালীর পলায়নের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিধু কহিল, 'মাইরি! আর, আমি বুঝি এখানে একলা বসিয়া থাকিব।'

আবার কথাবার্তা বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ মিনিটকে এক ঘণ্টা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহারা কাঠ আনিতে গিয়াছিল, তাহাদিগকে মনে মনে ইহারা গালি দিতে লাগিল— তাহারা যে দিব্য আরামে কোথাও বসিয়া গল্প করিতে করিতে তামাক খাইতেছে, এ সন্দেহ ক্রমশই তাহাদের মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কোথাও কিছু শব্দ নাই— কেবল পুষ্করিণীতীর হইতে অবিশ্রাম ঝিল্লি এবং ভেকের ডাক শুনা যাইতেছে। এমন সময় মনে হইল যেন খাটটা ঈষৎ নড়িল— যেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিধু এবং বনমালী রামনাম জপিতে জপিতে কাঁপিতে লাগিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুনা গেল। বিধু এবং বনমালী এক মুহূর্তে ঘর হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া গ্রামের অভিমুখে দৌড় দিল।

প্রায় ক্রোশ-দেড়েক পথ গিয়া দেখিল তাহাদের অবশিষ্ট দুই সঙ্গী লণ্ঠন হাতে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা বাস্তবিকই তামাক খাইতে গিয়াছিল, কাঠের কোনো খবর জানে না, তথাপি সংবাদ দিল গাছ কাটিয়া কাঠ ফাড়াইতেছে— অনতিবিলম্বে রওনা হইবে। তখন বিধু এবং বনমালী কুটীরের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। নিতাই এবং গুরুচরণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, এবং কর্তব্য ত্যাগ করিয়া আসার জন্য অপর দুই জনের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিয়া বিস্তর ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

কালবিলম্ব না করিয়া চার জনেই শ্মশানে সেই কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মৃতদেহ নাই, শূন্য খাট পড়িয়া আছে।

পরস্পর মুখ চাহিয়া রহিল। যদি শৃগালে লইয়া গিয়া থাকে? কিন্তু আচ্ছাদনবস্ত্রটি পর্যন্ত নাই। সন্ধান করিতে করিতে বাহিরে গিয়া দেখে কুটীরের দ্বারের কাছে খানিকটা কাদা জমিয়া ছিল, তাহাতে স্ত্রীলোকের সদ্য এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্ন।

শারদাশংকর সহজ লোক নহেন, তাঁহাকে এই ভূতের গল্প বলিলে হঠাৎ যে কোনো শুভফল পাওয়া যাইবে এমন সম্ভাবনা নাই। তখন চার জনে বিস্তর পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, দাহকার্য সমাধা হইয়াছে এইরূপ খবর দেওয়াই ভালো।

ভোরের দিকে যাহারা কাঠ লইয়া আসিল, তাহারা সংবাদ পাইল, বিলম্ব দেখিয়া পূর্বেই কার্য শেষ করা হইয়াছে, কুটীরের মধ্যে কাষ্ঠ সঞ্চিত ছিল। এ সম্বন্ধে কাহারও সহজে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না— কারণ, মৃতদেহ এমন-কিছু বহুমূল্য সম্পত্তি নহে যে কেহ ফাঁকি দিয়া চুরি করিয়া লইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সকলেই জানেন, জীবনের যখন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, এবং সময়মত পুনর্বার মৃতবৎ দেহে তাহার কার্য আরম্ভ হয়। কাদম্বিনীও মরে নাই— হঠাৎ কী কারণে তাহার জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যখন সে সচেতন হইয়া উঠিল, দেখিল চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার। চিরাভ্যাসমত যেখানে শয়ন করিয়া থাকে, মনে হইল, এটা সে জায়গা নহে। একবার ডাকিল 'দিদি'— অন্ধকার ঘরে কেহ সাড়া দিল না। সভয়ে উঠিয়া বসিল, মনে পড়িল সেই মৃত্যুশয্যার কথা। সেই হঠাৎ বক্ষের কাছে একটি বেদনা— শ্বাসরোধের উপক্রম। তাহার বড়ো জা ঘরের কোণে বসিয়া একটি অগ্নিকুণ্ডের উপরে খোকার জন্য দুধ গরম করিতেছে— কাদম্বিনী আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল— রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, 'দিদি, একবার খোকাকে আনিয়া দাও— আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।' তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল— যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াতসুদ্ধ কালি গড়াইয়া পড়িল—কাদম্বিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্বগ্রহের সমস্ত অক্ষর একমুহূর্তে একাকার হইয়া গেল। খোকা তাহাকে একবার শেষবারের মতো তাহার সেই সুমিষ্ট ভালোবাসার স্বরে কাকিমা বলিয়া ডাকিয়াছিল কি না, তাহার অনন্ত অজ্ঞাত মরণ যাত্রার পথে চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে এই শেষ স্নেহপাথেয়টুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল কি না বিধবার তাহাও মনে পড়ে না।

প্রথমে মনে হইল, যমালয় বুঝি এইরূপ চিরনির্জন এবং চিরান্ধকার। সেখানে কিছুই দেখিবার নাই, শুনিবার নাই, কাজ করিবার নাই, কেবল চিরকাল এইরূপ উঠিয়া জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

তাহার পর যখন মুক্তদ্বার দিয়া হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাদলার বাতাস দিল এবং বর্ষার ভেকের ডাক কানে প্রবেশ করিল, তখন এক মুহূর্তে তাহার এই স্বল্প জীবনের আশৈশব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল এবং পৃথিবীর নিকটসংস্পর্শ সে অনুভব করিতে পারিল। একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল; সম্মুখে পুষ্করিণী, বটগাছ, বৃহৎ মাঠ এবং সুদূর তরুশ্রেণী এক পলকে চোখে পড়িল। মনে পড়িল, মাঝে মাঝে পুণ্য তিথি উপলক্ষে এই পুষ্করিণীতে আসিয়া স্নান করিয়াছে, এবং মনে পড়িল সেই সময়ে এই শ্মশানে মৃতদেহ দেখিয়া মৃত্যুকে কী ভয়ানক মনে হইত।

প্রথমে মনে হইল, বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তখনি ভাবিল, আমি তো বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে লইবে কেন। সেখানে যে অমঙ্গল হইবে। জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি— আমি যে আমার প্রেতাত্মা।

তাই যদি না হইবে তবে সে এই অর্ধরাত্রে শারদাশংকরের সুরক্ষিত অন্তঃপুর হইতে এই দুর্গম শ্মশানে আসিল কেমন করিয়া। এখনো যদি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ না হইয়া থাকে তবে দাহ করিবার লোকজন গেল কোথায়? শারদাশংকরের আলোকিত গৃহে তাহার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত মনে পড়িল, তাহার পরেই এই বহুদূরবর্তী জনশূন্য অন্ধকার শ্মশানের মধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া সে জানিল, আমি এই পৃথিবীর জনসমাজের আর কেহ নহি— আমি অতি ভীষণ, অকল্যাণকারিণী; আমি আমার প্রেতাত্মা।

এই কথা মনে উদয় হইবামাত্রই তাহার মনে হইল, তাহার চতুর্দিক হইতে বিশ্বনিয়মের সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যেন তাহার অদ্ভুত শক্তি, অসীম স্বাধীনতা— যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে, যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। এই অভূতপূর্ব নূতন ভাবের আবির্ভাবে সে উন্মত্তের মতো হইয়া হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার শ্মশানের উপর দিয়া চলিল— মনে লজ্জা ভয় ভাবনার লেশমাত্র রহিল না।

চলিতে চলিতে চরণ শ্রান্ত, দেহ দুর্বল হইয়া আসিতে লাগিল। মাঠের পর মাঠ আর শেষ হয় না— মাঝে মাঝে ধান্যক্ষেত্র— কোথাও বা একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া আছে। যখন ভোরের আলো অল্প অল্প দেখা দিয়াছে তখন অদূরে লোকালয়ের বাঁশঝাড় হইতে দুটো-একটা পাখির ডাক শুনা গেল।

তখন তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। পৃথিবীর সহিত জীবিত মনুষ্যের সহিত এখন তাহার কিরূপ নূতন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে সে কিছু জানে না। যতক্ষণ মাঠে ছিল, শ্মশানে ছিল, শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল ততক্ষণ সে যেন নির্ভয়ে ছিল, যেন আপন রাজ্যে ছিল। দিনের আলোকে লোকালয় তাহার পক্ষে অতি ভয়ংকর স্থান বলিয়া বোধ হইল। মানুষ ভূতকে ভয় করে, ভূতও মানুষকে ভয় করে, মৃত্যুনদীর দুই পারে দুই জনের বাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাপড়ে কাদা মাখিয়া, অদ্ভুত ভাবের বশে ও রাত্রিজাগরণে পাগলের মতো হইয়া কাদম্বিনীর যেরূপ চেহারা হইয়াছিল তাহাতে মানুষ তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইতে পারিত এবং ছেলেরা বোধ হয় দূরে পালাইয়া গিয়া তাহাকে ঢেলা মারিত। সৌভাগ্যক্রমে একটি পথিক ভদ্রলোক তাহাকে সর্বপ্রথমে এই অবস্থায় দেখিতে পায়।

সে আসিয়া কহিল, 'মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধূ বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ অবস্থায় একলা পথে কোথায় চলিয়াছ।'

কাদম্বিনী প্রথমে কোনো উত্তর না দিয়া তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে যে সংসারের মধ্যে আছে তাহাকে যে ভদ্রকুলবধূর মতো দেখাইতেছে, গ্রামের পথে পথিক তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ-সমস্তই তাহার কাছে অভাবনীয় বলিয়া বোধ হইল।

পথিক তাহাকে পুনশ্চ কহিল, 'চলো মা, আমি তোমাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিই— তোমার বাড়ি কোথায় আমাকে বলো।'

কাদম্বিনী চিন্তা করিতে লাগিল। শ্বশুরবাড়ি ফিরিবার কথা মনে স্থান দেওয়া যায় না, বাপের বাড়ি তো নাই— তখন ছেলেবেলার সইকে মনে পড়িল।

সই যোগমায়ার সহিত যদিও ছেলেবেলা হইতেই বিচ্ছেদ তথাপি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলে। এক-এক সময় রীতিমত ভালোবাসার লড়াই চলিতে থাকে— কাদম্বিনী জানাইতে চাহে ভালোবাসা তাহার দিকেই প্রবল, যোগমায়া জানাইতে চাহে কাদম্বিনী তাহার ভালোবাসার যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয় না। কোনো সুযোগে একবার উভয়ে মিলন হইতে পারিলে যে একদণ্ড কেহ কাহাকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে না, এ বিষয়ে কোনো পক্ষেরই কোনো সন্দেহ ছিল না।

কাদম্বিনী ভদ্রলোকটিকে কহিল, 'নিশিন্দাপুরে শ্রীপতিচরণবাবুর বাড়ি যাইব।'

পথিক কলিকাতায় যাইতেছিলেন, নিশিন্দাপুর যদিও নিকটবর্তী নহে তথাপি তাঁহার গম্য পথেই পড়ে। তিনি স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া কাদম্বিনীকে শ্রীপতিচরণবাবুর বাড়ি পৌঁছাইয়া দিলেন।

দুই সইয়ে মিলন হইল। প্রথমে চিনিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, তার পরে বাল্যসাদৃশ্য উভয়ের চক্ষে ক্রমশই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

যোগমায়া কহিল, 'ওমা আমার কি ভাগ্য। তোমার যে দর্শন পাইব এমন তো

আমার মনেই ছিল না। কিন্তু ভাই, তুমি কী করিয়া আসিলে। তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যে তোমাকে ছাড়িয়া দিল!'

কাদম্বিনী চুপ করিয়া রহিল, অবশেষে কহিল, 'ভাই, শ্বশুরবাড়ির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না। আমাকে দাসীর মতো বাড়ির একপ্রান্তে স্থান দিয়ো, আমি তোমাদের কাজ করিয়া দিব।'

যোগমায়া কহিল, 'ওমা, সে কী কথা। দাসীর মতো থাকিবে কেন। তুমি আমার সই, তুমি আমার'— ইত্যাদি।

এমন সময় শ্রীপতি ঘরে প্রবেশ করিল। কাদম্বিনী খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল— মাথায় কাপড় দেওয়া বা কোনোরূপ সংকোচ বা সম্ভ্রমের লক্ষণ দেখা গেল না।

পাছে তাহার সইয়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি কিছু মনে করে, এজন্য ব্যস্ত হইয়া যোগমায়া নানারূপে তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এতই অল্প বুঝাইতে হইল এবং শ্রীপতি এত সহজে যোগমায়ার সমস্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করিল যে, যোগমায়া মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইল না।

কাদম্বিনী সইয়ের বাড়িতে আসিল, কিন্তু সইয়ের সঙ্গে মিশিতে পারিল না— মাঝে মৃত্যুর ব্যবধান। আত্মসম্বন্ধে সর্বদা একটা সন্দেহ এবং চেতনা থাকিলে পরের সঙ্গে মেলা যায় না। কাদম্বিনী যোগমায়ার মুখের দিকে চায় এবং কী যেন ভাবে— মনে করে, স্বামী এবং ঘরকন্না লইয়া ও যেন বহুদূরে আর-এক জগতে আছে। স্নেহ মমতা এবং সমস্ত কর্তব্য লইয়া ও যেন পৃথিবীর লোক, আর আমি যেন শূন্য ছায়া। ও যেন অস্তিত্বের দেশে আর আমি যেন অনন্তের মধ্যে।

যোগমায়ারও কেমন কেমন লাগিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্ত্রীলোক রহস্য সহ্য করিতে পারে না— কারণ অনিশ্চিতকে লইয়া কবিত্ব করা যায়, বীরত্ব করা যায়, পাণ্ডিত্য করা যায়, কিন্তু ঘরকন্না করা যায় না। এইজন্য স্ত্রীলোক যেটা বুঝিতে পারে না, হয় সেটার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া তাহার সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে না, নয় তাহাকে স্বহস্তে নূতন মূর্তি দিয়া নিজের ব্যবহারযোগ্য একটি সামগ্রী গড়িয়া তোলে— যদি দুইয়ের কোনোটাই না পারে তবে তাহার উপর ভারি রাগ করিতে থাকে।

কাদম্বিনী যতই দুর্বোধ হইয়া উঠিল, যোগমায়া তাহার উপর ততই রাগ করিতে লাগিল, ভাবিল, এ কী উপদ্রব স্কন্ধের উপর চাপিল।

আবার আর-এক বিপদ। কাদম্বিনীর আপনাকে আপনি ভয় করে। সে নিজের

কাছ হইতে নিজে কিছুতেই পালাইতে পারে না। যাহাদের ভূতের ভয় আছে তাহারা আপনার পশ্চাদ্দিককে ভয় করে— যেখানে দৃষ্টি রাখিতে পারে না সেইখানেই ভয়। কিন্তু, কাদম্বিনীর আপনার মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভয়— বাহিরে তার ভয় নাই।

এইজন্য বিজন দ্বিপ্রহরে সে একা ঘরে এক-এক দিন চীৎকার করিয়া উঠিত— এবং সন্ধ্যাবেলায় দীপালোকে আপনার ছায়া দেখিলে তাহার গা ছমছম করিতে থাকিত।

তাহার এই ভয় দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মনে কেমন একটা ভয় জন্মিয়া গেল। চাকরদাসীরা এবং যোগমায়াও যখন-তখন যেখানে-সেখানে ভূত দেখিতে আরম্ভ করিল।

একদিন এমন হইল, কাদম্বিনী অর্ধরাত্রে আপন শয়নগৃহ হইতে কাঁদিয়া বাহির হইয়া একেবারে যোগমায়ার গৃহদ্বারে আসিয়া কহিল, 'দিদি, দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো! আমায় একলা ফেলিয়া রাখিয়ো না।'

যোগমায়ার যেমন ভয়ও পাইল তেমনি রাগও হইল। ইচ্ছা করিল তন্দণ্ডেই কাদম্বিনীকে দূর করিয়া দেয়। দয়াপরবশ শ্রীপতি অনেক চেষ্টায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া পার্শ্ববর্তী গৃহে স্থান দিল।

পরদিন অসময়ে অন্তঃপুরে শ্রীপতির তলব হইল। যোগমায়া তাহাকে অকস্মাৎ ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল, 'হাঁ গা, তুমি কেমনধারা লোক! একজন মেয়েমানুষ আপন শ্বশুরঘর ছাড়িয়া তোমার ঘরে আসিয়া অধিষ্ঠান হইল, মাসখানেক হইয়া গেল তবু যাইবার নাম করে না, আর তোমার মুখে যে একটি আপত্তিমাত্র শুনি না! তোমার মনের ভাবটা কী বুঝাইয়া বলো দেখি। তোমরা পুরুষমানুষ এমনি জাতই বটে।'

বাস্তবিক সাধারণ স্ত্রীজাতির 'পরে পুরুষমানুষের একটা নির্বিচার পক্ষপাত আছে এবং সেজন্য স্ত্রীলোকেরাই তাহাদিগকে অধিক অপরাধী করে। নিঃসহায়া অথচ সুন্দরী কাদম্বিনীর প্রতি শ্রীপতির করুণা যে যথোচিত মাত্রার চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ছিল তাহার বিরুদ্ধে তিনি যোগমায়ার গাত্রস্পর্শপূর্বক শপথ করিতে উদ্যত হইলেও তাঁহার ব্যবহারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত।

তিনি মনে করিতেন, 'নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই পুত্রহীনা বিধবার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিত, তাই নিতান্ত সহ্য করিতে না পারিয়া পালাইয়া কাদম্বিনী আমার আশ্রয় লইয়াছে। যখন ইহার বাপ মা কেহই নাই, তখন আমি ইহাকে কী করিয়া ত্যাগ করি।' এই বলিয়া তিনি কোনোরূপ সন্ধান লইতে ক্ষান্ত ছিলেন এবং কাদম্বিনীকেও এই অপ্রীতিকর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যথিত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না।

তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অসাড় কর্তব্যবুদ্ধিতে নানাপ্রকার আঘাত দিতে লাগিল।

কাদম্বিনীর শ্বশুরবাড়িতে খবর দেওয়া যে তাঁহার গৃহের শান্তিরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন, হঠাৎ চিঠি লিখিয়া বসিলে ভালো ফল নাও হইতে পারে অতএব রানীহাটে তিনি নিজে গিয়া সন্ধান লইয়া যাহা কর্তব্য স্থির করিবেন।

শ্রীপতি তো গেলেন, এদিকে যোগমায়া আসিয়া কাদম্বিনীকে কহিল, 'সই, এখানে তোমার আর থাকা ভালো দেখাইতেছে না। লোকে বলিবে কী।'

কাদম্বিনী গম্ভীরভাবে যোগমায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, 'লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী।'

যোগমায়া কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ রাগিয়া কহিল, 'তোমার না থাকে, আমাদের তো আছে। আমরা পরের ঘরের বধূকে কী বলিয়া আটক করিয়া রাখিব।'

কাদম্বিনী কহিল, 'আমার শ্বশুরঘর কোথায়।'

যোগমায়া ভাবিল, আ-মরণ! পোড়াকপালী বলে কী।

কাদম্বিনী ধীরে ধীরে কহিল, 'আমি কি তোমাদের কেহ। আমি কি এ পৃথিবীর। তোমরা হাসিতেছ, কাঁদিতেছ, ভালোবাসিতেছ, সবাই আপন আপন লইয়া আছ, আমি তো কেবল চাহিয়া আছি। তোমরা মানুষ, আর আমি ছায়া। বুঝিতে পারি না, ভগবান আমাকে তোমাদের এই সংসারের মাঝখানে কেন রাখিয়াছেন। তোমরাও ভয় কর পাছে তোমাদের হাসিখেলার মধ্যে আমি অমঙ্গল আনি— আমিও বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তোমাদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক। কিন্তু ঈশ্বর যখন আমাদের জন্য আর-কোনো স্থান গড়িয়া রাখেন নাই, তখন কাজে কাজেই বন্ধন ছিঁড়িয়া যায় তবু তোমাদের কাছেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই।'

এমনি ভাবে চাহিয়া কথাগুলা বলিয়া গেল যে, যোগমায়া কেমন এক রকম করিয়া মোটের উপর একটা কী বুঝিতে পারিল কিন্তু আসল কথাটা বুঝিল না, জবাবও দিতে পারিল না। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতেও পারিল না। অত্যন্ত ভারগ্রস্ত গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় যখন দশটা তখন শ্রীপতি রানীহাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মুষলধারে বৃষ্টিতে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমাগতই তাহার ঝর ঝর শব্দে মনে হইতেছে, বৃষ্টির শেষ নাই, আজ রাত্রিরও শেষ নাই।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইল।'

শ্রীপতি কহিলেন, 'সে অনেক কথা। পরে হইবে।' বলিয়া কাপড় ছাড়িয়া আহার করিলেন এবং তামাক খাইয়া শুইতে গেলেন। ভাবটা অত্যন্ত চিন্তিত।

যোগমায়া অনেকক্ষণ কৌতূহল দমন করিয়া ছিলেন, শয্যায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী শুনিলে, বলো।'

শ্রীপতি কহিলেন, 'নিশ্চয় তুমি একটা ভুল করিয়াছ।'

শুনিবামাত্র যোগমায়া মনে মনে ঈষৎ রাগ করিলেন। ভুল মেয়েরা কখনোই করে না, যদি বা করে কোনো সুবুদ্ধি পুরুষের সেটা উল্লেখ করা কর্তব্য হয় না, নিজের ঘাড় পাতিয়া লওয়াই সুযুক্তি। যোগমায়া কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবে কহিলেন, 'কিরকম শুনি।'

শ্রীপতি কহিলেন, 'যে স্ত্রীলোকটিকে তোমার ঘরে স্থান দিয়াছ সে তোমার সই কাদম্বিনী নহে।'

এমনতরো কথা শুনিলে সহজেই রাগ হইতে পারে— বিশেষত নিজের স্বামীর মুখে শুনিলে তো কথাই নাই। যোগমায়া কহিলেন, 'আমার সইকে আমি চিনি না, তোমার কাছ হইতে চিনিয়া লইতে হইবে— কী কথার শ্রী।'

শ্রীপতি বুঝাইলেন এ স্থলে কথার শ্রী লইয়া কোনোরূপ তর্ক হইতেছে না, প্রমাণ দেখিতে হইবে। যোগমায়ার সই কাদম্বিনী যে মারা গিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

যোগমায়া কহিলেন, 'ঐ শোনো! তুমি নিশ্চয় একটা গোল পাকাইয়া আসিয়াছ। কোথায় যাইতে কোথায় গিয়াছ, কী শুনিতে কী শুনিয়াছ তাহার ঠিক নাই। তোমাকে নিজে যাইতে কে বলিল, একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইত।'

নিজের কর্মপটুতার প্রতি স্ত্রীর এইরূপ বিশ্বাসের অভাবে শ্রীপতি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বিস্তারিতভাবে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন— কিন্তু কোনো ফল হইল না। উভয়পক্ষে হাঁ-না করিতে করিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল।

যদিও কাদম্বিনীকে এই দণ্ডেই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী স্ত্রী কাহারও মতভেদ ছিল না। কারণ শ্রীপতির বিশ্বাস, তাঁহার অতিথি ছদ্মপরিচয়ে তাঁহার স্ত্রীকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছে এবং যোগমায়ার বিশ্বাস সে কুলত্যাগিনী— তথাপি উপস্থিত তর্কটা সম্বন্ধে উভয়ের কেহই হার মানিতে চাহেন না।

উভয়ের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল, ভুলিয়া গেলেন পাশের ঘরেই কাদম্বিনী শুইয়া আছে।

একজন বলেন, 'ভালো বিপদেই পড়া গেল। আমি নিজের কানে শুনিয়া আসিলাম।'

আর-এক জন দৃঢ়স্বরে বলেন, 'সে কথা বলিলে মানিব কেন, আমি নিজের চক্ষে দেখিতেছি।'

অবশেষে যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, কাদম্বিনী কবে মরিল বলো দেখি।'

ভাবিলেন কাদম্বিনীর কোনো-একটা চিঠির তারিখের সহিত অনৈক্য বাহির করিয়া শ্রীপতির ভ্রম সপ্রমাণ করিয়া দিবেন।

শ্রীপতি যে তারিখের কথা বলিলেন, উভয়ে হিসাব করিয়া দেখিলেন যেদিন সন্ধ্যাবেলায় কাদম্বিনী তাঁহাদের বাড়িতে আসে সে তারিখ ঠিক তাহার পূর্বের দিনেই পড়ে। শুনিবামাত্র যোগমায়ার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, শ্রীপতিরও কেমন এক রকম বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময়ে তাঁহাদের ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল, একটা বাদলার বাতাস আসিয়া প্রদীপটা ফস করিয়া নিবিয়া গেল। বাহিরের অন্ধকার প্রবেশ করিয়া একমুহূর্তে সমস্ত ঘরটা আগাগোড়া ভরিয়া গেল। কাদম্বিনী একেবারে ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি আড়াই প্রহর হইয়া গিয়াছে, বাহিরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে।

কাদম্বিনী কহিল, 'সই, আমি তোমার সেই কাদম্বিনী, কিন্তু এখন আমি আর বাঁচিয়া নাই। আমি মরিয়া আছি।'

যোগমায়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন— শ্রীপতির বাকস্ফূর্তি হইল না।

'কিন্তু আমি মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কী অপরাধ করিয়াছি। আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই পরলোকেও স্থান নাই— ওগো তবে কোথায় যাইব'। তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া যেন এই গভীর বর্ষানিশীথে সুপ্ত বিধাতাকে জাগ্রত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল— 'ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব।'

এই বলিয়া মূর্ছিত দম্পতিকে অন্ধকার ঘরে ফেলিয়া বিশ্বজগতে কাদম্বিনী আপনার স্থান খুঁজিতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাদম্বিনী যে কেমন করিয়া রানীহাটে ফিরিয়া গেল, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু প্রথমে কাহাকেও দেখা দিল না। সমস্ত দিন অনাহারে একটা ভাঙা পোড়ো মন্দিরে যাপন করিল।

বর্ষার অকাল সন্ধ্যা যখন অত্যন্ত ঘন হইয়া আসিল এবং আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কায় গ্রামের লোকেরা ব্যস্ত হইয়া আপন আপন গৃহ আশ্রয় করিল তখন কাদম্বিনী পথে বাহির হইল। শ্বশুরবাড়ির দ্বারে গিয়া একবার তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু মস্ত

ঘোমটা টানিয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করিল দাসীভ্রমে দ্বারীরা কোনোরূপ বাধা দিল না— এমন সময় বৃষ্টি খুব চাপিয়া আসিল, বাতাসও বেগে বহিতে লাগিল।

তখন বাড়ির গৃহিনী শারদাশংকরের স্ত্রী তাঁহার বিধবা ননদের সহিত তাস খেলিতেছিলেন। ঝি ছিল রান্নাঘরে এবং পীড়িত খোকা জ্বরের উপশমে শয়নগৃহে বিছানায় ঘুমাইতেছিল। কাদম্বিনী সকলের চক্ষু এড়াইয়া সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সে যে কী ভাবিয়া শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিল জানি না, সে নিজেও জানে না, কেবল এইটুকু জানে যে একবার খোকাকে চক্ষে দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা। তাহার পর কোথায় যাইবে, কী হইবে, সে কথা সে ভাবেও নাই।

দীপালোকে দেখিল রুগ্ণ শীর্ণ খোকা হাত মুঠা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। দেখিয়া উত্তপ্ত হৃদয় যেন তৃষাতুর হইয়া উঠিল— তাহার সমস্ত বালাই লইয়া তাহাকে একবার বুকে চাপিয়া না ধরিলে কি বাঁচা যায়। আর, তাহার পর মনে পড়িল, 'আমি নাই, ইহাকে দেখিবার কে আছে। ইহার মা সঙ্গ ভালোবাসে, গল্প ভালোবাসে, খেলা ভালোবাসে, এতদিন আমার হাতে ভার দিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল, কখনো তাহাকে ছেলে মানুষ করিবার কোনো দায় পোহাইতে হয় নাই। আজ ইহাকে কে তেমন করিয়া যত্ন করিবে।'

এমন সময় খোকা হঠাৎ পাশ ফিরিয়া অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় বলিয়া উঠিল, 'কাকিমা জল দে।' আ মরিয়া যাই! সোনা আমার, তোর কাকিমাকে এখনো ভুলিস নাই! তাড়াতাড়ি কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া খোকাকে বুকের উপর তুলিয়া কাদম্বিনী তাকে জলপান করাইল।

যতক্ষণ ঘুমের ঘোর ছিল, চিরাভ্যাসমত কাকিমার হাত হইতে জল খাইতে খোকার কিছুই আশ্চর্যবোধ হইল না। অবশেষে কাদম্বিনী যখন বহুকালের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে আবার শুয়াইয়া দিল, তখন তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল এবং কাকিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কাকিমা, তুই মরে গিয়েছিলি?'

কাকিমা কহিল, 'হাঁ খোকা।'

'আবার তুই খোকার কাছে ফিরে এসেছিস? আর তুই মরে যাবি নে?'

ইহার উত্তর দিবার পূর্বেই একটা গোল বাধিল— ঝি একবাটি সাগু হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, হঠাৎ বাটি ফেলিয়া 'মাগো' বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

চীৎকার শুনিয়া তাস ফেলিয়া গিন্নি ছুটিয়া আসিলেন, ঘরে ঢুকিতেই তিনি একেবারে কাঠের মতো হইয়া গেলেন, পালাইতেও পারিলেন না, মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না।

এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া খোকারও মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল— সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, 'কাকিমা, তুই যা।'

কাদম্বিনী অনেকদিন পরে আজ অনুভব করিয়াছে যে সে মরে নাই— সেই পুরাতন ঘরদ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্তভাবেই আছে, মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ কোনো ব্যবধান জন্মায় নাই। সইয়ের বাড়ি গিয়া অনুভব করিয়াছিল বাল্যকালের সে সই মরিয়া গিয়াছে— খোকার ঘরে আসিয়া বুঝিতে পারিল, খোকার কাকিমা তো একতিলও মরে নাই।

ব্যাকুলভাবে কহিল, 'দিদি, তোমরা আমাকে দেখিয়া কেন ভয় পাইতেছ। এই দেখো, আমি তোমাদের সেই তেমনি আছি।'

গিন্নি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

ভগ্নীর কাছে সংবাদ পাইয়া শারদাশংকরবাবু স্বয়ং অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন— তিনি জোড়হস্তে কাদম্বিনীকে কহিলেন, 'ছোটোবউমা, এই কি তোমার উচিত হয়। সতীশ আমার বংশের একমাত্র ছেলে, উহার প্রতি তুমি কেন দৃষ্টি দিতেছ। আমরা কি তোমার পর। তুমি যাওয়ার পর হইতে ও প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে, উঁহার ব্যামো আর ছাড়ে না, দিনরাত কেবল 'কাকিমা কাকিমা' করে। যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও— আমরা তোমার যথোচিত সৎকার করিব।'

তখন কাদম্বিনী আর সহিতে পারিল না, তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই। আমি কেমন করিয়া তোমাদের বুঝাইব, আমি মরি নাই। এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।'

বলিয়া কাঁসার বাটিটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

তখন বলিল, 'এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।'

শারদাশংকর মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন— খোকা ভয়ে বাবাকে ডাকিতে লাগিল, দুই মূর্ছিতা রমণী মাটিতে পড়িয়া রহিল।

তখন কাদম্বিনী 'ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই গো, মরি নাই'— বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশংকর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস করিয়া একটা শব্দ হইল।

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে— মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিরাম নাই। কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।

ছুটি

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল; নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে-ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময়, বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকল প্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, 'দেখ, মার খাবি! এইবেলা ওঠ্।'

সে তাহাতে আরো একটু নড়িয়াচড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল— সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনি উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে কিন্তু করিল না, কারণ পূর্বাপেক্ষা আর-একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর-একটু বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিংবা আর কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল— 'মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস

জোয়ান হেঁইয়ো।' গুঁড়ি একপাক ঘুরিতে-না-ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য, গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞানসমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়।'

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, 'ঐ হোথা।' কিন্তু কোন্‌দিকে যে নির্দেশ করিল কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা।'

সে বলিল, 'জানি নে।' বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগদি আসিয়া কহিল, 'ফটিকদাদা, মা ডাকছে।'

ফটিক কহিল, 'যাব না।'

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, 'আবার তুই মাখনকে মেরেছিস!'

ফটিক কহিল, 'না, মারি নি।'

'ফের মিথ্যে কথা বলছিস!'

'কখ্‌খনো মারি নি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো।'

মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, 'হাঁ, মেরেছে।'

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, 'ফের মিথ্যে কথা!'

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চীৎকার করিয়া কহিলেন, 'অ্যাঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস!'

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, 'কী হচ্ছে তোমাদের।'

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, 'ওমা, এ যে দাদা, তুমি কবে এলে।' বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই-একদিন পূর্বে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ, এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাঁহার ভগিনী কহিলেন, 'ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।'

শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?'

ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'যাব'।

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল কোন্‌দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয় কি মাথাই ফাটায় কি কী একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

'কবে যাবে', 'কখন যাবে' করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্যবশত তাহার ছিপ ঘুড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমত মামীর সঙ্গে আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবারবৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত্র যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে।

বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ কেহ করিতে সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারি দিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো-এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

মামীর স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সব চেয়ে বাজিত। মামী যদি দৈবাৎ তাহাকে কোনো-একটা কাজ করিতে বলিতেন, তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত— অবশেষে মামী যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, 'ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাও গে। একটু

পড়ো গে যাও।'— তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামীর এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই-সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা— কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলিসময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন— সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারক্লান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত, তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর-রৌদ্রে কোনো-একটা ছাদে দুটি-একটি ছেলেমেয়ে কিছু-একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত, তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মামা, মার কাছে কবে যাব।' মামা বলিয়াছিলেন, 'স্কুলের ছুটি হোক।' কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনো ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামীর কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, 'বই হারিয়ে ফেলেছি।'

মামী অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, 'বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।'

ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল— সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল; নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সিরসির করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল ব্যামো বাধাইলে তাহার মামীর প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামী এই ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে, তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর-কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভরবাবু পুলিসে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনো ঝুপ ঝুপ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিসের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভরবাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষু লোহিতবর্ণ, থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ। দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।'

বাস্তবিক, সমস্তদিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালোরূপ আহারাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিটমিট করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।'

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, 'মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি।'

বিশ্বম্ভরবাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, বলিল, 'মা, আমাকে মারিস্ নে, মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করি নি।'

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যালফ্যাল করিয়া ঘরের চারি দিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, 'ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।'

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বড়োই খারাপ।

বিশ্বম্ভরবাবু স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতিমুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, 'এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে—এ—এ না।' কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহুকষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে, তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, 'ফটিক, সোনা, মানিক আমার।'

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, 'অ্যাঁ।'

মা আবার ডাকিলেন, 'ওরে ফটিক, বাপধন রে।'

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

দানপ্রতিদান

বড়োগিন্নি যে কথাগুলা বলিয়া গেলেন, তাহার ধার যেমন তাহার বিষও তেমনি। যে-হতভাগিনীর উপর প্রয়োগ করিয়া গেলেন, তাহার চিত্তপুত্তলি একেবারে জ্বলিয়া জ্বলিয়া লুটিতে লাগিল।

বিশেষত, কথাগুলা তাহার স্বামীর উপর লক্ষ্য করিয়া বলা— এবং স্বামী রাধামুকুন্দ তখন রাত্রের আহার সমাপন করিয়া অনতিদূরে বসিয়া তাম্বুলের সহিত তাম্রকূটধূম্র সংযোগ করিয়া খাদ্যপরিপাকে প্রবৃত্ত ছিলেন। কথাগুলো শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিপাকের যে বিশেষ ব্যাঘাত করিল, এমন বোধ হইল না। অবিচলিত গাম্ভীর্যের সহিত তাম্রকূট নিঃশেষ করিয়া অভ্যাসমত যথাকালে শয়ন করিতে গেলেন।

কিন্তু এরূপ অসামান্য পরিপাকশক্তি সকলের নিকটে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। রাসমণি আজ শয়নগৃহে আসিয়া স্বামীর সহিত এমন ব্যবহার করিল, যাহা ইতিপূর্বে সে কখনো করিতে সাহস করে নাই। অন্যদিন শান্তভাবে শয্যায় প্রবেশ করিয়া নীরবে স্বামীর পদসেবায় নিযুক্ত হইত, আজ একেবারে সবেগে কঙ্কণঝংকার করিয়া স্বামীর প্রতি বিমুখ হইয়া বিছানার একপাশে শুইয়া পড়িল এবং ক্রন্দনাবেগে শয্যাতল কম্পিত করিয়া তুলিল।

রাধামুকুন্দ তৎপ্রতি মনোযোগ না দিয়া একটা প্রকাণ্ড পাশবালিশ আঁকড়িয়া ধরিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ঔদাসীন্যে স্ত্রীর অধৈর্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া অবশেষে মৃদুগম্ভীর স্বরে জানাইলেন যে, তাঁহাকে বিশেষ কার্যবশত ভোরে উঠিতে হইবে, এক্ষণে নিদ্রা আবশ্যক।

স্বামীর কণ্ঠস্বরে রাসমণির ক্রন্দন আর বাধা মানিল না, মুহূর্তে উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল।

রাধামুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইয়াছে?'

রাসমণি উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন, 'শোন নাই কি?'

'শুনিয়াছি। কিন্তু বউঠাকরুন একটা কথাও তো মিথ্যা বলেন নাই। আমি কি দাদার অন্নেই প্রতিপালিত নহি? তোমার এই কাপড়চোপড় গহনাপত্র এ-সমস্ত আমি

কি আমার বাপের কড়ি হইতে আনিয়া দিয়াছি? যে খাইতে পরিতে দেয় সে যদি দুটো কথা বলে, তাহাও খাওয়াপরার শামিল করিয়া লইতে হয়।

'এমন খাওয়াপরায় কাজ কী?'

'বাঁচিতে তো হইবে।'

'মরণ হইলেই ভালো হয়।'

'যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করো, আরাম বোধ করিবে।' বলিয়া রাধামুকুন্দ উপদেশ ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাধামুকুন্দ ও শশিভূষণ সহোদর ভাই নহে, নিতান্ত নিকট-সম্পর্কও নয়; প্রায় গ্রামসম্পর্ক বলিলেই হয়। কিন্তু প্রীতিবন্ধন সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছু কম নহে। বড়োগিন্নি ব্রজসুন্দরীর সেটা কিছু অসহ্য বোধ হইত। বিশেষত, শশিভূষণ দেওয়াথোওয়া সম্বন্ধে ছোটোবউয়ের অপেক্ষা নিজ স্ত্রীর প্রতি অধিক পক্ষপাত করিতেন না। বরঞ্চ যে-জিনিসটা নিতান্ত একজোড়া না মিলিত, সেটা গৃহিণীকে বঞ্চিত করিয়া ছোটোবউকেই দিতেন। তাহা ছাড়া, অনেক সময়ে তিনি স্ত্রীর অনুরোধ অপেক্ষা রাধামুকুন্দের পরামর্শের প্রতি বেশি নির্ভর করিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শশিভূষণ লোকটা নিতান্ত ঢিলাঢালা রকমের, তাই ঘরের কাজ এবং বিষয়কর্মের সমস্ত ভার রাধামুকুন্দের উপরেই ছিল। বড়োগিন্নির সর্বদাই সন্দেহ, রাধামুকুন্দ তলে তলে তাঁহার স্বামীকে বঞ্চনা করিবার আয়োজন করিতেছে— তাহার যতই প্রমাণ পাওয়া যাইত না, রাধার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ততই বাড়িয়া উঠিত। মনে করিতেন, প্রমাণগুলোও অন্যায় করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, এইজন্য তিনি আবার প্রমাণের উপর রাগ করিয়া তাহাদের প্রতি নিরতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশপূর্বক নিজের সন্দেহকে ঘরে বসিয়া দ্বিগুণ দৃঢ় করিতেন। তাঁহার এই বহুযত্নপোষিত মানসিক আগুন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় ভূমিকম্প-সহকারে প্রায় মাঝে মাঝে উষ্ণভাষায় উচ্ছ্বসিত হইত।

রাত্রে রাধামুকুন্দের ঘুমের ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না— কিন্তু পরদিন সকালে উঠিয়া তিনি বিরসমুখে শশিভূষণের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। শশিভূষণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাধে, তোমায় এমন দেখিতেছি কেন? অসুখ হয় নাই তো?'

রাধামুকুন্দ মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, 'দাদা, আর তো আমার এখানে থাকা হয় না।' এই বলিয়া গত সন্ধ্যাকালে বড়োগৃহিণীর আক্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষেপে এবং শান্তভাবে বর্ণনা করিয়া গেলেন।

শশিভূষণ হাসিয়া কহিলেন, 'এই! এ তো নূতন কথা নহে। ও তো পরের ঘরের মেয়ে, সুযোগ পাইলেই দুটো কথা বলিবে, তাই বলিয়া কি ঘরের লোককে ছাড়িয়া যাইতে হইবে! কথা আমাকেও তো মাঝে মাঝে শুনিতে হয়, তাই বলিয়া তো সংসার ত্যাগ করিতে পারি না।'

রাধা কহিলেন, 'মেয়েমানুষের কথা কি আর সহিতে পারি না, তবে পুরুষ হইয়া জন্মিলাম কী করিতে! কেবল ভয় হয়, তোমার সংসারে পাছে অশান্তি ঘটে।'

শশিভূষণ কহিলেন, 'তুমি গেলে আমার কিসের শান্তি।'

আর অধিক কথা হইল না। রাধামুকুন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয়ভার সমান রহিল।

এদিকে বড়োগৃহিণীর আক্রোশ ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে। সহস্র উপলক্ষে যখন-তখন তিনি রাধাকে খোঁটা দিতে পারিলে ছাড়েন না; মুহুর্মুহু বাক্যবাণে রাসমণির অন্তরাত্মাকে একপ্রকার শরশয্যাশায়ী করিয়া তুলিলেন। রাধা যদিও চুপচাপ করিয়া তামাক টানেন এবং স্ত্রীকে ক্রন্দনোন্মুখী দেখিবামাত্র চোখ বুজিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করেন, তবু ভাবে বোধ হয় তাঁহারও অসহ্য হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু শশিভূষণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক তো আজিকার নহে— দুই ভাই যখন প্রাতঃকালে পান্তাভাত খাইয়া পাততাড়ি কক্ষে একসঙ্গে পাঠশালায় যাইত, উভয়ে যখন একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিয়া পাঠশালা হইতে পালাইয়া রাখাল-ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া নানাবিধ খেলা ফাঁদিত, এক বিছানায় শুইয়া স্তিমিত আলোকে মাসির নিকট গল্প শুনিত, ঘরের লোককে লুকাইয়া রাত্রে দূর পল্লীতে যাত্রা শুনিতে যাইত এবং প্রাতঃকালে ধরা পড়িয়া অপরাধ এবং শাস্তি উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইত— তখন কোথায় ছিল ব্রজসুন্দরী, কোথায় ছিল রাসমণি! জীবনের এতগুলো দিনকে কি একদিনে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাওয়া যায়? কিন্তু এই বন্ধন যে স্বার্থপরতার বন্ধন, এই প্রগাঢ় প্রীতি যে পরান্নপ্রত্যাশার সুচতুর ছদ্মবেশ, এরূপ সন্দেহ এরূপ আভাসমাত্র তাঁহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইত, অতএব আর কিছুদিন এরূপ চলিলে কী হইত বলা যায় না। কিন্তু এমন সময়ে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটিল।

যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে গবর্মেন্টের খাজনা শোধ না করিলে জমিদারি সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইত।

একদিন খবর আসিল, শশিভূষণের একমাত্র জমিদারি পরগণা এনাৎশাহী লাটের খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গেছে।

রাধামুকুন্দ তাঁহার স্বাভাবিক মৃদু প্রশান্তভাবে কহিলেন, 'আমারই দোষ।'

শশিভূষণ কহিলেন, 'তোমার কিসের দোষ। তুমি তো খাজনা চালান দিয়াছিলে, পথে যদি ডাকাত পড়িয়া লুটিয়া লয়, তুমি তাহার কী করিতে পার।'

দোষ কাহার এক্ষণে তাহা স্থির করিতে বসিয়া কোনো ফল নাই— এখন সংসার চালাইতে হইবে। শশিভূষণ হঠাৎ যে কোনো কাজকর্মে হাত দিবেন, সেরূপ তাঁহার স্বভাব ও শিক্ষা নহে। তিনি যেন ঘাটের বাঁধা সোপান হইতে পিছলিয়া একমুহূর্তে ডুবজলে গিয়া পড়িলেন।

প্রথমেই তিনি স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিতে উদ্যত হইলেন। রাধামুকুন্দ এক থলে টাকা সম্মুখে ফেলিয়া তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি পূর্বেই নিজ স্ত্রীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সংসারে একটা এই মহৎ পরিবর্তন দেখা গেল, সম্পৎকালে গৃহিণী যাহাকে দূর করিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিপৎকালে তাহাকে ব্যাকুলভাবে অবলম্বন করিয়া ধরিলেন। এই সময়ে দুই ভ্রাতার মধ্যে কাহার উপরে অধিক নির্ভর করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কখনো যে রাধামুকুন্দের প্রতি তাঁহার তিলমাত্র বিদ্বেষভাব ছিল, এখন আর তাহা প্রকাশ পায় না।

রাধামুকুন্দ পূর্ব হইতেই স্বাধীন উপার্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। নিকটবর্তী শহরে সে মোক্তারি আরম্ভ করিয়া দিল। তখন মোক্তারি ব্যবসায়ে আয়ের পথ এখনকার অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাবধানী রাধামুকুন্দ প্রথম হইতেই পসার জমাইয়া তুলিল। ক্রমে সে জিলার অধিকাংশ বড়ো বড়ো জমিদারের কার্যভার গ্রহণ করিল।

এক্ষণে রাসমণির অবস্থা পূর্বের ঠিক বিপরীত। এখন রাসমণির স্বামীর অন্নেই শশিভূষণ এবং ব্রজসুন্দরী প্রতিপালিত। সে-কথা লইয়া সে স্পষ্ট কোনো গর্ব করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু কোনো-একদিন বোধ করি আভাসে ইঙ্গিতে ব্যবহারে সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল, বোধ করি দেমাকের সহিত পা ফেলিয়া এবং হাত দুলাইয়া কোনো-একটা বিষয়ে বড়োগিন্নির ইচ্ছার প্রতিকূলে নিজের মনোমত কাজ করিয়াছিল— কিন্তু সে কেবল একটিদিন মাত্র— তাহার পরদিন হইতে সে যেন পূর্বের অপেক্ষাও নম্র হইয়া গেল। কারণ, কথাটা তাহার স্বামীর কানে গিয়াছিল, এবং রাত্রে রাধামুকুন্দ কী কী যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না, পরদিন হইতে তাহার মুখে আর 'রা' রহিল না, বড়োগিন্নির দাসীর মতো হইয়া রহিল— শুনা যায়, রাধামুকুন্দ সেই রাত্রেই স্ত্রীকে তাহার পিতৃভবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল এবং সপ্তাহকাল তাহার মুখদর্শন করে নাই— অবশেষে ব্রজসুন্দরী ঠাকুরপোর হাতে ধরিয়া অনেক মিনতি করিয়া দম্পতির

মিলনসাধন করাইয়া দেন, এবং বলেন, 'ছোটোবউ তো সেদিন আসিয়াছে, আর আমি কতকাল হইতে তোমাদের ঘরে আছি, ভাই। তোমাতে আমাতে যে চিরকালের প্রিয়সম্পর্ক তাহার মর্যাদা ও কি বুঝিতে শিখিয়াছে! ও ছেলেমানুষ, উহাকে মাপ করো।'

রাধামুকুন্দ সংসারখরচের সমস্ত টাকা ব্রজসুন্দরীর হাতে আনিয়া দিতেন। রাসমণি নিজের আবশ্যক ব্যয় নিয়ম-অনুসারে অথবা প্রার্থনা করিয়া ব্রজসুন্দরীর নিকট হইতে পাইতেন। গৃহমধ্যে বড়োগিন্নির অবস্থা পূর্বাপেক্ষা ভালো বৈ মন্দ নহে, কারণ পূর্বেই বলিয়াছি শশিভূষণ স্নেহবশে এবং নানা বিবেচনায় রাসমণিকে বরঞ্চ অনেকসময় অধিক পক্ষপাত দেখাইতেন।

শশিভূষণের মুখে যদিও তাঁহার সহজ প্রফুল্ল হাস্যের বিরাম ছিল না, কিন্তু গোপন অসুখে তিনি প্রতিদিন কৃশ হইয়া যাইতেছিলেন। আর-কেহ তাহা ততটা লক্ষ্য করে নাই, কেবল দাদার মুখ দেখিয়া রাধার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। অনেকসময় গভীর রাত্রে রাসমণি জাগ্রত হইয়া দেখিত, গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অশান্তভাবে রাধা এপাশ ওপাশ করিতেছে।

রাধামুকুন্দ অনেকসময় শশিভূষণকে গিয়া আশ্বাস দিত, 'তোমার কোনো ভাবনা নাই, দাদা। তোমার পৈতৃক বিষয় আমি ফিরাইয়া আনিব— কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না। বেশিদিন দেরিও নাই।'

বাস্তবিক বেশিদিন দেরিও হইল না। শশিভূষণের সম্পত্তি যে-ব্যক্তি নিলামে খরিদ করিয়াছিল সে ব্যবসায়ী লোক, জমিদারির কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সম্মানের প্রত্যাশায় কিনিয়াছিল, কিন্তু ঘর হইতে সদরখাজনা দিতে হইত— একপয়সা মুনাফা পাইত না। রাধামুকুন্দ বৎসরের মধ্যে দুই-একবার লাঠিয়াল লইয়া লুটপাট করিয়া খাজনা আদায় করিয়া আনিত।প্রজারাও তাহার বাধ্য ছিল। অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় ব্যবসাজীবী জমিদারকে তাহারা মনে মনে ঘৃণা করিত এবং রাধামুকুন্দের পরামর্শে ও সাহায্যে সর্বপ্রকারেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

অবশেষে সে বেচারা বিস্তর মকদ্দমা-মামলা করিয়া বারবার অকৃতকার্য হইয়া এই ঝঞ্ঝাট হাত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। সামান্য মূল্যে রাধামুকুন্দ সেই পূর্ব সম্পত্তি পুনর্বার কিনিয়া লইলেন।

লেখায় যত অল্পদিন মনে হইল, আসলে ততটা নয়। ইতিমধ্যে প্রায় দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দশ বৎসর পূর্বে শশিভূষণ যৌবনের সর্বপ্রান্তে প্রৌঢ়বয়সের আরম্ভভাগে ছিলেন, কিন্তু এই আট-দশ বৎসরের মধ্যেই তিনি যেন অন্তররুদ্ধ মানসিক উত্তাপের বাষ্পযানে চড়িয়া একেবারে সবেগে বার্ধক্যের মাঝখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি যখন ফিরিয়া পাইলেন, তখন কী জানি কেন, আর তেমন প্রফুল্ল হইতে পারিলেন

না। বহুদিন অব্যবহারে হৃদয়ের বীণাযন্ত্র বোধ করি বিকল হইয়া গিয়াছে, এখন সহস্রবার তার টানিয়া বাঁধিলেও ঢিলা হইয়া নামিয়া যায়— সে সুর আর কিছুতেই বাহির হয় না।

গ্রামের লোকেরা বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা একটা ভোজের জন্য শশিভূষণকে গিয়া ধরিল। শশিভূষণ রাধামুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী বল, ভাই।'

রাধামুকুন্দ বলিলেন, 'অবশ্য, শুভদিনে আনন্দ করিতে হইবে বৈকি।'

গ্রামে এমন ভোজ বহুকাল হয় নাই। গ্রামের ছোটোবড়ো সকলেই খাইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা এবং দুঃখীকাঙালগণ পয়সা ও কাপড় পাইয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

শীতের আরম্ভে গ্রামে তখন সময়টা খারাপ ছিল, তাহার উপরে শশিভূষণ পরিবেশনাদি বিবিধ কার্যে তিন-চারি দিন বিস্তর পরিশ্রম এবং অনিয়ম করিয়াছিলেন, তাঁহার ভগ্ন শরীরে আর সহিল না।— তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য দুরূহ উপসর্গের সহিত কম্প দিয়া জ্বর আসিল— বৈদ্য মাথা নাড়িয়া কহিল, 'বড়ো শক্ত ব্যাধি।'

রাত্রি দুই-তিন প্রহরের সময় রোগীর ঘর হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া রাধামুকুন্দ কহিলেন, 'দাদা, তোমার অবর্তমানে বিষয়ের অংশ কাহাকে কিরূপ দিব, সেই উপদেশ দিয়া যাও।'

শশিভূষণ কহিল, 'ভাই, আমার কি আছে যে কাহাকে দিব।'

রাধামুকুন্দ কহিলেন, 'সবই তো তোমার।'

শশিভূষণ উত্তর দিলেন, 'এককালে আমার ছিল, এখন আমার নহে।'

রাধামুকুন্দ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া শয্যার এক অংশের চাদর দুই হাত দিয়া বারবার সমান করিয়া দিতে লাগিল। শশিভূষণের শ্বাসক্রিয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল।

রাধামুকুন্দ তখন শয্যাপ্রান্তে উঠিয়া বসিয়া রোগীর পা-দুটি ধরিয়া কহিল, 'দাদা, আমি যে মহাপাতকের কাজ করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আর তো সময় নাই।'

শশিভূষণ কোনো উত্তর করিলেন না— রাধামুকুন্দ বলিয়া গেলেন— সেই স্বাভাবিক শান্তভাব এবং ধীরে ধীরে কথা, কেবল মাঝে মাঝে এক-একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতে লাগিল, 'দাদা, আমার ভালো করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। মনের যথার্থ যে-ভাব সে অন্তর্যামী জানেন, আর পৃথিবীতে যদি কেহ বুঝিতে পারে তো, হয়তো তুমি পারিবে। বালককাল হইতে তোমাতে আমাতে অন্তরে প্রভেদ ছিল না। কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদ ছিল— তুমি ধনী, আমি দরিদ্র। যখন দেখিলাম সেই সামান্য সূত্রে তোমাতে

আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, তখন আমি সেই প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমিই সদরখাজনা লুট করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।'

শশিভূষণ তিলমাত্র বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে রুদ্ধ উচ্চারণে কহিলেন, 'ভাই, ভালোই করিয়াছিলে। কিন্তু যেজন্য এত করিলে তাহা কি সিদ্ধ হইল। কাছে কি রাখিতে পারিলে। দয়াময় হরি!' বলিয়া প্রশান্ত মৃদু হাস্যের উপরে দুই চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রাধামুকুন্দ তাঁহার দুই পায়ের নীচে মাথা রাখিয়া কহিল, 'দাদা, মাপ করিলে তো?'

শশিভূষণ তাহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, 'ভাই, তবে শোনো। এ কথা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম। তুমি যাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে তাহারাই আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। আমি তখন হইতে তোমাকে মাপ করিয়াছি।'

রাধামুকুন্দ দুই করতলে লজ্জিত মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে কহিল, 'দাদা, মাপ যদি করিয়াছ, তবে তোমার এই সম্পত্তি তুমি গ্রহণ করো। রাগ করিয়া ফিরাইয়া দিয়ো না।'

শশিভূষণ উত্তর দিতে পারিলেন না— তখন তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছে— রাধামুকুন্দের মুখের দিকে অনিমেষে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া একবার দক্ষিণ হস্ত তুলিলেন। তাহাতে কী বুঝাইল বলিতে পারি না। বোধ করি রাধামুকুন্দ বুঝিয়া থাকিবে।

মণিহারা

সেই জীর্ণপ্রায় বাঁধাঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল। তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে।

বোটের ছাদের উপরে মাঝি নমাজ পড়িতেছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশপটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মতো আঁকা পড়িতেছিল। স্থির রেখাহীন নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাঢ় লেখায়, সোনার রঙ হইতে ইস্পাতের রঙে, এক আভা হইতে আর এক আভায় মিলাইয়া আসিতেছিল।

জানালা-ভাঙা বারান্দা-ঝুলিয়া-পড়া জরাগ্রস্ত বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে অশ্বত্থমূল-বিদারিত ঘাটের উপরে ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যাবেলায় একলা বসিয়া আমার শুষ্ক চক্ষুর কোণ ভিজিবে-ভিজিবে করিতেছে, এমন সময়ে মাথা হইতে পা পর্যন্ত হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিলাম, 'মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন।'

দেখিলাম ভদ্রলোকটি স্বল্পাহারশীর্ণ, ভাগ্যলক্ষ্মী কর্তৃক নিতান্ত অনাদৃত। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদেশী চাকরের যেমন একরকম বহুকাল-জীর্ণ সংস্কার-বিহীন চেহারা, ইঁহারও সেইরূপ। ধুতির উপরে একখানি মলিন তৈলাক্ত আসামী মটকার বোতাম খোলা চাপকান; কর্মক্ষেত্র হইতে যেন অল্পক্ষণ হইল ফিরিতেছেন। এবং যে সময় কিঞ্চিৎ জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে সময় হতভাগ্য নদীতীরে কেবল সন্ধ্যা হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

আগন্তুক সোপানপার্শ্বে আসনগ্রহণ করিলেন। আমি কহিলাম, 'আমি রাঁচি হইতে আসিতেছি।'

'কী করা হয়।'

'ব্যবসা করিয়া থাকি।'

'কী ব্যবসা।'

'হরীতকী, রেশমের গুটি এবং কাঠের ব্যবসা।'

'কী নাম।'

ঈষৎ থামিয়া একটা নাম বলিলাম। কিন্তু সে আমার নিজের নাম নহে।

ভদ্রলোকের কৌতূহলনিবৃত্তি হইল না। পুনরায় প্রশ্ন হইল, 'এখানে কী করিতে আগমন।'

আমি কহিলাম, 'বায়ুপরিবর্তন।'

লোকটি কিছু আশ্চর্য হইল। কহিল, 'মহাশয়, আজ প্রায় ছয়বৎসর ধরিয়া এখানকার বায়ু এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ গড়ে পনেরো গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন খাইতেছি কিন্তু কিছু তো ফল পাই নাই।'

আমি কহিলাম, 'এ কথা মানিতেই হইবে, রাঁচি হইতে এখানে বায়ুর যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যাইবে।'

তিনি কহিলেন, 'আজ্ঞা হাঁ, যথেষ্ট। এখানে কোথায় বাসা করিবেন।'

আমি ঘাটের উপরকার জীর্ণবাড়ি দেখাইয়া কহিলাম, 'এই বাড়িতে।'

বোধ করি লোকটির মনে সন্দেহ হইল, আমি এই পোড়ো বাড়িতে কোনো গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোনো তর্ক তুলিলেন না, কেবল আজ পনেরো বৎসর পূর্বে এই অভিশাপগ্রস্ত বাড়িতে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন।

লোকটি এখানকার ইস্কুলমাস্টার। তাঁহার ক্ষুধা ও রোগ-শীর্ণ মুখে মস্ত একটা টাকের নীচে একজোড়া বড়ো বড়ো চক্ষু আপন কোটরের ভিতর হইতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জ্বলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরেজ-কবি কোল্‌রিজের সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল।

মাঝি নমাজ পড়া সমাধা করিয়া রন্ধনকার্যে মন দিয়াছে। সন্ধ্যার শেষ আভাটুকু মিলাইয়া আসিয়া ঘাটের উপরকার জনশূন্য অন্ধকার বাড়ি আপন পূর্বাবস্থার প্রকাণ্ড প্রেতমূর্তির মতো নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল।

ইস্কুলমাস্টার কহিলেন —

আমি এই গ্রামে আসার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই বাড়িতে ফণিভূষণ সাহা বাস করিতেন। তিনি তাঁহার অপুত্রক পিতৃব্য দুর্গামোহন সাহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি জুতাসমেত সাহবের আপিসে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরেজি বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন, সুতরাং সাহেব-সওদাগরের নিকট তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনামাত্র ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত।

আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জুটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীটি ছিলেন সুন্দরী। একে

কালেজে-পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমন-কি, ব্যামো হইলে অ্যাসিস্টান্ট-সার্জনকে ডাকা হইত। অশন বসন ভূষণও এই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

মহাশয় নিশ্চয়ই বিবাহিত, অতএব এ কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, সাধারণত স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে। যে দুর্ভাগ্য পুরুষ নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত সে-যে কুশ্রী অথবা নির্ধন তাহা নহে, সে নিতান্ত নিরীহ।

যদি জিজ্ঞাসা করেন, কেন এমন হইল, আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছি। যাহার যা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চা না করিলে সে সুখী হয় না। শিঙে শান দিবার জন্য হরিণ শক্ত গাছের গুঁড়ি খোঁজে, কলাগাছে তাহার শিং ঘষিবার সুখ হয় না। নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবার বিদ্যা চর্চা করিয়া আসিতেছে। যে স্বামী আপনি বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্ত্রী-বেচারা একেবারেই বেকার, সে তাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শতলক্ষ বৎসরের শান-দেওয়া যে উজ্জ্বল বরুণাস্ত্র, অগ্নিবাণ ও নাগপাশবন্ধনগুলি পাইয়াছিল তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়।

স্ত্রীলোক পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের শক্তিতে ভালোবাসা আদায় করিয়া লইতে চায়, স্বামী যদি ভালোমানুষ হইয়া সে অবসরটুকু না দেয়, তবে স্বামীর অদৃষ্ট মন্দ এবং স্ত্রীরও ততোধিক।

নবসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাবসিদ্ধ বিধাতাদত্ত সুমহৎ বর্বরতা হারাইয়া আধুনিক দাম্পত্যসম্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। অভাগা ফণিভূষণ আধুনিক সভ্যতার কল হইতে অত্যন্ত ভালোমানুষটি হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল— ব্যবসায়েও সে সুবিধা করিতে পারিল না, দাম্পত্যেও তাহার তেমন সুযোগ ঘটে নাই।

ফণিভূষণের স্ত্রী মণিমালিকা, বিনা চেষ্টায় আদর, বিনা অশ্রুবর্ষণে ঢাকাই শাড়ি এবং বিনা দুর্জয় মানে বাজুবন্ধ লাভ করিত। এইরূপে তাহার নারীপ্রকৃতি এবং সেইসঙ্গে তাহার ভালোবাসা নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল; সে কেবল গ্রহণ করিত, কিছু দিত না। তাহার নিরীহ এবং নির্বোধ স্বামীটি মনে করিত, দানই বুঝি প্রতিদান পইিবার উপায়। একেবারে উল্‌টা বুঝিয়াছিল আর কি।

ইহার ফল হইল এই যে, স্বামীকে সে আপন ঢাকাই শাড়ি এবং বাজুবন্ধ জোগাইবার যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিত; যন্ত্রটিও এমন সুচারু যে, কোনোদিন তাহার চাকায় এক ফোঁটা তেল জোগাইবারও দরকার হয় নাই।

ফণিভূষণের জন্মস্থান ফুলবেড়ে, বাণিজ্যস্থান এখানে। কর্মানুরোধে এখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত। ফুলবেড়ে, বাড়িতে তাহার মা ছিল না, তবু পিসি মাসি

ও অন্য পাঁচজন ছিল। কিন্তু, ফণিভূষণ পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজনের উপকারার্থেই বিশেষ করিয়া সুন্দরী স্ত্রী ঘরে আনে নাই। সুতরাং স্ত্রীকে সে পাঁচজনের কাছ থেকে আনিয়া এই কুঠিতে একলা নিজের কাছেই রাখিল। কিন্তু অন্যান্য অধিকার হইতে স্ত্রী-অধিকারের প্রভেদ এই যে, স্ত্রীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশি করিয়া পাওয়া যায় তাহা নহে।

স্ত্রীটি বেশি কথাবার্তা কহিত না, পাড়াপ্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও তাহার মেলামেশা বেশি ছিল না; ব্রত উপলক্ষ করিয়া দুটো ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো বা বৈষ্ণবীকে দুটো পয়সা ভিক্ষা দেওয়া কখনো তাহার দ্বারা ঘটে নাই। তাহার হাতে কোনো জিনিস নষ্ট হয় নাই; কেবল স্বামীর আদরগুলা ছাড়া আর যাহা পাইয়াছে সমস্তই জমা করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে নিজের অপরূপ যৌবনশ্রী হইতেও যেন লেশমাত্র অপব্যয় ঘটিতে দেয় নাই। লোকে বলে, তাহার চব্বিশবৎসর বয়সের সময়ও তাহাকে চোদ্দবৎসরের মতো কাঁচা দেখিতে ছিল। যাহাদের হৃৎপিণ্ড বরফের পিণ্ড, যাহাদের বুকের মধ্যে ভালোবাসার জ্বালাযন্ত্রণা স্থান পায় না, তাহারা বোধ করি সুদীর্ঘকাল তাজা থাকে, তাহারা কৃপণের মতো অন্তরে বাহিরে আপনাকে জমাইয়া রাখিতে পারে।

ঘনপল্লবিত অতিসতেজ লতার মতো বিধাতা মণিমালিকাকে নিষ্ফলা করিয়া রাখিলেন, তাহাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন। অর্থাৎ, তাহাকে এমন একটা কিছু দিলেন না যাহাকে সে আপন লোহার সিন্দুকের মণিমাণিক্য অপেক্ষা বেশি করিয়া বুঝিতে পারে, যাহা বসন্তপ্রভাতের নবসূর্যের মতো আপন কোমল উত্তাপে তাহার হৃদয়ের বরফপিণ্ডটা গলাইয়া সংসারের উপর একটা স্নেহনির্ঝর বহাইয়া দেয়।

কিন্তু মণিমালিকা কাজকর্মে মজবুত ছিল। কখনোই সে লোকজন বেশি রাখে নাই। যে কাজ তাহার দ্বারা সাধ্য সে কাজে কেহ বেতন লইয়া যাইবে ইহা সে সহিতে পারিত না। সে কাহারও জন্য চিন্তা করিত না, কাহাকেও ভালোবাসিত না, কেবল কাজ করিত এবং জমা করিত, এইজন্য তাহার রোগ শোক তাপ কিছুই ছিল না; অপরিমিত স্বাস্থ্য, অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চীয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত।

অধিকাংশ স্বামীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট; যথেষ্ট কেন, ইহা দুর্লভ। অঙ্গের মধ্যে কটিদেশ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে তাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়ে না; গৃহের আশ্রয়স্বরূপে স্ত্রী-যে একজন আছে ভালোবাসার তাড়নায় তাহা পদে পদে এবং তাহা চব্বিশঘণ্টা অনুভব করার নাম ঘরকন্নার কোমরে ব্যথা। নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা স্ত্রীর পক্ষে গৌরবের বিষয় কিন্তু পতির পক্ষে আরামের নহে, আমার তো এইরূপ মত।

মহাশয়, স্ত্রীর ভালোবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতটুকু কম পড়িল, অতি

সূক্ষ্ম নিক্তি ধরিয়া তাহা অহরহ তৌল করিতে বসা কি পুরুষমানুষের কর্ম। স্ত্রী আপনার কাজ করুক, আমি আপনার কাজ করি, ঘরের মোটা হিসাবটা তো এই। অব্যক্তের মধ্যে কতটা ব্যক্ত, ভাবের মধ্যে কতটুকু অভাব, সুস্পষ্টের মধ্যেও কী পরিমাণ ইঙ্গিত, অণুপরমাণুর মধ্যে কতটা বিপুলতা—ভালোবাসাবাসির তত সুসূক্ষ্ম বোধশক্তি বিধাতা পুরুষমানুষকে দেন নাই, দিবার প্রয়োজন হয় নাই। পুরুষমানুষের তিলপরিমাণ অনুরাগ-বিরাগের লক্ষণ লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে। কথার মধ্য হইতে আসল ভঙ্গিটুকু এবং ভঙ্গির মধ্য হইতে আসল কথাটুকু চিরিয়া চিরিয়া চুনিয়া চুনিয়া বাহির করিতে থাকে। কারণ, পুরুষের ভালোবাসাই তাহাদের বল, তাহাদের জীবনব্যবসায়ের মূলধন। ইহারই হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সময়ে ঠিকমত পাল ঘুরাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া যায়। এইজন্যই বিধাতা ভালোবাসামানযন্ত্রটি মেয়েদের হৃদয়ের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন, পুরুষদের দেন নাই।

কিন্তু বিধাতা যাহা দেন নাই সম্প্রতি পুরুষরা সেটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। কবিরা বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া এই দুর্লভ যন্ত্রটি, এই দিগ্‌দর্শন যন্ত্রশলাকাটি নির্বিচারে সর্বসাধারণের হস্তে দিয়াছেন। বিধাতার দোষ দিই না, তিনি মেয়ে-পুরুষকে যথেষ্ট ভিন্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু সভ্যতায় সে ভেদ আর থাকে না, এখন মেয়েও পুরুষ হইতেছে, পুরুষও মেয়ে হইতেছে; সুতরাং ঘরের মধ্য হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদায় লইল। এখন শুভবিবাহের পূর্বে পুরুষকে বিবাহ করিতেছি না মেয়েকে বিবাহ করিতেছি, তাহা কোনোমতে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, বরকন্যা উভয়েরই চিত্ত আশঙ্কায় দুরু দুরু করিতে থাকে।

আপনি বিরক্ত হইতেছেন! একলা পড়িয়া থাকি, স্ত্রীর নিকট হইতে নির্বাসিত; দূর হইতে সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব মনের মধ্যে উদয় হয়— এগুলো ছাত্রদের কাছে বলিবার বিষয় নয়, কথাপ্রসঙ্গে আপনাকে বলিয়া লইলাম, চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

মোটকথাটা এই যে, যদিচ রন্ধনে নুন কম হইত না এবং পানে চুন বেশি হইত না, তথাপি ফণিভূষণের হৃদয় কী-যেন-কী নামক একটা দুঃসাধ্য উৎপাত অনুভব করিত। স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না, কোনো ভ্রম ছিল না, তবু স্বামীর কোনো সুখ ছিল না। সে তাহার সহধর্মিণীর শূন্যগহ্বর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া কেবলই হীরামুক্তার গহনা ঢালিত কিন্তু সেগুলা পড়িত গিয়া লোহার সিন্দুকে, হৃদয় শূন্যই থাকিত। খুড়া দুর্গামোহন ভালোবাসা এত সূক্ষ্ম করিয়া বুঝিত না, এত কাতর হইয়া চাহিত না, এত প্রচুর পরিমাণে দিত না, অথচ খুড়ির নিকট হইতে তাহা অজস্র পরিমাণে লাভ করিত। ব্যবসায়ী হইতে গেলে নব্যবাবু হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে পুরুষ হওয়া দরকার, এ কথায় সন্দেহমাত্র করিবেন না।

ঠিক এই সময় শৃগালগুলা নিকটবর্তী ঝোপের মধ্য হইতে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। মাস্টারমহাশয়ের গল্পস্রোতে মিনিটকয়েকের জন্য বাধা পড়িল। ঠিক মনে হইল, সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কৌতুকপ্রিয় শৃগালসম্প্রদায় ইস্কুলমাস্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শুনিয়াই হউক বা নবসভ্যতাদুর্বল ফণিভূষণের আচরণেই হউক রহিয়া রহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইয়া জলস্থল দ্বিগুণতর নিস্তব্ধ হইলে পর, মাস্টার সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু পাকাইয়া গল্প বলিতে লাগিলেন—

ফণিভূষণের জটিল এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসায়ে হঠাৎ একটা ফাঁড়া উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা কী তাহা আমার মতো অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত। মোদ্দা কথা, সহসা কী কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। যদি কেবলমাত্র পাঁচটা দিনের জন্যও সে কোথাও হইতে লাখদেড়েক টাকা বাহির করিতে পারে, বাজারে একবার বিদ্যুতের মতো এই টাকাটার চেহারা দেখাইয়া যায়, তাহা হইলেই মুহূর্তের মধ্যে সংকট উত্তীর্ণ হইয়া তাহার ব্যবসা পালভরে ছুটিয়া চলিতে পারে।

টাকাটার সুযোগ হইতেছিল না। স্থানীয় পরিচিত মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ জনরব উঠিলে তাহার ব্যবসায়ের দ্বিগুণ অনিষ্ট হইবে, আশঙ্কায় তাহাকে অপরিচিত স্থানে ঋণের চেষ্টা দেখিতে হইতেছিল। সেখানে উপযুক্ত বন্ধক না রাখিলে চলে না।

গহনা বন্ধক রাখিলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে না, চটপট এবং সহজেই কাজ হইয়া যায়।

ফণিভূষণ একবার স্ত্রীর কাছে গেল। নিজের স্ত্রীর কাছে স্বামী যেমন সহজভাবে যাইতে পারে ফণিভূষণের তেমন করিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসিত, যেমন ভালোবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে বাসে; যে ভালোবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখ ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না, যে ভালোবাসার প্রবল আকর্ষণ সূর্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ন্যায় মাঝখানে একটা অতিদূর ব্যবধান রাখিয়া দেয়।

তথাপি তেমন তেমন দায়ে পড়িলে কাব্যের নায়ককেও প্রেয়সীর নিকট হুণ্ডি এবং বন্ধক এবং হ্যাণ্ডনোটের প্রসঙ্গ তুলিতে হয়; কিন্তু সুর বাধিয়া যায়, বাক্যস্খলন হয়, এমন সকল পরিষ্কার কাজের কথার মধ্যেও ভাবে জড়িমা ও বেদনার বেপথু আসিয়া উপস্থিত হয়। হতভাগ্য ফণিভূষণ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, 'ওগো, আমার দরকার হইয়াছে, তোমার গহনাগুলো দাও।'

কথাটা বলিল, অথচ অত্যন্ত দুর্বলভাবে বলিল। মণিমালিকা যখন কঠিন মুখ করিয়া হাঁ-না কিছুই উত্তর করিল না, তখন সে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত পাইল কিন্তু আঘাত করিল না। কারণ, পুরুষোচিত বর্বরতা লেশমাত্র তাহার ছিল না। যেখানে জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া উচিত ছিল, সেখানে সে আপনার আন্তরিক ক্ষোভ পর্যন্ত চাপিয়া গেল। যেখানে ভালোবাসার একমাত্র অধিকার, সর্বনাশ হইয়া গেলেও সেখানে বলকে প্রবেশ করিতে দিবে না, এই তাহার মনের ভাব। এ সম্বন্ধে তাহাকে যদি ভর্ৎসনা করা যাইত তবে সম্ভবত সে এইরূপ সূক্ষ্ম তর্ক করিত যে, বাজারে যদি অন্যায় কারণেও আমার ক্রেডিট না থাকে তবে তাই বলিয়া বাজার লুটিয়া লইবার অধিকার আমার নাই, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাপূর্বক বিশ্বাস করিয়া আমাকে গহনা না দেয় তবে তাহা আমি কাড়িয়া লইতে পারি না। বাজারে যেমন ক্রেডিট, ঘরে তেমনি ভালোবাসা, বাহুবল কেবলমাত্র রণক্ষেত্রে। পদে পদে এইরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্কসূত্র কাটিবার জন্যই কি বিধাতা পুরুষমানুষকে এরূপ উদার, এরূপ প্রবল, এরূপ বৃহদাকার করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার কি বসিয়া বসিয়া অত্যন্ত সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে নিরতিশয় তনিমার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে, না ইহা তাহাকে শোভা পায়।

যাহা হউক, আপন উন্নত হৃদয়বৃত্তির গর্বে স্ত্রীর গহনা স্পর্শ না করিয়া ফণিভূষণ অন্য উপায়ে অর্থ-সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সংসারে সাধারণত স্ত্রীকে স্বামী যতটা চেনে স্বামীকে স্ত্রী তাহার চেয়ে অনেক বেশি চেনে; কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় তবে স্ত্রীর অণুবীক্ষণে তাহার সমস্তটা ধরা পড়ে না। আমাদের ফণিভূষণকে ফণিভূষণের স্ত্রী ঠিক বুঝিত না। স্ত্রীলোকের অশিক্ষিতপটুত্ব যে-সকল বহুকালাগত প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা গঠিত, অত্যন্ত নব্য পুরুষেরা তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। ইহারা এক রকমের! ইহারা মেয়েমানুষের মতোই রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ পুরুষমানুষের যে-কটা বড়ো বড়ো কোটা আছে, অর্থাৎ কেহ-বা বর্বর, কেহ-বা নির্বোধ, কেহ-বা অন্ধ, তাহার মধ্যে কোনোটাতেই ইহাদিগকে ঠিকমত স্থাপন করা যায় না।

সুতরাং মণিমালিকা পরামর্শের জন্য তাহার মন্ত্রীকে ডাকিল। গ্রামসম্পর্কে অথবা দূরসম্পর্কে মণিমালিকার এক ভাই ফণিভূষণের কুঠিতে গোমস্তার অধীনে কাজ করিত। তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে কাজের দ্বারা উন্নতি লাভ করে, কোনো-একটা উপলক্ষ করিয়া আত্মীয়তার জোরে বেতন এবং বেতনেরও বেশি কিছু কিছু সংগ্রহ করিত।

মণিমালিকা তাহাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল; জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন পরামর্শ কী।'

সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো মাথা নাড়িল; অর্থাৎ গতিক ভালো নহে। বুদ্ধিমানেরা কখনোই গতিক ভালো দেখে না। সে কহিল, 'বাবু কখনোই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, শেষকালে তোমার এ গহনাতে টান পড়িবেই।'

মণিমালিকা মানুষকে যেরূপ জানিত তাহাতে বুঝিল, এইরূপ হওয়াই সম্ভব এবং ইহাই সংগত। তাহার দুশ্চিন্তা সুতীব্র হইয়া উঠিল। সংসারে তাহার সন্তান নাই; স্বামী আছে বটে কিন্তু স্বামীর অস্তিত্ব সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে না, অতএব যাহা তাহার একমাত্র যত্নের ধন, যাহা তাহার ছেলের মতো ক্রমে ক্রমে বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া উঠিতেছে, যাহা রূপকমাত্র নহে, যাহা প্রকৃতই সোনা, যাহা মানিক, যাহা বক্ষের, যাহা কণ্ঠের, যাহা মাথার— সেই অনেকদিনের অনেক সাধের সামগ্রী এক মুহূর্তেই ব্যবসায়ের অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে ইহা কল্পনা করিয়া তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া আসিল। সে কহিল, 'কী করা যায়।'

মধুসূদন কহিল, 'গহনাগুলো লইয়া এইবেলা বাপের বাড়ি চলো।' গহনার কিছু অংশ, এমন-কি, অধিকাংশই যে তাহার ভাগে আসিবে বুদ্ধিমান মধু মনে মনে তাহার উপায় ঠাহরাইল।

মণিমালিকা এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

আষাঢ়শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। ঘনমেঘাচ্ছন্ন প্রত্যূষে নিবিড় অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের কলরবের মধ্যে একখানি মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল। মধুসূদন নৌকার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কহিল, 'গহনার বাক্সটা আমার কাছে দাও।' মণি কহিল, 'সে পরে হইবে, এখন নৌকা খুলিয়া দাও।'

নৌকা খুলিয়া দিল, খরস্রোতে হুহু করিয়া ভাসিয়া গেল।

মণিমালিকা সমস্ত রাত ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত গহনা সর্বাঙ্গ ভরিয়া পরিয়াছে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত আর স্থান ছিল না। বাক্সে করিয়া গহনা লইলে সে বাক্স হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে, এ আশঙ্কা তাহার ছিল। কিন্তু, গায়ে পরিয়া গেলে তাহাকে না বধ করিয়া সে গহনা কেহ লইতে পারিবে না।

সঙ্গে কোনোপ্রকার বাক্স না দেখিয়া মধুসূদন কিছু বুঝিতে পারিল না, মোটা চাদরের নীচে যে মণিমালিকার দেহপ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে দেহপ্রাণের অধিক গহনাগুলি আচ্ছন্ন ছিল তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই! মণিমালিকা ফণিভূষণকে বুঝিত না বটে, কিন্তু মধুসূদনকে চিনিতে তাহার বাকি ছিল না।

মধুসূদন গোমস্তার কাছে একখানা চিঠি রাখিয়া গেল যে, সে কর্ত্রীকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিতে রওনা হইল। গোমস্তা ফণিভূষণের বাপের আমলের; সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হ্রস্ব-ইকারকে দীর্ঘ-ঈকার এবং দন্ত্য-সকে তালব্য-শ করিয়া মনিবকে এক পত্র লিখিল, ভালো বাংলা লিখিল না কিন্তু স্ত্রীকে অযথা প্রশ্রয় দেওয়া যে পুরুষোচিত নহে এ কথাটা ঠিকমতই প্রকাশ করিল।

ফণিভূষণ মণিমালিকার মনের কথাটা ঠিক বুঝিল। তাহার মনে এই আঘাতটা প্রবল হইল যে, 'আমি গুরুতর ক্ষতিসম্ভাবনা সত্ত্বেও স্ত্রীর অলংকার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তবু আমাকে সন্দেহ। আমাকে আজিও চিনিল না।'

নিজের প্রতি যে নিদারুণ অন্যায়ে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, ফণিভূষণ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইল মাত্র। পুরুষমানুষ বিধাতার ন্যায়দণ্ড, তাহার মধ্যে তিনি বজ্রাগ্নি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অন্যায়ের সংঘর্ষে সে যদি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে না পারে তবে ধিক্ তাহাকে। পুরুষমানুষ দাবাগ্নির মতো রাগিয়া উঠিবে সামান্য কারণে, আর স্ত্রীলোক শ্রাবণমেঘের মতো অশ্রুপাত করিতে থাকিবে বিনা উপলক্ষে বিধাতা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আর টেঁকে না।

ফণিভূষণ অপরাধিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল, 'এই যদি তোমার বিচার হয় তবে এইরূপই হউক, আমার কর্তব্য আমি করিয়া যাইব।' আরো শতাব্দী-পাঁচছয় পরে যখন কেবল অধ্যাত্মশক্তিতে জগৎ চলিবে তখন যাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবী যুগের ফণিভূষণ উনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই আদিযুগের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে শাস্ত্রে যাহার বুদ্ধিকে প্রলয়ংকরী বলিয়া থাকে। ফণিভূষণ স্ত্রীকে এক-অক্ষর পত্র লিখিল না এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এ সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে কখনো সে কোনো কথার উল্লেখ করিবে না। কী ভীষণ দণ্ডবিধি!

দিনদশেক পরে কোনোমতে যথোপযুক্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপদুত্তীর্ণ ফণিভূষণ বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানিত, বাপের বাড়িতে গহনাপত্র রাখিয়া এতদিনে মণিমালিকা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। সেদিনকার দীন প্রার্থীভাব ত্যাগ করিয়া কৃতকার্য কৃতীপুরুষ স্ত্রীর কাছে দেখা দিলে মণি যে কিরূপ লজ্জিত এবং অনাবশ্যক প্রয়াসের জন্য কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত হইবে, ইহাই কল্পনা করিতে করিতে ফণিভূষণ অন্তঃপুরে শয়নাগারের দ্বারের কাছে আসিয়া উপনীত হইল।

দেখিল, দ্বার রুদ্ধ। তালা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। কোণে লোহার সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে,' তাহাতে গহনাপত্রের চিহ্নমাত্র নাই।

স্বামীর বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল। মনে হইল, সংসার উদ্দেশ্যহীন

এবং ভালোবাসা ও বাণিজ্যব্যবসা সমস্তই ব্যর্থ। আমরা এই সংসারপিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকার উপরে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতরে পাখি নাই, রাখিলেও সে থাকে না। তবে অহরহ হৃদয়খনির রক্তমানিক ও অশ্রুজলের মুক্তামালা দিয়া কী সাজাইতে বসিয়াছি। এই চিরজীবনের সর্বস্বজড়ানো শূন্য সংসার-খাঁচাটা ফণিভূষণ মনে মনে পদাঘাত করিয়া অতিদূরে ফেলিয়া দিল।

ফণিভূষণ স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনোরূপ চেষ্টা করিতে চাহিল না। মনে করিল, যদি ইচ্ছা হয় তো ফিরিয়া আসিবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোমস্তা আসিয়া কহিল, 'চুপ করিয়া থাকিলে কী হইবে, কর্ত্রীবধূর খবর লওয়া চাই তো।' এই বলিয়া মণিমালিকার পিত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া দিল। সেখান হইতে খবর আসিল, মণি অথবা মধু এ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছে নাই।

তখন চারি দিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। নদীতীরে-তীরে প্রশ্ন করিতে করিতে লোক ছুটিল। মধুর তল্লাস করিতে পুলিসে খবর দেওয়া হইল— কোন্ নৌকা নৌকার মাঝি কে, কোন্ পথে তাহারা কোথায় চলিয়া গেল, তাহার কোনো সন্ধান মিলিল না।

সর্বপ্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন ফণিভূষণ সন্ধ্যাকালে তাহার পরিত্যক্ত শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেদিন জন্মাষ্টমী, সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে, সেখানে আটচালার মধ্যে বারোয়ারির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। মুষলধারায় বৃষ্টিপাতশব্দে যাত্রার গানের সুর মৃদুতর হইয়া কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। ঐ-যে বাতায়নের উপরে শিথিলকব্জা দরজাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে ঐখানে ফণিভূষণ অন্ধকারে একলা বসিয়াছিল—বাদলার হাওয়া, বৃষ্টির ছাট এবং যাত্রার গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, কোনো খেয়ালই ছিল না। ঘরের দেওয়ালে আর্ট স্টুডিয়ো-রচিত লক্ষ্মীসরস্বতীর এক জোড়া ছবি টাঙানো; আলনার উপরে একটি গামছা ও তোয়ালে, একটি চুড়িপেড়ে ও একটি ডুরে শাড়ি সদ্যব্যবহারযোগ্যভাবে পাকানো ঝুলানো রহিয়াছে। ঘরের কোণে টিপাইয়ের উপরে পিতলের ডিবায় মণিমালিকার স্বহস্তরচিত গুটিকতক পান শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে। কাচের আলমারির মধ্যে তাহার আবাল্যসঞ্চিত চীনের পুতুল, এসেন্সের শিশি, রঙিন কাচের ডিক্যান্টার; শৌখিন তাস, সমুদ্রের বড়ো বড়ো কড়ি, এমন-কি, শূন্য সাবানের বাক্সগুলি পর্যন্ত অতি পরিপাটি করিয়া সাজানো; যে অতিক্ষুদ্র গোলকবিশিষ্ট ছোটো শখের কেরোসিন-ল্যাম্প সে নিজে প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে জ্বালাইয়া কুলুঙ্গিটির উপর রাখিয়া দিত তাহা যথাস্থানে নির্বাপিত এবং ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেবল সেই ক্ষুদ্র ল্যাম্পটি এই শয়কক্ষে মণিমালিকার শেষমুহূর্তের নিরুত্তর সাক্ষী; সমস্ত শূন্য করিয়া যে চলিয়া যায়, সেও এত চিহ্ন, এত ইতিহাস, সমস্ত জড়সামগ্রীর উপর আপন সজীব হৃদয়ের এত স্নেহস্বাক্ষর রাখিয়া যায়! এসো মণিমালিকা, এসো, তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও, তোমার ঘরটি তুমি আলো করো, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া

তোমার যত্নকুঞ্চিত শাড়িটি তুমি পরো, তোমার জিনিষগুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কাছ হইতে কেহ কিছু প্রত্যাশা করে না, কেবল তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন তোমার অম্লান সৌন্দর্য লইয়া চারি দিকের এই-সকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড়-সামগ্রীরাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখো; এই-সকল মূক প্রাণহীন পদার্থের অব্যক্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে।

গভীর রাত্রে কখন একসময়ে বৃষ্টির ধারা এবং যাত্রার গান থামিয়া গেছে। ফণিভূষণ জানলার কাছে যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া আছে। বাতায়নের বাহিরে এমন একটা জগদ্‌ব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকার যে তাহার মনে হইতেছিল, যেন সম্মুখে যমালয়ের একটা অভ্রভেদী সিংহদ্বার, যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চিরকালের লুপ্ত জিনিস অচিরকালের মতো একবার দেখা দিতেও পারে। এই মসীকৃষ্ণ মৃত্যুর পটে, এই অতি কঠিন নিকষ-পাষাণের উপর সেই হারানো সোনার একটি রেখা পড়িতেও পারে।

এমন সময় একটা ঠকঠক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝমঝম শব্দ শোনা গেল। ঠিক মনে হইল, শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। তখন নদীর জল এবং রাত্রির অন্ধকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। পুলকিত ফণিভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল— স্ফীত হৃদয় এবং ব্যগ্র দৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছুই দেখা গেল না। দেখিবার চেষ্টা যতই একান্ত বাড়িয়া উঠিল অন্ধকার ততই যেন ঘনীভূত, জগৎ ততই যেন ছায়াবৎ হইয়া আসিল। প্রকৃতি নিশীথরাত্রে আপন মৃত্যুনিকেতনের গবাক্ষদ্বারে অকস্মাৎ অতিথিসমাগম দেখিয়া দ্রুত হস্তে আরো একটা বেশি করিয়া পর্দা ফেলিয়া দিল।

শব্দটা ক্রমে ঘাটের সর্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্ধ করিয়া দরোয়ান যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তখন সেই রুদ্ধ দ্বারের উপর ঠকঠক ঝমঝম করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল, যেন অলংকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত জিনিস দ্বারের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। নির্বাণদীপ কক্ষগুলি পার হইয়া, অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রুদ্ধ দ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার বাহির হইতে তালাবন্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপণে দুই হাতে সেই দ্বার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল, সে নিদ্রিত অবস্থায় উপর হইতে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্বশরীর ঘর্মাক্ত, হাত পা বরফের মতো ঠাণ্ডা এবং হৃৎপিণ্ড নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো স্ফুরিত হইতেছে। স্বপ্ন ভাঙিয়া দেখিল, বাহিরে আর কোনো শব্দ নাই, কেবল শ্রাবণের ধারা তখনো ঝরঝর শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া শুনা যাইতেছিল, যাত্রার ছেলেরা ভোরের সুরে তান ধরিয়াছে।

যদিচ ব্যাপারটা সমস্তই স্বপ্ন কিন্তু এত অধিক নিকটবর্তী এবং সত্যবৎ যে ফণিভূষণের মনে হইল, যেন অতি অল্পের জন্যই সে তাহার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার আশ্চর্য সফলতা হইতে বঞ্চিত হইল। সেই জলপতনশব্দের সহিত দূরাগত ভৈরবীর তান তাহাকে বলিতে লাগিল, এই জাগরণই স্বপ্ন, এই জগৎই মিথ্যা।

তাহার পরদিনেও যাত্রা ছিল এবং দরোয়ানেরও ছুটি ছিল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, আজ সমস্ত রাত্রি যেন দেউড়ির দরজা খোলা থাকে। দরোয়ান কহিল, মেলা উপলক্ষে নানা দেশ হইতে নানাপ্রকারের লোক আসিয়াছে, দরজা খোলা রাখিতে সাহস হয় না। ফণিভূষণ সে কথা মানিল না। দরোয়ান কহিল, তবে আমি সমস্ত রাত্রি হাজির থাকিয়া পাহারা দিব।' ফণিভূষণ কহিল, 'সে হইবে না, তোমাকে যাত্রা শুনিতে যাইতেই হইবে।' দরোয়ান আশ্চর্য হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় দীপ নিবাইয়া দিয়া ফণিভূষণ তাহার শয়নকক্ষের সেই বাতায়নে আসিয়া বসিল। আকাশে অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘ এবং চতুর্দিকে কোনো-একটি অনির্দিষ্ট আসন্নপ্রতীক্ষার নিস্তব্ধতা। ভেকের অশ্রান্ত কলরব এবং যাত্রার গানের চিৎকারধ্বনি সেই স্তব্ধতা ভাঙিতে পারে নাই, কেবল তাহার মধ্যে একটা অসংগত অদ্ভুতরস বিস্তার করিতেছিল।

অনেকরাত্রে একসময়ে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলে ছেলেরা চুপ করিয়া গেল এবং রাত্রের অন্ধকারের উপরে আরো একটা কিসের অন্ধকার আসিয়া পড়িল। বুঝা গেল, এইবার সময় আসিয়াছে।

পূর্বদিনের মতো নদীর ঘাটে একটা ঠকঠক এবং ঝমঝম শব্দ উঠিল। কিন্তু, ফণিভূষণ সে দিকে চোখ ফিরাইল না। তাহার ভয় হইল, পাছে অধীর ইচ্ছা এবং অশান্ত চেষ্টায় তাহার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। পাছে আগ্রহের বেগ তাহার ইন্দ্রিয়শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সে আপনার সকল চেষ্টা নিজের মনকে দমন করিবার জন্য প্রয়োগ করিল, কাঠের মূর্তির মতো শক্ত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শিঞ্জিত শব্দ আজ ঘাট হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মুক্ত দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিল। শুনা গেল, অন্দর মহলের গোলসিঁড়ি দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শব্দ উপরে উঠিতেছে। ফণিভূষণ আপনাকে আর দমন করিতে পারে না, তাহার বক্ষ তুফানের ডিঙির মতো আছাড় খাইতে লাগিল এবং নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। গোলসিঁড়ি শেষ করিয়া সেই শব্দ বারান্দা দিয়া ক্রমে ঘরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক সেই শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া খটখট এবং ঝমঝম থামিয়া গেল। কেবল চৌকাঠটি পার হইলেই হয়।

ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহার রুদ্ধ আবেগ এক মুহূর্তে প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; সে বিদ্যুদ্‌বেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চিৎকার করিয়া

উঠিল, 'মণি!' অমনি সচকিত হইয়া জাগিয়া দেখিল, তাহারই সেই ব্যাকুল কণ্ঠের চিৎকারে ঘরের শাসিগুলা পর্যন্ত ধ্বনিত স্পন্দিত হইতেছে। বাহিরে সেই ভেকের কলরব এবং যাত্রার ছেলেদের ক্লিষ্ট কণ্ঠের গান।

ফণিভূষণ নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল।

পরদিন মেলা ভাঙিয়া গেছে। দোকানি এবং যাত্রার দল চলিয়া গেল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, সেইদিন সন্ধ্যার পর তাহার বাড়িতে সে নিজে ছাড়া আর কেহই থাকিবে না। চাকরেরা স্থির করিল, বাবু তান্ত্রিকমতে একটা কী সাধনে নিযুক্ত আছেন। ফণিভূষণ সমস্তদিন উপবাস করিয়া রহিল।

জনশূন্য বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ফণিভূষণ বাতায়নতলে আসিয়া বসিল। সেদিন আকাশের স্থানে স্থানে মেঘ ছিল না, এবং ধৌত নির্মল বাতাসের মধ্য দিয়া নক্ষত্রগুলিকে অত্যুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চাঁদ উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। মেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে পরিপূর্ণ নদীতে নৌকা মাত্রই ছিল না এবং উৎসবজাগরণক্লান্ত গ্রাম দুইরাত্রি জাগরণের পর আজ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

ফণিভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের উপর মাথা উর্ধ্বমুখ করিয়া তারা দেখিতেছিল; ভাবিতেছিল, একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কালেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোলদিঘির তৃণশয়নে চিত হইয়া, হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঐ অনন্তকালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্তী শ্বশুরবাড়ির একটি বিরলকক্ষে চোদ্দবৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি, তখনকার সেই বিরহ কী সুমধুর, তখনকার সেই তারাগুলির আলোকস্পন্দন হৃদয়ের যৌবনস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কী বিচিত্র 'বসন্তরাগেণ যতিতালাভ্যাং' বাজিয়া বাজিয়া উঠিত! আজ সেই একই তারা আগুন দিয়া আকাশে মোহমুদ্গরের শ্লোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে; বলিতেছে, সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ!

দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নীচেকার পল্লবের মতো একত্র আসিয়া মিলিত হইল। আজ ফণিভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল। সে নিশ্চয় জানিত, আজ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবে।

পূর্বরাত্রির মতো সেই শব্দ নদীর জলের মধ্য হইতে ঘাটের সোপানের উপর উঠিল। ফণিভূষণ দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্থির দৃঢ়চিত্তে ধ্যানাসনে বসিল। শব্দ দ্বারীশূন্য দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, শব্দ জনশূন্য অন্তঃপুরের গোলসিঁড়ির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে

লাগিল, শব্দ দীর্ঘ বারান্দা পার হইল এবং শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য থামিল।

ফণিভূষণের হৃদয় ব্যাকুল এবং সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে চক্ষু খুলিল না। শব্দ চৌকাঠ পার হইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আলনায় যেখানে শাড়ি কোঁচানো আছে, কুলুঙ্গিতে যেখানে কেরোসিনের দীপ দাঁড়াইয়া, টিপাইয়ের ধারে যেখানে পানে বাটায় পান শুষ্ক, এবং সেই বিচিত্রসামগ্রীপূর্ণ আলমারির কাছে প্রত্যেক জায়গায় এক-একবার করিয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।

তখন ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল, ঘরে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া। সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কণ্ঠি, মাথায় সিঁথি, তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক-একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝকঝক করিতেছে। অলংকারগুলি ঢিলা, ঢলঢল করিতেছে, কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর, তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব; সেই কালো তারা, সেই ঘনদীর্ঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা, সেই অবিচলিত দৃঢ়শান্ত দৃষ্টি। আজ আঠারো বৎসর পূর্বে একদিন আলোকিত সভাগৃহে নহবতের সাহানা আলাপের মধ্যে ফণিভূষণ যে দুটি আয়তসুন্দর কালো-কালো ঢলঢল চোখ শুভদৃষ্টিতে প্রথম দেখিয়াছিল সেই দুটি চক্ষুই আজ শ্রাবণের অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চন্দ্রকিরণে দেখিল; দেখিয়া তাহার সর্বশরীরে রক্ত হিম হইয়া আসিল। প্রাণপণে দুই চক্ষু বুজিতে চেষ্টা করিল, কিছুতেই পারিল না; তাহার চক্ষু মৃত মানুষের চক্ষুর মতো নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল।

তখন সেই কঙ্কাল স্তম্ভিত ফণিভূষণের মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া নীরবে অঙ্গুলিসংকেতে ডাকিল। তাহার চার আঙুলের অস্থিতে হীরার আংটি ঝকঝম করিয়া উঠিল।

ফণিভূষণ মূঢ়ের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল। কঙ্কাল দ্বারের অভিমুখে চলিল; হাড়েতে হাড়েতে গহনায় গহনায় কঠিন শব্দ হইতে লাগিল। ফণিভূষণ পাশবদ্ধ পুত্তলীর মতো তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বারান্দা পার হইল, নিবিড় অন্ধকার গোলসিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া খটখট ঠকঠক ঝমঝম করিতে করিতে নিচে উত্তীর্ণ হইল। নীচেকার বারান্দা পার হইয়া জনশূন্য দীপহীন দেউড়িতে প্রবেশ করিল। অবশেষে দেউড়ি পার হইয়া ইঁটের-খোয়া-দেওয়া বাগানের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। খোয়াগুলি অস্থিপাতে কড়কড় করিতে লাগিল। সেখানে ক্ষীণ জ্যোৎস্না ঘন ডালপালার মধ্যে আটক খাইয়া কোথাও নিষ্কৃতির

পথ পাইতেছিল না; সেই বর্ষার নিবিড়গন্ধ অন্ধকার ছায়াপথে জোনাকির ঝাঁকের মধ্য দিয়া উভয়ে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘাটের যে ধাপ বাহিয়া শব্দ উপরে উঠিয়াছিল সেই ধাপ দিয়া অলংকৃত কঙ্কাল তাহার আন্দোলনহীন ঋজুগতিতে কঠিন শব্দ করিয়া এক-পা এক-পা নামিতে লাগিল। পরিপূর্ণ বর্ষানদীর প্রবলস্রোত জলের উপর জ্যোৎস্নার একটি দীর্ঘরেখা ঝিকঝিক করিতেছে।

কঙ্কাল নদীতে নামিল, অনুবর্তী ফণিভূষণও জলে পা দিল। জলস্পর্শ করিবামাত্র ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সম্মুখে আর তাহার পথপ্রদর্শক নাই, কেবল নদীর পরপারে গাছগুলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাকভাবে চাহিয়া আছে। আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া শিহরিয়া স্খলিতপদে ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল। যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়ু তাহার বশ মানিল না, স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহূর্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শে সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।

গল্প শেষ করিয়া ইস্কুলমাস্টার খানিকক্ষণ থামিলেন। হঠাৎ থামিবামাত্র বোঝা গেল, তিনি ছাড়া ইতিমধ্যে জগতের আর-সকলই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। অনেকক্ষণ আমি একটি কথাও বলিলাম না, এবং অন্ধকারে তিনি আমার মুখের ভাবও দেখিতে পাইলেন না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি এ গল্প বিশ্বাস করিলেন না।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন।'

তিনি কহিলেন, 'না। কেন করি না তাহার কয়েকটি যুক্তি দিতেছি। প্রথমত প্রকৃতিঠাকুরানী উপন্যাসলেখিকা নহেন, তাঁহার হাতে বিস্তর কাজ আছে—'

আমি কহিলাম, 'দ্বিতীয়ত, আমারই নাম শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সাহা।'

ইস্কুলমাস্টার কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন, 'আমি তাহা হইলে ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম; আপনার স্ত্রীর নাম কী ছিল।'

আমি কহিলাম, 'নৃত্যকালী।'

মাল্যদান

সকালবেলায় শীত-শীত ছিল। দুপুরবেলায় বাতাসটি অল্প-একটু তাতিয়া উঠিয়া দক্ষিণ দিক হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যতীন যে বারান্দায় বসিয়া ছিল সেখান হইতে বাগানের এক কোণে একদিকে একটি কাঁঠাল ও আর-এক দিকে একটি শিরীষগাছের মাঝখানের ফাঁক দিয়া বাহিরের মাঠ চোখে পড়ে। সেই শূন্য মাঠ ফাল্গুনের রৌদ্রে ধুধু করিতেছিল। তাহারই এক প্রান্ত দিয়া কাঁচা পথ চলিয়া গেছে— সেই পথ বহিয়া বোঝাই-খালাস গোরুর গাড়ি মন্দগমনে গ্রামের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে, গাড়োয়ান মাথায় গামছা ফেলিয়া অত্যন্ত বেকারভাবে গান গাহিতেছে।

এমন সময় পশ্চাতে একটি সহাস্য নারীকণ্ঠ বলিয়া উঠিল, 'কী যতীন, পূর্বজন্মের কারও কথা ভাবিতেছ বুঝি।'

যতীন কহিল, 'কেন পটল, আমি এমনিই কি হতভাগা যে, ভাবিতে হইলেই পূর্বজন্ম লইয়া টান পাড়িতে হয়।'

আত্মীয়সমাজে 'পটল' নামে খ্যাত এই মেয়েটি বলিয়া উঠিল, 'আর মিথ্যা বড়াই করিতে হইবে না। তোমার ইহজন্মের সব খবরই তো রাখি, মশায়। ছি ছি, এত বয়স হইল, তবু একটা সামন্য বউও ঘরে আনিতে পারিলে না। আমাদের ঐ-যে ধনা মালীটা, ওরও একটা বউ আছে— তার সঙ্গে দুই বেলা ঝগড়া করিয়া সে পাড়াসুদ্ধ লোককে জানাইয়া দেয় যে, বউ আছে বটে। আর তুমি যে মাঠের দিকে তাকাইয়া ভান করিতেছ, যেন কার চাঁদমুখ ধ্যান করিতে বসিয়াছ, এ-সমস্ত চালাকি আমি কি বুঝি না— ও কেবল লোক দেখাইবার ভড়ং মাত্র। দেখো যতীন, চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না— আমাদের ঐ ধনাটা তো কোনোদিন বিরহের ছুতা করিয়া মাঠের দিকে অমন তাকাইয়া থাকে না; অতিবড়ো বিচ্ছেদের দিনেও গাছের তলায় নিড়ানি হাতে উহাকে দিন কাটাইতে দেখিয়াছি— কিন্তু উহার চোখে তো অমন ঘোর-ঘোর ভাব দেখি নাই। আর তুমি মশায়, সাতজন্ম বউয়ের মুখ দেখিলে না— কেবল হাসপাতালে মড়া কাটিয়া ও পড়া মুখস্থ করিয়া বয়স পার করিয়া দিলে, তুমি অমনতরো দুপুরবেলা আকাশের দিকে গদ্‌গদ হইয়া তাকাইয়া থাক কেন। না, এ-সমস্ত বাজে চালাকি আমার ভালো লাগে না। আমার গা জ্বালা করে।'

যতীন হাতজোড় করিয়া কহিল: 'থাক্ থাক্, আর নয়। আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না। তোমাদের ধনাই ধন্য। উহারই আদর্শে আমি চলিতে চেষ্টা করিব। আর কথা নয়, কাল সকালে উঠিয়াই যে কাঠকুড়ানি মেয়ের মুখ দেখিব, তাহার গলায় মালা দিব— ধিক্কার আমার আর সহ্য হইতেছে না।'

পটল। তবে এই কথা রহিল?

যতীন। হাঁ, রহিল।

পটল। তবে এসো।

যতীন। কোথায় যাইব।

পটল। এসোই-না।

যতীন। না না, একটা কী দুষ্টুমি তোমার মাথায় আসিয়াছে। আমি এখন নড়িতেছি না।

পটল। আচ্ছা, তবে এইখানেই বোসো।— বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

পরিচয় দেওয়া যাক। যতীন এবং পটলের বয়সের একদিন মাত্র তারতম্য। পটল যতীনের চেয়ে একদিনের বড়ো বলিয়া যতীন তাহার প্রতি কোনোপ্রকার সামাজিক সম্মান দেখাইতে নারাজ। উভয়ে খুড়তুতো-জাঠতুতো ভাইবোন। বরাবর একত্রে খেলা করিয়া আসিয়াছে। 'দিদি' বলে না বলিয়া পটল যতীনের নামে বাল্যকালে বাপ-খুড়ার কাছে অনেক নালিশ করিয়াছে, কিন্তু কোনো শাসনবিধির দ্বারা কোনো ফল পায় নাই— একটিমাত্র ছোটো ভাইয়ের কাছেও তাহার পটল-নাম ঘুচিল না।

পটল দিব্য মোটাসোটা গোলগাল, প্রফুল্লতার রসে পরিপূর্ণ। তাহার কৌতুকহাস্য দমন করিয়া রাখে, সমাজে এমন কোনো শক্তি ছিল না। শাশুড়ির কাছেও সে কোনোদিন গাম্ভীর্য অবলম্বন করিতে পারে না। প্রথম-প্রথম তা লইয়া অনেক কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু, শেষকালে সকলকেই হার মানিয়া বলিতে হইল— ওর ঐ রকম। তার পরে এমন হইল যে, পটলের দুর্নিবার প্রফুল্লতার আঘাতে গুরুজনদের গাম্ভীর্য ধূলিসাৎ হইয়া গেল। পটল তাহার আশেপাশে কোনোখানে মন-ভার মুখ-ভার দুশ্চিন্তা সহিতে পারিত না— অজস্র গল্প-হাসি-ঠাট্টায় তাহার চারি দিকের হাওয়া যেন বিদ্যুৎ-শক্তিতে বোঝাই হইয়া থাকিত।

পটলের স্বামী হরকুমারবাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট— বেহার-অঞ্চল হইতে বদলি হইয়া কলিকাতার আবকারি-বিভাগে স্থান পাইয়াছেন। প্লেগের ভয়ে বালিতে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া লইয়া থাকেন, সেখান হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করেন। আবকারি-পরিদর্শনে প্রায়ই তাঁহাকে মফস্বলে ফিরিতে হইবে বলিয়া দেশ হইতে মা এবং অন্য দুই-একজন

আত্মীয়কে আনিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ডাক্তারিতে নূতন-উত্তীর্ণ পসারপ্রতিপত্তিহীন যতীন বোনের নিমন্ত্রণে হপ্তাখানেকের জন্য এখানে আসিয়াছে।

কলিকাতার গলি হইতে প্রথম দিন গাছপালার মধ্যে আসিয়া যতীন ছায়াময় নির্জন বারান্দায় ফাল্গুন-মধ্যাহ্নের রসালস্যে আবিষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল, এমন সময়ে পূর্বকথিত সেই উপদ্রব আরম্ভ হইল। পটল চলিয়া গেলে, আবার খানিকক্ষণের জন্য সে নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া বেশ আরাম করিয়া বসিল— কাঠকুড়ানি মেয়ের প্রসঙ্গে ছেলেবেলাকার রূপকথার অলিগলির মধ্যে তাহার মন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমন সময় আবার পটলের হাসিমাখা কণ্ঠের কাকলিতে সে চমকিয়া উঠিল।

পটল আর-একটি মেয়ের হাত ধরিয়া সবেগে টানিয়া আনিয়া যতীনের সম্মুখে স্থাপন করিল; কহিল, 'ও কুড়ানি।'

মেয়েটি কহিল, 'কী দিদি।'

পটল। আমার এই ভাইটি কেমন দেখ্ দেখি।

মেয়েটি অসংকোচে যতীনকে দেখিতে লাগিল। পটল কহিল, 'কেমন, ভালো দেখিতে না?'

মেয়েটি গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'হাঁ ভালো।'

যতীন লাল হইয়া চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, 'আঃ পটল, কী ছেলেমানুষি করিতেছ।'

পটল। আমি ছেলেমানুষি করি, না তুমি বুড়োমানুষি কর! তোমার বুঝি বয়সের গাছপাথর নাই!

যতীন পলায়ন করিল। পটল তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে ছুটিতে কহিল, 'ও যতীন, তোমার ভয় নাই, তোমার ভয় নাই। এখনি তোমার মালা দিতে হইবে না— ফাল্গুন-চৈত্রে লগ্ন নাই— এখনো হাতে সময় আছে।'

পটল যাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে, সেই মেয়েটি অবাক হইয়া রহিল। তাহার বয়স ষোলো হইবে, শরীর ছিপ্‌ছিপে— মুখশ্রী সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই, কেবল মুখে এই একটি অসামান্যতা আছে যে দেখিলে যেন বনের হরিণের ভাব মনে আসে। কঠিন ভাষায় তাহাকে নির্বুদ্ধি বলা যাইতেও পারে— কিন্তু তাহা বোকামি নহে, তাহা বুদ্ধিবৃত্তির অপরিস্ফুরণমাত্র, তাহাতে কুড়ানির মুখের সৌন্দর্য নষ্ট না করিয়া বরঞ্চ একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় হরকুমারবাবু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যতীনকে দেখিয়া কহিলেন,

'এই যে, যতীন আসিয়াছ, ভালোই হইয়াছে। তোমাকে একটু ডাকতারি করিতে হইবে। পশ্চিমে থাকিতে দুর্ভিক্ষের সময় আমরা একটি মেয়েকে লইয়া মানুষ করিতেছি— পটল তাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে। উহার বাপ-মা এবং ঐ মেয়েটি আমাদের বাংলার কাছেই একটি গাছতলায় পড়িয়া ছিল। যখন খবর পাইয়া গেলাম, গিয়া দেখি, উহার বাপ-মা মরিয়াছে, মেয়টির প্রাণটুকু আছে মাত্র। পটল তাহাকে অনেক যত্নে বাঁচাইয়াছে। উহার জাতের কথা কেহ জানে না— তাহা লইয়া কেহ আপত্তি করিলেই পটল বলে, 'ও তো দ্বিজ; একবার মরিয়া এবার আমাদের ঘরে জন্মিয়াছে, উহার সাবেক জাত কোথায় ঘুচিয়া গেছে।' প্রথমে মেয়েটি পটলকে মা বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছিল; পটল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'খবরদার, আমাকে মা বলিস নে— আমাকে দিদি বলিস।' পটল বলে, 'অতবড়ো মেয়ে মা বলিলে নিজেকে বুড়ি বলিয়া মনে হইবে যে।' বোধ করি সেই দুর্ভিক্ষের উপবাসে বা আর-কোনো কারণে উহার থাকিয়া-থাকিয়া শূলবেদনার মতো হয়। ব্যাপারখানা কী তোমাকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ওরে তুলসী, কুড়ানিকে ডাকিয়া আন্ তো।'

কুড়ানি চুল বাঁধিতে বাঁধিতে অসম্পূর্ণ বেণী পিঠের উপরে দুলাইয়া হরকুমারবাবুর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হরিণের মতো চোখদুটি দুজনের উপর রাখিয়া সে চাহিয়া রহিল।

যতীন ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া হরকুমার তাহাকে কহিলেন, 'বৃথা সংকোচ করিতেছ, যতীন। উহাকে দেখিতে মস্ত ডাগর, কিন্তু কচি ডাবের মতো উহার ভিতরে কেবল জল ছলছল করিতেছে— এখনো শাঁসের রেখা মাত্র দেখা দেয় নাই। ও কিছুই বোঝে না— উহাকে তুমি নারী বলিয়া ভ্রম করিয়ো না, ও বনের হরিণী।'

যতীন তাহার ডাক্তারি কর্তব্য সাধন করিতে লাগিল— কুড়ানি কিছুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করিল না। যতীন কহিল, 'শরীরযন্ত্রের কোনো বিকার তো বোঝা গেল না।'

পটল ফস করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'হৃদয়যন্ত্রেরও কোনো বিকার ঘটে নাই। তার পরীক্ষা দেখিতে চাও?'

বলিয়া কুড়ানির কাছে গিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল, 'ও কুড়ানি, আমার এই ভাইটিকে তোর পছন্দ হইয়াছে?'

কুড়ানি মাথা হেলাইয়া কহিল, 'হাঁ'।

পটল কহিল, 'আমার ভাইকে তুই বিয়ে করবি?'

সে আবার মাথা হেলাইয়া কহিল, 'হাঁ।'

পটল এবং হরকুমারবাবু হাসিয়া উঠিলেন। কুড়ানি কৌতুকের মর্ম না বুঝিয়া তাঁহাদের অনুকরণে মুখখানি হাসিতে ভরিয়া চাহিয়া রহিল।

যতীন লাল হইয়া উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, 'আঃ পটল, তুমি বাড়াবাড়ি করিতেছ— ভারি অন্যায়। হরকুমারবাবু, আপনি পটলকে বড়ো বেশি প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।'

হরকুমার কহিলেন, 'নহিলে আমিও যে উঁহার কাছে প্রশ্রয় প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু যতীন, কুড়ানিকে তুমি জান না বলিয়াই অত ব্যস্ত হইতেছ। তুমি লজ্জা করিয়া কুড়ানিকে সুদ্ধ লজ্জা করিতে শিখাইবে দেখিতেছি। উহাকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল তুমি খাওয়াইয়ো না। সকলে উহাকে লইয়া কৌতুক করিয়াছে— তুমি যদি মাঝের থেকে গাম্ভীর্য দেখাও, তবে সেটা উহার পক্ষে একটা অসংগত ব্যাপার হইবে।'

পটল। ঐজন্যই তো যতীনের সঙ্গে আমার কোনোকালেই বনিল না। ছেলেবেলা থেকে কেবলই ঝগড়া চলিতেছে— ও বড়ো গম্ভীর।

হরকুমার। ঝগড়া করাটা বুঝি এমনি করিয়া একেবারে অভ্যাস হইয়া গেছে— ভাই সরিয়া পড়িয়াছেন, এখন —

পটল। ফের মিথ্যা কথা। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সুখ নাই— আমি চেষ্টাও করি না।

হরকুমার। আমি গোড়াতেই হার মানিয়া যাই।

পটল। বড়ো কমই কর। গোড়ায় হার না মানিয়া শেষে হার মানিলে কত খুশি হইতাম।

রাত্রে শোবার ঘরের জানলা-দরজা খুলিয়া দিয়া যতীন অনেক কথা ভাবিল। যে মেয়ে আপনার বাপ-মাকে না খাইতে পাইয়া মরিতে দেখিয়াছে, তাহার জীবনের উপর কী ভীষণ ছায়া পড়িয়াছে। এই নিদারুণ ব্যাপারে সে কত বড়ো হইয়া উঠিয়াছে— তাহাকে লইয়া কি কৌতুক করা যায়। বিধাতা দয়া করিয়া তাহার বুদ্ধিবৃত্তির উপরে একটা আবরণ ফেলিয়া দিয়াছেন— এই আবরণ যদি উঠিয়া যায় তবে অদৃষ্টের রুদ্রলীলার কী ভীষণ চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে। আজ মধ্যাহ্নে গাছের ফাঁক দিয়া যতীন যখন ফাল্গুনের আকাশ দেখিতেছিল, দূর হইতে কাঁঠালমুকুলের গন্ধ মৃদুতর হইয়া তাহার ঘ্রাণকে আবিষ্ট করিয়া ধরিতেছিল, তখন তাহার মনটা মাধুর্যের কুহেলিকায় সমস্ত জগৎটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিয়াছিল— ঐ বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার হরিণের মতো চোখ-দুটি লইয়া সেই সোনালি কুহেলিকা অপসারিত করিয়া দিয়াছে; ফাল্গুনের এই কুঞ্জন-গুঞ্জন-মর্মরের পশ্চাতে যে সংসার ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর দুঃখকঠিন দেহ লইয়া বিরাট মূর্তিতে দাঁড়াইয়া আছে, উদঘাটিত যবনিকার শিল্পমাধুর্যের অন্তরালে সে দেখা দিল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় কুড়ানির সেই বেদনা ধরিল। পটল তাড়াতাড়ি যতীনকে ডাকিয়া পাঠাইল। যতীন আসিয়া দেখিল, কষ্টে কুড়ানির হাতে পায়ে খিল ধরিতেছে, শরীর আড়ষ্ট। যতীন ঔষধ আনিতে পাঠাইয়া বোতল করিয়া গরম জল আনিতে হুকুম করিল। পটল কহিল, 'ভারি মস্ত ডাক্তার হইয়াছ, পায়ে একটু গরম তেল মালিশ করিয়া দাও-না। দেখিতেছ না, পায়ের তেলো হিম হইয়া গেছে।

যতীন রোগিণীর পায়ের তলায় গরম তেল সবেগে ঘষিয়া দিতে লাগিল। চিকিৎসা-ব্যাপারে রাত্রি অনেক হইল। হরকুমার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বার বার কুড়ানির খবর লইতে লাগিলেন। যতীন বুঝিল, সন্ধ্যাবেলায় কর্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়া পটল-অভাবে হরকুমারের অবস্থা অচল হইয়া উঠিয়াছে— ঘন ঘন কুড়ানির খবর লইবার তাৎপর্য তাই। যতীন কহিল, 'হরকুমারবাবু ছটফট করিতেছেন, তুমি যাও পটল।

পটল কহিল, 'পরের দোহাই দিবে বৈকি। ছটফট কে করিতেছে তা বুঝিয়াছি। আমি গেলেই এখন তুমি বাঁচ। এ দিকে কথায় কথায় লজ্জায় মুখচোখ লাল হইয়া উঠে— তোমার পেটে যে এত ছিল, তা কে বুঝিবে।'

যতীন। আচ্ছা, দোহাই তোমার, তুমি এইখানেই থাকো। রক্ষা করো—তোমার মুখ বন্ধ হইলে বাঁচি। আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম— হরকুমারবাবু বোধ হয় শান্তিতে আছেন, এরকম সুযোগ তাঁর সর্বদা ঘটে না।

কুড়ানি আরাম পাইয়া যখন চোখ খুলিল পটল কহিল, 'তোর চোখ খোলাইবার জন্য তোর বর যে আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া তোকে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছে— আজ তাই বুঝি এত দেরি করিলি। ছি ছি, ওঁর পায়ের ধূলা নে।'

কুড়ানি কর্তব্যবোধে তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে যতীনের পায়ের ধূলা লইল। যতীন দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয় গেল।

তাহার পরদিন হইতে যতীনের উপরে রীতিমত উপদ্রব আরম্ভ হইল। যতীন খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় কুড়ানি আসিয়া অম্লানবদনে পাখা দিয়া তাহার মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। যতীন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'থাক থাক, কাজ নাই।' কুড়ানি এই নিষেধে বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্‌বর্তী ঘরের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল— তাহার পরে আবার পুনশ্চ পাখা দোলাইতে লাগিল। যতীন অন্তরালবর্তিনীর উদ্দেশে বলিয়া উঠিল, 'পটল, তুমি যদি এমন করিয়া আমাকে জ্বালাও তবে আমি খাইব না— আমি এই উঠিলাম।'

বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিল। যতীন বালিকার বুদ্ধিহীন মুখে তীব্র বেদনার রেখা দেখিতে পাইল; তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইয়া সে পুনর্বার

বসিয়া পড়িল। কুড়ানি যে কিছু বোঝে না, সে যে লজ্জা পায় না, বেদনা বোধ করে না, এ কথা যতীনও বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আজ চকিতের মধ্যে দেখিল, সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে, এবং ব্যতিক্রম কখন হঠাৎ ঘটে আগে হইতে তাহা কেহই বলিতে পারে না। কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে যতীন বারান্দায় বসিয়া আছে, গাছপালার মধ্যে কোকিল অত্যন্ত ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়াছে, আমের বোলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত— এমন সময় সে দেখিল, কুড়ানি চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া যেন একটু ইতস্তত করিতেছে। তাহার হরিণের মতো চক্ষে একটা সকরুণ ভয় ছিল— সে চা লইয়া গেলে যতীন বিরক্ত হইবে কি না ইহা যেন সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যতীন ব্যথিত হইয়া উঠিয়া অগ্রসর হইয়া তাহার হাত হইতে পেয়ালা লইল। এই মানবজন্মের হরিণশিশুটিকে তুচ্ছ কারণে কি বেদনা দেওয়া যায়। যতীন যেমনি পেয়ালা লইল অমনি দেখিল, বারান্দার অপর প্রান্তে পটল সহসা আবির্ভূত হইয়া নিঃশব্দহাস্যে যতীনকে কিল দেখাইল, ভাবটা এই যে, 'কেমন ধরা পড়িয়াছ।'

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যতীন একখানি ডাক্তারি কাগজ পড়িতেছিল, এমন সময় ফুলের গন্ধে চকিত হইয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়ানি বকুলের মালা হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যতীন মনে মনে কহিল, 'বড়োই বাড়াবাড়ি হইতেছে— পটলের এই নিষ্ঠুর আমোদের আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় না।' কুড়ানিকে বলিল, 'ছি ছি কুড়ানি, তোমাকে লইয়া তোমার দিদি আমোদ করিতেছেন, তুমি বুঝিতে পার না।'

কথা শেষ করিতে না করিতেই কুড়ানি ত্রস্ত-সংকুচিত-ভাবে প্রস্থানের উপক্রম করিল। যতীন তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিয়া কহিল, 'কুড়ানি, দেখি তোমার মালা দেখি।' বলিয়া মালাটি তাহার হাত হইতে লইল। কুড়ানির মুখে একটি আনন্দের উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠিল, অন্তরাল হইতে সেই মুহূর্তে একটি উচ্চহাস্যের উচ্ছ্বাসধ্বনি শুনা গেল।

পরদিন সকালে উপদ্রব করিবার জন্য পটল যতীনের ঘরে গিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। একখানি কাগজে কেবল লেখা আছে— 'পালাইলাম। শ্রীযতীন।'

'ও কুড়ানি, তোর বর যে পালাইল। তাহাকে রাখিতে পারিলি নে!' বলিয়া কুড়ানির বেণী ধরিয়া নাড়া দিয়া পটল ঘরকন্নার কাজে চলিয়া গেল।

কথাটা বুঝিতে কুড়ানির একটু সময় গেল। সে ছবির মতো দাঁড়াইয়া স্থিরদৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে যতীনের ঘরে আসিয়া দেখিল, তাহার ঘর খালি। তার পূর্বসন্ধ্যার উপহারের মালাটা টেবিলের উপর পড়িয়া আছে।

বসন্তের প্রাতঃকালটি স্নিগ্ধসুন্দর; রৌদ্রটি কম্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখার ভিতর দিয়া

ছায়ার সহিত মিশিয়া বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কাঠবিড়ালি লেজ পিঠে তুলিয়া ছুটাছুটি করিতেছে এবং সকল পাখি মিলিয়া নানা সুরে গান গাহিয়া তাহাদের বক্তব্য বিষয় কিছুতেই শেষ করিতে পারিতেছে না। পৃথিবীর এই কোণটুকুতে, এই খানিকটা ঘনপল্লব ছায়া এবং রৌদ্ররচিত জগৎখণ্ডের মধ্যে প্রাণের আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছিল; তাহারই মাঝখানে ঐ বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার জীবনের, তাহার চারি দিকের সংগত কোনো অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সমস্তই কঠিন প্রহেলিকা। কী হইল, কেন এমন হইল, তার পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই যাহা-কিছু সমস্তই এমন একেবারে শূন্য হইয়া গেল কেন। যাহার বুঝিবার সামর্থ্য অল্প তাহাকে হঠাৎ একদিন নিজ হৃদয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোনো প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামহিয়া দিল। জগতের এই সহজ-উচ্ছ্বসিত প্রাণের রাজ্যে এই গাছপালা-মৃগপক্ষীর আত্মবিস্মৃত কলরব-মধ্যে কে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারিবে।

পটল ঘরকন্নার কাজ সারিয়া কুড়ানির সন্ধান লইতে আসিয়া দেখিল, সে যতীনের পরিত্যক্ত ঘরে তাহার খাটের খুরা ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে— শূন্য শয্যাটাকে যেন পায়ে ধরিয়া সাধিতেছে। তাহার বুকের ভিতরে যে একটি সুধার পাত্র লুকানো ছিল সেইটে যেন শূন্যতার চরণে বৃথা আশ্বাসে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছে— ভূমিতলে পুঞ্জীভূত সেই স্খলিতকেশা লুণ্ঠিতবসনা নারী যেন নীরব একাগ্রতার ভাষায় বলিতেছে, 'লও, লও, আমাকে লও। ওগো, আমাকে লও।'

পটল বিস্মিত হইয়া কহিল, 'ও কী হইতেছে, কুড়ানি।'

কুড়ানি উঠিল না; সে যেমন পড়িয়া ছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। পটল কাছে আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতেই সে উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পটল তখন চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'ও পোড়ারমুখি সর্বনাশ করিয়াছিস। মরিয়াছিস!'

হরকুমারকে পটল কুড়ানির অবস্থা জানাইয়া কহিল, 'এ কী বিপদ ঘটিল। তুমি কী করিতেছিলে, তুমি আমাকে কেন বারণ করিলে না।'

হরকুমার কহিল, 'তোমাকে বারণ করা যে আমার কোনোকালে অভ্যাস নাই। বারণ করিলেই কি ফল পাওয়া যাইত।'

পটল। তুমি কেমন স্বামী? আমি যদি ভুল করি, তুমি আমাকে জোর করিয়া থামাইতে পার না? আমাকে তুমি এ খেলা খেলিতে দিলে কেন।

এই বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া ভূপতিতা বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'লক্ষ্মী বোন আমার, তোর কী বলিবার আছে, আমাকে খুলিয়া বল্।'

হায়, কুড়ানির এমন কী ভাষা আছে যে, আপনার হৃদয়ের অব্যক্ত রহস্য সে কথা দিয়া বলিতে পারে। সে একটি অনির্বচনীয় বেদনার উপর তাহার সমস্ত বুক দিয়া চাপিয়া পড়িয়া আছে— সে বেদনাটা কী, জগতে এমন আর কাহারও হয় কি না, তাহাকে লোকে কী বলিয়া থাকে, কুড়ানি তাহার কিছুই জানে না। সে কেবল কান্না দিয়া বলিতে পারে, মনের কথা জানাইবার তাহার আর কোনো উপায় নাই।

পটল কহিল, 'কুড়ানি, তোর দিদি বড়ো দুষ্টু; কিন্তু তার কথা যে তুই এমন করিয়া বিশ্বাস করিবি, তা সে কখনো মনেও করে নি। তার কথা কেহ কখনো বিশ্বাস করে না; তুই এমন ভুল কেন করিলি। কুড়ানি একবার মুখ তুলিয়া তোর দিদির মুখের দিকে চা; তাকে মাপ কর্।'

কিন্তু কুড়ানির মন তখন বিমুখ হইয়া গিয়াছিল, সে কোনোমতেই পটলের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না; সে আরো জোর করিয়া হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া রহিল। সে ভালো করিয়া সমস্ত কথা না বুঝিয়াও একপ্রকার মূঢ়ভাবে পটলের প্রতি রাগ করিয়াছিল। পটল তখন ধীরে ধীরে বাহুপাশ খুলিয়া লইয়া উঠিয়া গেল— এবং জানালার ধারে পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ফাল্গুনের রৌদ্রচিক্কণ সুপারিগাছের পল্লবশ্রেণীর দিকে চাহিয়া পটলের দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

পরদিন কুড়ানির আর দেখা পাওয়া গেল না। পটল তাহাকে আদর করিয়া ভালো ভালো গহনা এবং কাপড় দিয়া সাজাইত। নিজে সে এলোমেলো ছিল, নিজের সাজ সম্বন্ধে তাহার কোনো যত্ন ছিল না, কিন্তু সাজগোজের সমস্ত শখ কুড়ানির উপর দিয়াই সে মিটাইয়া লইত। বহুকালসঞ্চিত সেই-সমস্ত বসনভূষণ কুড়ানির ঘরের মেজের উপর পড়িয়া আছে। তাহার হাতের বালাচুড়ি, নাসাগ্রের লবঙ্গফুলটি পর্যন্ত সে খুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। তাহার পটলদিদির এতদিনের সমস্ত আদর সে যেন গা হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে।

হরকুমারবাবু কুড়ানির সন্ধানে পুলিসে খবর দিলেন। সেবারে প্লেগ-দমনের বিভীষিকায় এত লোক এত দিকে পলায়ন করিতেছিল যে, সেই-সকল পলাতকদলের মধ্যে হইতে একটি বিশেষ লোককে বাছিয়া লওয়া পুলিসের পক্ষে শক্ত হইল। হরকুমারবাবু দুই-চারি বার ভুল লোকের সন্ধানে অনেক দুঃখ এবং লজ্জা পাইয়া কুড়ানির আশা পরিত্যাগ করিলেন। অজ্ঞাতের কোল হইতে তাঁহারা যাহাকে পাইয়াছিলেন অজ্ঞাতের কোলের মধ্যেই সে আবার লুকাইয়া পড়িল।

যতীন বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেবার প্লেগ-হাসপাতালে ডাক্তারি-পদ গ্রহণ করিয়াছিল। একদিন দুপুরবেলায় বাসায় আহার সারিয়া হাসপাতালে আসিয়া সে শুনিল, হাসপাতালের স্ত্রী-বিভাগে একটি নূতন রোগিনী আসিয়াছে। পুলিস তাহাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে।

যতীন তাহাকে দেখিতে গেল। মেয়েটির মুখের অধিকাংশ চাদরে ঢাকা ছিল। যতীন প্রথমেই তাহার হাত তুলিয়া নাড়ী দেখিল। নাড়ীতে জ্বর অধিক নাই, কিন্তু দুর্বলতা অত্যন্ত। তখন পরীক্ষার জন্য মুখের চাদর সরাইয়া দেখিল, সেই কুড়ানি।

ইতিমধ্যে পটলের কাছ হইতে যতীন কুড়ানির সমস্ত বিবরণ জানিয়াছিল। অব্যক্ত হৃদয়ভাবের দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন তাহার সেই হরিণচক্ষু-দুটি কাজের অবকাশে যতীনের ধ্যানদৃষ্টির উপরে কেবলই অশ্রুহীন কাতরতা বিকীর্ণ করিয়াছে। আজ সেই রোগনিমীলিত চক্ষুর সুদীর্ঘ পল্লব কুড়ানির শীর্ণ কপোলের উপরে কালিমার রেখা টানিয়াছে; দেখিবামাত্র যতীনের বুকের ভিতরটা হঠাৎ কে যেন চাপিয়া ধরিল। এই একটি মেয়েকে বিধাতা এত যত্নে ফুলের মতো সুকুমার করিয়া গড়িয়া দুর্ভিক্ষ হইতে মারীর মধ্যে ভাসাইয়া দিলেন কেন। আজ এই-যে পেলব প্রাণটি ক্লিষ্ট হইয়া বিছানার উপরে পড়িয়া আছে, ইহার এই অল্প কয়দিনের আয়ুর মধ্যে এত বিপদের আঘাত, এত বেদনার ভার সহিল কী করিয়া, ধরিল কোথায়। যতীনই বা ইহার জীবনের মাঝখানে তৃতীয় আর-একটি সংকটের মতো কোথা হইতে আসিয়া জড়াইয়া পড়িল। রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস যতীনের বক্ষোদ্বারে আঘাত করিতে লাগিল— কিন্তু সেই আঘাতের তাড়নায় তাহার হৃদয়ের তারে একটা সুখের মীড়ও বাজিয়া উঠিল। যে ভালোবাসা জগতে দুর্লভ, যতীন তাহা না চাহিতেই, ফাল্গুনের একটি মধ্যাহ্নে একটি পূর্ণবিকশিত মাধবীমঞ্জরীর মতো অকস্মাৎ তার পায়ের কাছে আপনি আসিয়া খসিয়া পড়িয়াছে। যে ভালোবাসা এমন করিয়া মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত আসিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়ে, পৃথিবীতে কোন্ লোক সেই দেবভোগ্য নৈবেদ্যলাভের অধিকারী।

যতীন কুড়ানির পাশে বসিয়া তাহাকে অল্প অল্প গরম দুধ খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। খাইতে খাইতে অনেকক্ষণ পরে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিল। যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে সুদূর স্বপ্নের মতো যেন মনে করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। যতীন যখন তাহার কপালে হাত রাখিয়া একটুখানি নাড়া দিয়া কহিল, 'কুড়ানি'— তখন তাহার অজ্ঞানের শেষ ঘোরটুকু হঠাৎ ভাঙিয়া গেল— যতীনকে সে চিনিল এবং তখনি তাহার চোখের উপরে বাষ্পকোমল আর-একটি মোহের আবরণ পড়িল। প্রথম-মেঘ-সমাগমে সুগম্ভীর আষাঢ়ের আকাশের মতো কুড়ানির কালো চোখ-দুটির উপর একটি যেন সুদূরব্যাপী সজলস্নিগ্ধতা ঘনাইয়া আসিল।

যতীন সকরুণ যত্নের সহিত কহিল, 'কুড়ানি, এই দুধটুকু শেষ করিয়া ফেলো।'

কুড়ানি একটু উঠিয়া বসিয়া পেয়ালার উপর হইতে যতীনের মুখে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া সেই দুধটুকু ধীরে ধীরে খাইয়া ফেলিল।

হাসপাতালের ডাক্তার একটিমাত্র রোগীর পাশে সমস্তক্ষণ বসিয়া থাকিলে কাজও চলে না, দেখিতেও ভালো হয় না। অন্যত্র কর্তব্য সারিবার জন্য যতীন যখন উঠিল

তখন ভয়ে ও নৈরাশ্যে কুড়ানির চোখ-দুটি ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যতীন তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, 'আমি আবার এখনি আসিব কুড়ানি, তোমার কোনো ভয় নাই।'

যতীন কর্তৃপক্ষদিগকে জানাইল যে, এই নূতন-আনীত রোগিণীর প্লেগ হয় নাই, সে না খাইয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখানে অন্য প্লেগরোগীর সঙ্গে থাকিলে তাহার পক্ষে বিপদ ঘটিতে পারে।

বিশেষ চেষ্টা করিয়া যতীন কুড়ানিকে অন্যত্র লইয়া যাইবার অনুমতি লাভ করিল এবং নিজের বাসায় লইয়া গেল। পটলকে সমস্ত খবর দিয়া একখানি চিঠিও লিখিয়া দিল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় রোগী এবং চিকিৎসক ছাড়া ঘরে আর কেহ ছিল না। শিয়রের কাছে রঙিন কাগজের আবরণে ঘেরা একটি কেরোসিন ল্যাম্প ছায়াচ্ছন্ন মৃদু আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল— ব্র্যাকেটের উপরে একটা ঘড়ি নিস্তব্ধ ঘরে টিকটিক শব্দে দোলক দোলাইতেছিল।

যতীন কুড়ানির কপালে হাত দিয়া কহিল, 'তুমি কেমন বোধ করিতেছ, কুড়ানি।'

কুড়ানি তাহার কোনো উত্তর না করিয়া যতীনের হাতটি আপনার কপালেই চাপিয়া রাখিয়া দিল।

যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'ভালো বোধ হইতেছে?'

কুড়ানি একটুখানি চোখ বুজিয়া কহিল, 'হাঁ।'

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার গলায় এটা কী, কুড়ানি।'

কুড়ানি তাড়াতাড়ি কাপড়টা টানিয়া তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিল। যতীন দেখিল, সে একগাছি শুকনো বকুলের মালা। তখন তাহার মনে পড়িল, সে মালাটা কী। ঘড়ির টিকটিক শব্দের মধ্যে যতীন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কুড়ানির এই প্রথম লুকাইবার চেষ্টা— নিজের হৃদয়ের ভাব গোপন করিবার এই তাহার প্রথম প্রয়াস। কুড়ানি মৃগশিশু ছিল, সে কখন হৃদয়ভারাতুরা যুবতী নারী হইয়া উঠিল। কোন্ রৌদ্রের আলোকে কোন্ রৌদ্রের উত্তাপে তাহার বুদ্ধির উপরকার সমস্ত কুয়াশা কাটিয়া গিয়া তাহার লজ্জা, তাহার শঙ্কা, তাহার বেদনা এমন হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

রাত্রি দুটা-আড়াইটার সময় যতীন চৌকিতে বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ দ্বার খোলার শব্দে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, পটল এবং হরকুমারবাবু এক বড়ো ব্যাগ হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হরকুমার কহিলেন, 'তোমার চিঠি পাইয়া কাল সকালে আসিব বলিয়া বিছানায় শুইলাম। অর্ধেক রাত্রে পটল কহিল, 'ওগো, কাল সকালে গেলে কুড়ানিকে দেখিতে পাইব না— আমাকে এখনি যাইতে হইবে।' পটলকে কিছুতেই বুঝাইয়া রাখা গেল না, তখনি একটা গাড়ি করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি।'

পটল হরকুমারকে কহিল, 'চলো, তুমি যতীনের বিছানায় শোবে চলো।'

হরকুমার ঈষৎ আপত্তির আড়ম্বর করিয়া যতীনের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন, তাঁহার নিদ্রা যাইতেও দেরি হইল না।

পটল ফিরিয়া আসিয়া যতীনকে ঘরের এক কোণে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আশা আছে?'

যতীন কুড়ানির কাছে আসিয়া নাড়ী দেখিয়া মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে, আশা নাই।

পটল কুড়ানির কাছে আপনাকে প্রকাশ না করিয়া যতীনকে আড়ালে লইয়া কহিল, 'যতীন, সত্য বলো তুমি কি কুড়ানিকে ভালোবাস না।'

যতীন পটলকে কোনো উত্তর না দিয়া কুড়ানির বিছানার পাশে আসিয়া বসিল। তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল, 'কুড়ানি, কুড়ানি।'

কুড়ানি চোখ মেলিয়া মুখে একটি শান্ত মধুর হাসির আভাসমাত্র আনিয়া কহিল, 'কী দাদাবাবু।'

যতীন কহিল, 'কুড়ানি, তোমার এই মালাটি আমার গলায় পরাইয়া দাও।'

কুড়ানি অনিমেষ অবুঝ চোখে যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন কহিল, 'তোমার মালা আমাকে দিবে না?'

যতীনের এই আদরের প্রশ্রয়টুকু পাইয়া কুড়ানির মনে পূর্বকৃত অনাদরের একটুখানি অভিমান জাগিয়া উঠিল। সে কহিল, 'কী হবে, দাদাবাবু।'

যতীন দুই হাতে তাহার হাত লইয়া কহিল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, কুড়ানি।'

শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য কুড়ানি স্তব্ধ রহিল; তাহার পরে তাহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল। যতীন বিছানার পাশে নামিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল, কুড়ানির হাতের কাছে মাথা নত করিয়া রাখিল। কুড়ানি গলা হইতে মালা খুলিয়া যতীনের গলায় পরাইয়া দিল।

তখন পটল তাহার কাছে আসিয়া ডাকিল, 'কুড়ানি।'

কুড়ানি তাহার শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, 'কী দিদি।'

পটল তাহার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, 'আমার উপর তোর আর কোনো রাগ নাই বোন?'

কুড়ানি স্নিগ্ধকোমলদৃষ্টিতে কহিল, 'না, দিদি।'

পটল কহিল, 'যতীন, একবার তুমি ও ঘরে যাও।'

যতীন পাশের ঘরে গেলে পটল ব্যাগ খুলিয়া কুড়ানির সমস্ত কাপড়-গহনা তাহার মধ্য হইতে বাহির করিল। রোগিণীকে অধিক নাড়াচাড়া না করিয়া একখানা বেনারসি শাড়ি সন্তর্পণে তাহার মলিন বস্ত্রের উপর জড়াইয়া দিল। পরে একে একে এক এক গাছি চুড়ি তাহার হাতে দিয়া দুই হাতে দুই বালা পরাইয়া দিল। তার পরে ডাকিল, 'যতীন।'

যতীন আসিতেই তাহাকে বিছানায় বসাইয়া পটল তাহার হাতে কুড়ানির একছড়া সোনার হার দিল। যতীন সেই হারছড়াটি লইয়া আস্তে আস্তে কুড়ানির মাথা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল।

ভোরের আলো যখন কুড়ানির মুখের উপরে আসিয়া পড়িল তখন সে আলো সে আর দেখিল না। তাহার অম্লান মুখকান্তি দেখিয়া মনে হইল, সে মরে নাই— কিন্তু সে যেন একটি অতলস্পর্শ সুখস্বপ্নের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেছে।

যখন মৃতদেহ লইয়া যাইবার সময় হইল তখন পটল কুড়ানির বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল; 'বোন, তোর ভাগ্য ভালো। জীবনের চেয়ে তোর মরণ সুখের।'

যতীন কুড়ানির সেই শান্তস্নিগ্ধ মৃত্যুচ্ছবির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, 'যাঁহার ধন তিনিই নিলেন, আমাকেও বঞ্চিত করিলেন না।'

বলাই

মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা নানা জীবজন্তুর প্রচ্ছন্ন পরিচয় পেয়ে থাকি, সে কথা জানা। বস্তুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক করে নিয়েছে— আমাদের বাঘ-গোরুকে এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে পুরে, অহি-নকুলকে এক খাঁচায় ধরে রেখেছে। যেমন রাগিণী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সমুদয় সা-রে-গা-মা-গুলোকে সংগীত করে তোলে, তারপর থেকে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না। কিন্তু, সংগীতের ভিতরে এক-একটি সুর অন্য-সকল সুরকে ছাড়িয়ে বিশেষ হয়ে ওঠে— কোনোটাতে মধ্যম, কোনোটাতে কোমলগান্ধার, কোনোটাতে পঞ্চম।

আমার ভাইপো বলাই— তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, নড়ে-চড়ে বেড়ানো নয়। পুবদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে; ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেলবেলাকার রোদ্দুর পড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায়; সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী একটা সংগ্রহ করে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে; ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চার দিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভরে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা ব'সে ব'সে আপন মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে, যা-কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে। অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে একজোড়া অতি পুরানো পাখি, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, তাদের গল্প। ঐ ড্যাবা-ড্যাবা-চোখ-মেলে-সর্বদাতাকিয়ে-থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়। ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সবুজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে পর্যন্ত নেবে গিয়েছে, সেইটে দেখে আর ওর মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে। ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না; ওর বোধ হয়, যেন ঐ ঘাসের পুঞ্জ একটা গড়িয়ে-চলা খেলা, কেবলই গড়াচ্ছে; প্রায়ই তারই সেই

ঢালু বেয়ে ও নিজেও গড়াত— সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত— গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি লাগত আর ও খিলখিল করে হেসে উঠত।

রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনা রঙের রোদ্দুর দেবদারুবনের উপরে এসে পড়ে— ও কাউকে না বলে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই দেবদারুবনের নিস্তব্ধ ছায়াতলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছমছম করে—এই-সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায়। তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা-সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, 'এক যে ছিল রাজা'দের আমলের।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়, অনেক সময় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কী খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কোঁকড়ানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠছে এই দেখতে তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে প'ড়ে প'ড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, 'তার পরে? তার পরে? তার পরে?' তারা ওর চির-অসমাপ্ত গল্প। সদ্য গজিয়ে-ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী যে একটা বয়স্যভাব তা ও কেমন করে প্রকাশ করবে। তারাও ওকে কী একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে, 'তোমার নাম কী।' হয়তো বলে, 'তোমার মা কোথায় গেল।' বলাই মনে মনে উত্তর করে, 'আমার মা তো নেই।'

কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে বুঝেছে। এইজন্যে ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আমলকী পাড়ে, ও কিছু বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দু পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস্ ক'রে বকুলগাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়— ওর কাঁদতে লজ্জা করে পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সব চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে বেড়িয়েছে— এতটুকু-টুকু লতা, বেগনি হলদে নামহারা ফুল, অতি ছোটো ছোটো; মাঝে মাঝে কন্টিকারি গাছ, তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও-বা কালমেঘের লতা, কোথাও-বা অনন্তমূল; পাখিতে-খাওয়া নিমফলের বিচি প'ড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা— সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়নি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই।

এক-একদিন ওর কাকির কোলে এসে ব'সে তার গলা জড়িয়ে বলে, 'ঐ ঘাসিয়াড়াকে বলো-না, আমার ঐ গাছগুলো যেন না কাটে।'

কাকি বলে, 'বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস। ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন।'

বলাই অনেক দিন থেকে বুঝতে পেরেছিল, কতকগুলো ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই— ওর চার দিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে, যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে— সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চার দিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে, দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রান্তরে, তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ বলে বলে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধরে দ্যুলোককে দোহন করে পৃথিবীর অমৃতভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত করে তোলে, 'আমি থাকব।' সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন-একরকম করে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ঐ বলাই। আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলুম।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে ব্যস্ত করে ধরে নিয়ে গেল বাগানে। এক জায়গায় একটা চারা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কাকা, এ গাছটা কী।'

দেখলুম একটা শিমুলগাছের চারা বাগানের খোয়া-দেওয়া রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে।

হায় রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে। এতটুকু যখন এর অঙ্কুর বেরিয়েছিল, শিশুর প্রথম প্রলাপটুকুর মতো, তখনই এটা বলাইয়ের চোখে পড়েছে। তার পর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু জল দিয়েছে, সকালে বিকেলে ক্রমাগতই ব্যগ্র হয়ে দেখেছে কতটুকু বাড়ল। শিমুলগাছ বাড়েও দ্রুত, কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। যখন হাত-দুয়েক উঁচু হয়েছে তখন ওর পত্রসমৃদ্ধি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশুর প্রথম বুদ্ধির আভাস দেখবা-মাত্র মা যেমন মনে করে আশ্চর্য শিশু। বলাই ভাবলে, আমাকেও চমৎকৃত করে দেবে।

আমি বললুম, 'মালীকে বলতে হবে, এটা উপড়ে ফেলে দেবে।'

বলাই চমকে উঠল। এ কী দারুণ কথা। বললে, 'না, কাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপড়ে ফেলো না।'

আমি বললুম, 'কী যে বলিস তার ঠিক নেই। একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে। বড়ো হলে চার দিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে।'

আমার সঙ্গে যখন পারলে না, এই মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কাকির কাছে। কোলে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'কাকি, তুমি কাকাকে বারণ করে দাও, গাছটা যেন না কাটেন।'

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল। ওর কাকি আমাকে ডেকে বললে, 'ওগো, শুনছ! আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।

রেখে দিলুম। গোড়ায় বলাই না যদি দেখাত তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হত না। কিন্তু, এখন রোজই চোখে পড়ে। বছরখানেকের মধ্যে গাছটা নির্লজ্জের মতো মস্ত বেড়ে উঠল। বলাইয়ের এমন হল, এই গাছটার 'পরেই তার সব চেয়ে স্নেহ।

গাছটাকে প্রতিদিন দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বোধের মতো। একটা অজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে কাউকে খাতির নেই, একেবারে খাড়া লম্বা হয়ে উঠছে। যে দেখে সেই ভাবে, এটা এখানে কী করতে। আরো দু-চারবার এর মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করা গেল। বলাইকে লোভ দেখালুম, এর বদলে খুব ভালো কতকগুলো গোলাপের চারা আনিয়ে দেব।

বললেম, 'নিতান্তই শিমুলগাছই যদি তোমার পছন্দ, তবে আর-একটা চারা আনিয়ে বেড়ার ধারে পুঁতে দেব, সুন্দর দেখতে হবে।'

কিন্তু কাটবার কথা বললেই বলাই আঁতকে ওঠে, আর ওর কাকি বলে, 'আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হয়েছে।'

আমার বউদিদির মৃত্যু হয়েছে যখন এই ছেলেটি তাঁর কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেয়াল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকির কোলেই মানুষ। বছর-দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলাতি কায়দায় শিক্ষা দেবেন বলে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিমলেয়— তার পরে বিলেত নিয়ে যাবার কথা।

কাঁদতে কাঁদতে কাকির কোল ছেড়ে বলাই চলে গেল, আমাদের ঘর হল শূন্য।

তার পরে দু বছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের শূন্য শোবার ঘরে গিয়ে তার ছেঁড়া একপাটি জুতো, তার রবারের ফাটা গোলা, আর জানোয়ারের গল্পওয়ালা ছবির বই নাড়েন-চাড়েন; এতদিনে এই-সব চিহ্নকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলাই অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে, এই কথা বসে বসে চিন্তা করেন।

কোনো এক সময়ে দেখলুম, লক্ষ্মীছাড়া শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে— এতদূর অসংগত হয়ে উঠেছে যে, আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এক সময়ে দিলুম তাকে কেটে।

এমন সময়ে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, 'কাকি আমার সেই শিমুলগাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।'

বিলেত যাবার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।

তার কাকি আমাকে ডেকে বললেন, 'ওগো শুনছ, একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো।'

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেন।'

বলাইয়ের কাঁচা হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন।

আমি বললেন, 'সে গাছ তো কাটা হয়ে গেছে।'

বলাইয়ের কাকি দুদিন অন্ন গ্রহণ করলেন না, আর অনেক দিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও কন নি। বলাইয়ের বাবা তাঁর কোল থেকে নিয়ে গেল, সে যেন ওঁর নাড়ি ছিঁড়ে; আর ওর কাকা তাঁর বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ওঁর যেন সমস্ত সংসারকে বাজল, তাঁর বুকের মধ্যে ক্ষত করে দিলে।

ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের প্রতিরূপ, তারই প্রাণের দোসর।

প্রথম চিঠি

বধূর সঙ্গে তার প্রথম মিলন, আর তার পরেই সে এই প্রথম এসেছে প্রবাসে।

চলে যখন আসে তখন বধূর লুকিয়ে কান্নাটি ঘরের আয়নার মধ্যে দিয়ে চকিতে ওর চোখে পড়ল।

মন বললে, 'ফিরি, দুটো কথা বলে আসি।'

কিন্তু, সেটুকু সময় ছিল না।

সে দূরে আসবে বলে একজনের দুটি চোখ বয়ে জল পড়ে, তার জীবনে এমন সে আর-কখনো দেখে নি।

পথে চলবার সময় তার কাছে পড়ন্ত রোদ্দুরে এই পৃথিবী প্রেমের ব্যথায় ভরা হয়ে দেখা দিল। সেই অসীম ব্যথার ভাণ্ডারে তার মতো একটি মানুষেরও নিমন্ত্রণ আছে, এই কথা মনে করে বিস্ময়ে তার বুক ভরে উঠল।

যেখানে সে কাজ করতে এসেছে সে পাহাড়। সেখানে দেবদারুর ছায়া বেয়ে বাঁকা পথ নীরব মিনতির মতো পাহাড়কে জড়িয়ে ধরে, আর ছোটো ঝরনা কাকে-যেন আড়ালে আড়ালে খুঁজে বেড়ায় লুকিয়ে-চুরিয়ে।

আয়নার মধ্যে যে ছবিটি দেখে এসেছিল আজ প্রকৃতির মধ্যে প্রবাসী সেই ছবিরই আভাস দেখে, নববধূর গোপন ব্যাকুলতার ছবি।

২

আজ দেশ থেকে তার স্ত্রীর প্রথম চিঠি এল।

লিখেছে, 'তুমি কবে ফিরে আসবে। এসো এসো, শীঘ্র এসো। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।'

এই আসা-যাওয়ার সংসারে তারও চলে যাওয়া আর তারও ফিরে আসার যে এত দাম ছিল, এ কথা কে জানত। সেই দুটি আতুর চোখের চাউনির সামনে সে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখলে, আর তার মন বিস্ময়ে ভরে উঠল।

ভোরবেলায় উঠে চিঠিখানি নিয়ে দেবদারুর ছায়ায় সেই বাঁকা পথে সে বেড়াতে বেরোল। চিঠির পরশ তার হাতে লাগে আর কানে যেন সে শুনতে পায়, 'তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমার জগতের সমস্ত আকাশ কান্নায় ভেসে গেল।'

মনে মনে ভাবতে লাগল, 'এত কান্নার মূল্য কি আমার মধ্যে আছে।'

৩

এমন সময় সূর্য উঠল পূর্ব দিকের নীল পাহাড়ের শিখরে। দেবদারুর শিশিরভেজা পাতার ঝালরের ভিতর দিয়ে আলো ঝিল্‌মিল্‌ করে উঠল।

হঠাৎ চারটি বিদেশিনী মেয়ে দুই কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তার বাঁকের মুখে তার সামনে এসে পড়ল। কী জানি কী ছিল তার মুখে, কিংবা তার সাজে, কিংবা তার চালচলনে—বড়ো মেয়েদুটি কৌতুকে মুখ একটুখানি বাঁকিয়ে চলে গেল। ছোটো মেয়েদুটি হাসি চাপবার চেষ্টা করলে, চাপতে পারলে না; দুজনে দুজনকে ঠেলাঠেলি করে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ছুটে গেল।

কঠিন কৌতুকের হাসিতে ঝরনাগুলিরও সুর ফিরে গেল। তারা হাততালি দিয়ে উঠল। প্রবাসী মাথা হেঁট করে চলে আর ভাবে, 'আমার দেখার মূল্য কি এই হাসি।'

সেদিন রাস্তায় চলা তার আর হল না। বাসায় ফিরে গেল, একলা ঘরে বসে চিঠিখানি খুলে পড়লে, 'তুমি কবে ফিরে আসবে। এসো, এসো শীঘ্র এসো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।'

ধ্বংস

দিদি, তোমাকে একটা হালের খবর বলি।

প্যারিস শহরের অল্প একটু দূরে ছিল তাঁর ছোটো বাসাটি। বাড়ির কর্তার নাম পিয়ের শোপ্যাঁ। তাঁর সারা জীবনের শখ ছিল গাছপালার জোড় মিলিয়ে, রেণু মিলিয়ে, তাদের চেহারা, তাদের রঙ, তাদের স্বাদ বদল করে নতুন রকমের সৃষ্টি তৈরি করতে। তাতে কম সময় লাগত না। এক-একটি ফুলের ফলের স্বভাব বদলাতে বছরের পর বছর কেটে যেত। এ কাজে যেমন ছিল তাঁর আনন্দ তেমনি ছিল তাঁর ধৈর্য। বাগান নিয়ে তিনি যেন জাদু করতেন। লাল হত নীল, সাদা হত আলতার রঙ, আঁটি যেত উড়ে, খোসা যেত খসে। যেটা ফলতে লাগে ছ মাস তার মেয়াদ কমে হত দুমাস। ছিলেন গরিব, ব্যবসাতে সুবিধা করতে পারতেন না। যে করত তাঁর হাতের কাজের তারিফ তাকে দামি মাল অমনি দিতেন বিলিয়ে। যার মতলব ছিল দাম ফাঁকি দিতে সে এসে বলত, কী ফুল ফুটেছে আপনার সেই গাছটাতে, চার দিক থেকে লোক আসছে দেখতে, একেবারে তাক লেগে যাচ্ছে।

তিনি দাম চাইতে ভুলে যেতেন।

তাঁর জীবনের খুব বড়ো শখ ছিল তাঁর মেয়েটি। তার নাম ছিল ক্যামিল। সে ছিল তাঁর দিনরাত্রের আনন্দ, তাঁর কাজকর্মের সঙ্গিনী। তাকে তিনি তাঁর বাগানের কাজে পাকা করে তুলেছিলেন। ঠিকমত বুদ্ধি করে কলমের জোড় লাগাতে সে তার বাপের চেয়ে কম ছিল না। বাগানে সে মালী রাখতে দেয় নি। সে নিজের হাতে মাটি খুঁড়তে, বীজ বুনতে, আগাছা নিড়োতে, বাপের সঙ্গে সমান পরিশ্রম করত। এ ছাড়া রেঁধেবেড়ে বাপকে খাওয়ানো, কাপড় শেলাই করে দেওয়া, তাঁর হয়ে চিঠির জবাব দেওয়া — সব কাজের ভার নিয়ে ছিল নিজে। চেস্ট্‌নাট গাছের তলায় ওদের ছোট্ট এই ঘরটি সেবায় শান্তিতে ছিল মধুমাখা। ওদের বাগানের ছায়ায় চা খেতে খেতে পাড়ার লোক সে কথা জানিয়ে যেত। ওরা জবাবে বলত, অনেক দামের আমাদের এই বাসা, রাজার মণিমানিক দিয়ে তৈরি নয়, তৈরি হয়েছে দুটি প্রাণীর ভালোবাসা দিয়ে, আর-কোথাও এ পাওয়া যাবে না।

যে ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহের কথা ছিল সেই জ্যাক মাঝে মাঝে কাজে

যোগ দিতে আসত; কানে কানে জিগ্‌গেস করত, শুভদিন আসবে কবে। ক্যামিল কেবলই দিন পিছিয়ে দিত; বাপকে ছেড়ে সে কিছুতেই বিয়ে করতে চাইত না।

জর্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বাধল ফ্রান্সের। রাজ্যের কড়া নিয়ম, পিয়েরকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে গেল। ক্যামিল চোখের জল লুকিয়ে বাপকে বললে, কিছু ভয় কোরো না, বাবা। আমাদের এই বাগানকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব।

মেয়েটি তখন হলদে রজনীগন্ধা তৈরি করে তোলবার পরখ করছিল। বাপ বলেছিলেন, হবে না; মেয়ে বলেছিল, হবে। তার কথা যদি খাটে তা হলে যুদ্ধ থেকে বাপ ফিরে এলে তাঁকে অবাক করে দেবে, এই ছিল তার পণ।

ইতিমধ্যে জ্যাক এসেছিল দু দিনের ছুটিতে রণক্ষেত্র থেকে খবর দিতে যে, পিয়ের পেয়েছে সেনানায়কের তক্‌মা। নিজে না আসতে পেরে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে এই সুখবর দিতে। জ্যাক এসে দেখলে, সেইদিন সকালেই গোলা এসে পড়েছিল ফুলবাগানে। যে তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল তার প্রাণসুদ্ধ নিয়ে ছারখার হয়ে গেল বাগানটি। এর মধ্যে দয়ার হাত ছিল এইটুকু, ক্যামিল ছিল না বেঁচে।

সকলের আশ্চর্য লেগেছিল সভ্যতার জোর হিসাব করে। লম্বা দৌড়ের কামানের গোলা এসে পড়েছিল পঁচিশ মাইল তফাত থেকে। একে বলে কালের উন্নতি।

সভ্যতার কত যে জোর, আর-এক দেশে আর-একবার তার পরীক্ষা হয়েছে। তার প্রমাণ রয়ে গেছে ধুলার মধ্যে, আর-কোথাও নয়। সে চীনদেশে। তাকে লড়তে হয়েছিল বড়ো বড়ো দুই সভ্য জাতের সঙ্গে। পিকিন শহরে ছিল আশ্চর্য এক রাজবাড়ি। তার মধ্যে ছিল বহু-কালের-জড়ো-করা মন-মাতানো শিল্পের কাজ। মানুষের হাতের তেমন গুণপনা আর-কখনো হয় নি, হবে না। যুদ্ধে চীনের হার হল; হার হবার কথা, কেননা মার-জখমের কার্‌দানিতে সভ্যতার অদ্ভুত বাহাদুরি। কিন্তু, হায় রে আশ্চর্য শিল্প, অনেক কালের গুণীদের ধ্যানের ধন, সভ্যতার অল্প কালের আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়েমিড়ে গেল কোথায়। পিকিনে, একদিন গিয়েছিলুম বেড়াতে, নিজের চোখে দেখে এসেছি। বেশি কিছু বলতে মন যায় না।

মানুষ সবার বড়ো জগতের ঘটনা,
মনে হত, মিছে না এ শাস্ত্রের রটনা।
তখন এ জীবনকে পবিত্র মেনেছি
যখন মানুষ বলে মানুষকে জেনেছি।
ভোরবেলা জানালায় পাখিগুলো জাগালে
ভাবিতাম, আছি যেন স্বর্গের নাগালে।

মনে হত, পাকা ধানে বাঁশি যেন বাজানো,
মায়ের আঁচল-ভরা দান যেন সাজানো।
তরী যেত নীলাকাশে সাদা পাল মেলিয়া,
প্রাণে যেত অজানার ছায়াখানি ফেলিয়া।
বুনো হাঁস নদীপারে মেলে যেত পাখা সে,
উতলা ভাবনা মোর নিয়ে যেত আকাশে।
নদীর শুনেছি ধ্বনি কত রাতদুপুরে,
অপ্সরী যেত যেন তাল রেখে নূপুরে।
পূজার বেজেছে বাঁশি ঘুম হতে উঠিতেই।
পূজায় পাড়ার হাওয়া ভরে যেত ছুটিতেই।
বন্ধুরা জুটিতাম কত নব বরষে,
সুধায় ভরিত প্রাণ সুহৃদের পরশে।

পশ্চিমে হেনকালে পথে কাঁটা বিছিয়ে
সভ্যতা দেখা দিল দাঁত তার খিঁচিয়ে।
সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিনু জানি তা—
আজ দেখি কী অশুচি, কী যে অপমানিতা।
কলবল সম্বল সিভিলাইজেশনের,
তার সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের।
মানুষের সাজে কে যে সাজিয়েছে অসুরে,
আজ দেখি 'পশু' বলা গাল দেওয়া পশুরে।
মানুষকে ভুল করে গড়েছেন বিধাতা,
কত মারে এত বাঁকা হতে পারে সিধা তা।
দয়া কি হয়েছে তাঁর হতাশের রোদনে,
তাই গিয়েছেন লেগে ভ্রমসংশোধনে।
আজ তিনি নবরূপী দানবের বংশে
মানুষ লাগিয়েছেন মানুষের ধ্বংসে।

লেখক পরিচিতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) — বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যস্রষ্টা ঔপন্যাসিক,প্রাবন্ধিক 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উদ্গাতা এবং বাঙলার 'নবজাগরণ যুগের' অন্যতম প্রধান পুরুষ। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাহিত্যের সব্যসাচী আখ্যা দিয়েছেন। তিনি শুধু স্রষ্টা ছিলেন না, ইংরেজ শাসন-শৃঙ্খলিত বাঙালির মানসিক দৈন্য দূর করে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ উদ্বোধনের জন্য সংগঠনের দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই বাঙলা উপন্যাসের স্রষ্টা। 'জমীদার — বঙ্গ দেশের কৃষক' প্রবন্ধটি 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় খণ্ড থেকে সংকলিত।

জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৯-১৯৩৭) — বিশ্ববিশ্রুত পদার্থবিদ্ ও জীববিজ্ঞানী। ১৯১৪ খ্রী: বিজ্ঞানাচার্য এবং ১৯১৬-য় স্যার উপাধিতে ভূষিত হন। অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯১৭ খ্রী: কলকাতায় 'বসুবিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। 'অব্যক্ত' গ্রন্থ থেকে নিবন্ধটি সংকলিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) — শিল্পের প্রায় সমস্ত শাখায় এবং কর্মজীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে ও স্বমহিমায় রাজার মতো বিচরণ করেছেন। কবিতা-গল্প-নাটক-উপন্যাস-গান-প্রহসন-পত্রসাহিত্য, সংগীত-নৃত্য-চিত্রকলা, শিক্ষা-সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি, সমবায়-কৃষি-কুটিরশিল্প ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও প্রচেষ্টা অনায়াস ও আন্তরিক। জীবনব্যাপী সাধনায় তিনিই বাংলাসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। ১৯১৩ খ্রী: প্রথম ভারতবাসী হিসেবে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কারের সম্মানে ভূষিত হন। সংকলনের 'নৈবেদ্য' (১৯০৯) কবির কাব্য জীবনের চতুর্থ পর্বের রচনা। গল্পগুলি 'গল্পগুচ্ছ' থেকে সংকলিত হলেও 'প্রথম চিঠি'-'লিপিকা' (১৯২২) এবং ধ্বংস 'গল্পসল্প' (১৯৪১) থেকে গৃহিত।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) - মেধাবী ছাত্র বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কাছে মানবসেবার দীক্ষা নেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন, ১৮৯৭-এ 'রামকৃষ্ণ মিশন' ও ১৮৯৯-এ বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। 'বাঙ্গালা ভাষা' নিবন্ধটি 'ভাববার কথা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) — বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচয়িতা, গবেষক ও পণ্ডিত। ইঁনিই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বাংলাসাহিত্যের গবেষণা করেন। তাঁর সাহায্যেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা তথা বাংলায় এম.এ পাঠ্যক্রম চালু করেন। 'বাঙলার সংস্কৃতি' নিবন্ধটি 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) — ইংরেজি ও ফরাসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত। বাংলাসাহিত্যে চলিত-ভাষাকে মর্যাদা দিয়ে খ্যাত হন। বাংলাসাহিত্যে তিনিই প্রথম স্যাটায়ারিস্ট বা বিদ্রুপাত্মক প্রবন্ধের

রচয়িতা। বৈদগ্ধপূর্ণ প্রবন্ধ ছাড়াও তিনি গল্প ও কবিতা রচনা করেন। 'বইপড়া'-'প্রবন্ধ সংগ্রহ' থেকে সংকলিত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) — আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রথম ভারতীয় চিত্রশিল্পী। ভগিনী নিবেদিতা, স্যার জন উডরফ ও হ্যাভেল প্রমুখ সুধী মনীষী তাঁর শিল্প-শিক্ষাদর্শ জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯০৭ খ্রীঃ 'ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি' স্থাপন করেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাগেশ্বরী অধ্যাপক এবং ১৯৪২-এ বিশ্বভারতীর আচার্যঃহন। 'সুন্দর' তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' থেকে সংকলিত।

রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) — বাংলাসাহিত্যে 'পরশুরাম' ছদ্মনামে 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী' প্রভৃতী সরস গল্পগ্রন্থ রচনার জন্য খ্যাত। তাঁর অসামান্য কীর্তি বাংলাভাষার অভিধান 'চলন্তিকা' (১৯৩৭)। 'অপবিজ্ঞান' রচনাটি তাঁর 'লঘুগুরু' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) — সারাজীবন কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মহিলাদের শিক্ষিত প্রগতিশীল করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 'স্ত্রী জাতির অবনতি' 'রোকেয়া রচনাবলী' থেকে সংকলিত।

নন্দলাল বসু (১৮৮৩-১৯৬৬) — প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। ১৯২২ খ্রীঃ শান্তিনিকেতনের কলাভবনের অধ্যক্ষ হন। ১৯৫৪-এ ভারতসরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' সম্মান প্রদান করেন। 'শিল্প প্রসঙ্গ' রচনাটি তাঁর 'দৃষ্টি ও সৃষ্টি' থেকে সংকলিত।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৮৩-১৯৬১) — বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচার চেষ্টার সূচনা করেন। 'শব্দের অনুভূতি' তাঁর 'পদার্থবিদ্যা' (১ম খণ্ড) থেকে সংকলিত।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) — বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ। বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদাবলী বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। আজীবন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় নিবিষ্ট ছিলেন। 'সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্র' তাঁর 'প্রবন্ধাবলী' (১ম খণ্ড) থেকে সংকলিত।

প্রিয়দারঞ্জন রায় (১৮৮৮-১৯৮২) — আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। তাঁর বহু মূল্যবান গবেষণা রসায়ন শাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থে সমাদর লাভ করেছে। সংকলিত রচনাটি তাঁর 'বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্ম' গ্রন্থ থেকে গৃহিত।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (১৮৮৯-১৯৫৪) — প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার। ছাত্রাবস্থায় ঢাকার গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আগ্রহে থিয়েটারে যোগ দেন। সংকলিত রচনাটি 'নাট্য আকাদেমি পত্রিকা' ১ম সংখ্যা, (১৯৭০) থেকে সংগৃহিত।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) — মনীষী প্রাবন্ধিক। দেশ-বিদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। 'ইতিহাস' রচনাটি তাঁর 'বক্তব্য' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

কাজি আবদুল ওদুদ (১৮৯৬-১৯৭০) — অর্থনীতির ছাত্র হলেও তাঁর 'কবিগুরু গ্যেটে' (দু'খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা বাংলাসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। 'বাংলার নবজাগরণের সূচনা' লেখকের 'বাংলার নবজাগরণ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০) — প্রখ্যাত কবি, গায়ক, সুরকার ও লেখক এবং কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র। সংকলিত 'কীর্তন' রচনাটি তাঁর 'সাঙ্গীতিকী' গ্রন্থ থেকে গৃহিত।

ভবতোষ দত্ত (১৯১১-১৯৯৭) — ভারতের একজন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ। সমকালীন বাঙালি মনীষীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। 'সমবায় ও রবীন্দ্রনাথ' রচনাটি তাঁর 'অর্থনীতির পথে' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৯৩) — আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ। তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। দেশ-বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের নানা দিক নিয়ে গবেষণা তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি দিয়েছে। তাঁর 'লোকায়ত দর্শন' গ্রন্থটি জাপানি, চীনা, ইংরেজি, রুশ, মালয়ালাম ও হিন্দিতে অনূদিত হয়। সংকলনের রচনাটি 'লোকায়ত দর্শন' প্রথম খণ্ড থেকে গৃহিত।

ঋত্বিককুমার ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬) - প্রখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পী। খ্যাতনামা পরিচালক বিমল রায়ের সহকারীরূপে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ। 'অযান্ত্রিক' ছবির পরিচালকরূপে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। সংকলনের রচনাটি তাঁর, 'চলচ্চিত্র, মানুষ এবং আরো কিছু' রচনা থেকে সংকলিত।